বঙ্গের শেষবীর

প্রতাপাদিত্য।

চতুর্থ সংস্করণ।

(পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আষাঢ়, ১৩২৪।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

সাহিত্য-বান্ধব, সুবিখ্যাত 'বান্ধব'-সম্পাদক

স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর

সি-আই-ই মহোদয়কে,

সভক্তি কৃতজ্ঞহৃদয়ে

এই প্রতাপাদিত্য-চরিত

অর্পণ করিলাম।

ভূমিকা।

——:*:——

গ্রন্থ লিখিলেই তাহার একটা ভূমিকা লিখিতে হয়। কিন্তু এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার শক্তি আমার নাই। আমার অবর্ত্তমানে, উত্তরকালে, কোন শক্তিধর পুরুষ এ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন,—আশা করি। অকিঞ্চিৎকর হইলেও, পূর্ব্বপুরুষের দান বলিয়া, তিনি উপেক্ষা করিতে পারিবেন না,—মনে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল রহিল।

বাঙ্গালী পাঠক সহজে ইতিহাস পড়িতে চাহেন না,—তাই এ 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' অবতারণা। উপন্যাসের যথাসাধ্য পরিপুষ্টির জন্য, আমাকে অনেকস্থলে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কিন্তু এই কল্পনা কোথাও সত্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। খুব বড় একটা আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, যতটা ইতিহাসের 'গণ্ডী'র বাহিরে যাওয়া অনিবার্য্য হয়, আমি ততটা গিয়াছি মাত্র। খুঁটী-নাটী ধরিয়া এ কথার বাদানুবাদ করিলে, হয়ত আমার এ মত টিকিবে না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, উপন্যাস উপন্যাস,—উপন্যাস ইতিহাস নহে।

ইতিহাসে ও উপন্যাসে কি প্রভেদ, এখানে ঐ টুকু ইঙ্গিতই, বোধ করি যথেষ্ট।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় প্রতাপাদিত্য-সংক্রান্ত এ পর্য্যন্ত যতগুলি গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তন্মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মহারাজ প্রতাপাদিত্যের' ঐতিহাসিক ভিত্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ়। তাঁহার

পরিশ্রম, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা—বিশেষ প্রশংসনীয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। তাঁহার গ্রন্থ আদর্শস্বরূপ না পাইলে, আমার এ গ্রন্থ রচিত হইত কি না সন্দেহ।

আজ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্গবাসী পত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসু এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন,—"বঙ্গের শেষবীর।" এবার তাহার সহিত "প্রতাপাদিত্য" নামও সংযুক্ত হইল।

"কর্ণধার কুটীর"
মজিলপুর, ২৪পরগণা।

সেবক
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বঙ্গের শেষবীর প্রতাপাদিত্য।

প্রথম খণ্ড—উষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
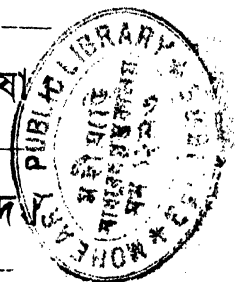
স্বভাবসুন্দর সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্যে একদিন তিনটি তরুণবয়স্ক যুবক শিকার করিতে গিয়াছিল। যুবকত্রয় তেজস্বী, নির্ভীক ও পরাক্রমশালী। তাহাদের শরীরে যেরূপ বল ছিল, মনেও সেইরূপ সাহস ছিল। অকুতোভয়ে ও প্রচণ্ডতেজে, তাহারা সেই ভয়াল হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে শিকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বর্ম্মাবৃত শরীর, হস্তে তীর ও ধনু, কটিতটে শাণিত কৃপাণ,—বীরজনোচিত পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া, কিছুতে দৃক্‌পাত না করিয়া, মনের আনন্দে যুবকত্রয় বন ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। এইরূপ বন ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, তাহারা বহু জন্তু শিকার করিল,—বহু জন্তু তাহাদের ভীষণ প্রতাপ দেখিয়া

প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলাইয়া গেল। শিকারকালে পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া আপন আপন বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"দেখ দেখ, আমি এই এক শরেই ঐ অদূরস্থ প্রকাণ্ডকায় বন্য-মহিষের মস্তক ভেদ করি।" কেহ কহিল,—"দেখ ভাই, অদূরে এক ক্রোধোন্মত্ত বরাহ ভীমগর্জ্জনে আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; আমি এখান হইতে আর এক-পা'ও না নাড়িয়া, প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া এই দাঁড়াইলাম,—এই শাণিত কৃপাণে এখনই উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিব।" তৃতীয় যুবক বলিল, "আর এদিকে দেখ—ব্যাপারখানা কি!—গাছের মাথায় পাতায়-পাতায় মিশিয়া, এক অজগর কালসর্প ভীষণ ফণা বিস্তারপূর্ব্বক আমার মস্তক লক্ষ্য করিতেছে, আর অদূরে ঐ কালান্তক যমের ন্যায় এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র থাবা গাড়িয়া বসিয়াছে,—এক লম্ফে এখনই আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে স্থির করিয়াছে;—কিন্তু দেখ দেখ, গুরু-কৃপায়, নিমেষমধ্যে কিরূপে আমি এই দুই মহাশত্রুকে শমনসদনে প্রেরণ করি।"

এইরূপ প্রচণ্ডতেজে ও বিপুলবীর্য্যে শিকার-ক্রীড়া সমাপ্ত করিয়া, যুবকত্রয় অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল! ক্রমে তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আসিল। অদূরে যমুনার জল, কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া বহিতেছে, শুনা গেল। একজন বলিল, "প্রতাপ, আজ চল যমুনার তীরে বসিয়া, প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ ভগবানের নামগান করি।—তার পর বাড়ী যাওয়া যাইবে।"

"ভাল, তাই হোক,—অমৃতে অরুচি কার! ভাই শঙ্কর, তোমার গলাখানি যেমন মিঠা, প্রাণ খানিও সেইরূপ মিঠা।—তাই এক একবার আমার মনে হয়, এমন মিঠা-প্রাণ লইয়া কি, শেষ পর্য্যন্ত তুমি আমার উচ্চ-সঙ্কল্পের সহায় হইয়া থাকিতে পারিবে?"

"প্রাণটি আমার কেমন মিঠা, তা তো আজ্ বরাহ শিকারেই দেখিতে পাইলে! বল, না হয় তোমায় আরও কিছু দেখাই।—ভরসা করি, তাহা দেখিয়া, আমার 'মিঠাত্বে' তোমার দিব্যজ্ঞান জন্মিবে।"

এই বলিয়া সেই তেজস্বী বীরযুবক, অম্লানবদনে একটি তীক্ষ্ণ শর লইয়া, আপনার একটি চক্ষু উৎপাটন করিতে উদ্যত হইল। ক্ষিপ্রহস্তে সেই শর কাড়িয়া লইয়া, প্রতাপ লজ্জিতভাবে কহিল,

"ভাই, অধমকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছ,—এ যাত্রা অধমকে ক্ষমা কর।—আমি আর কখন তোমার চিত্তের প্রতি সন্দিহান হইব না।"

শঙ্কর কিছু অভিমানব্যঞ্জকস্বরে, দৃঢ়তার সহিত, অথচ ঈষৎ হাসি-হাসি মুখে উত্তর করিল,—

"প্রতাপ, তুমি কি মনে কর, সেই উচ্চ সঙ্কল্প তোমার একার,—আর কাহারও নহে? আর কি কেহ সেই উচ্চ পথের পথিক হইতে জীবন উৎসর্গ করে নাই? জানি, তোমার প্রাণ অতি উচ্চ সুরে বাঁধা; কিন্তু মনে ইহাও স্থিরবিশ্বাস রাখিও,—এই দীন ব্রাহ্মণ-সন্তানও, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, তোমার সেই মহাপ্রাণের সহিত আত্মপ্রাণ মিশাইতে সমর্থ হইবে!"

এবার প্রতাপও উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিল,—

"তাহা জানি। জানি যে, তুমিই মায়ের সুসন্তান। তুমিই যথার্থ স্বদেশভক্ত ও বীর। বন্ধু! তুমিই আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা,—সকলই। কার্য্যক্ষেত্রে তুমিই চিরদিন আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ থাকিবে, ইহাও বিশ্বাস করি। তবু ভাই, কি-জানি-কেন, তোমার ঐ করুণ মুখখানি দেখিয়া, ঐ মমতাপূর্ণ নয়নযুগল দেখিয়া, এক একবার আমার মনে হয়,———না, সে কথা আর মুখে আনিব না।—তোমার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধুর চিত্তের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মিলেও মহাপাতক হয়।"

এই বলিয়া সস্নেহ-প্রীতিভরে প্রতাপ শঙ্করকে আলিঙ্গন করিল। আলিঙ্গন করিতে করিতে ছল-ছল চক্ষে বলিল,—

"ভাই, জীবনের মহাব্রত অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক রাখিও ;—আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।"

ধীরপ্রকৃতি শঙ্কর একটু হাসিল ; বলিল,—

"রাজার ছেলে—রাজপুত্র তুমি,—আমিই সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যেন পদস্খলন না হয়, কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি না ঘটে।"

এবার প্রতাপও একটু হাসিল। তাহাদের পরস্পরের সেই ঈষৎ হাসির অর্থ, তাহারা পরস্পরেই বুঝিল। বুঝিল যে, ঠিকই জবাব হইয়াছে।

এবার সেই তৃতীয় যুবকটি, প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "যুবরাজ ! কৈ, আমাকে ত কিছুই বলিলে না ? আমার হৃদয়ের প্রতি তবে তোমার অটল আস্থা আছে ? আঃ ! আজ আমি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বোধ করিলাম।"

প্রতাপ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল,—

"ভাই, তুমিও আর আমায় লজ্জা দিও না। প্রাণোপম শঙ্কর আজ আমায় যে শিক্ষা দিয়াছে, তাহাতেই আমার যথেষ্ট চৈতন্যোদয় হইয়াছে ;—আমি আত্মহৃদয় দিয়া আর কখন তোমাদের চিত্তের লঘুতা প্রতিপন্ন করিতে যাইব না। সূর্য্যকান্ত, তুমিও যে তোমার প্রাণ আমার জীবন-যজ্ঞে আহুতি দিবে, সে বিশ্বাস হইয়াছে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। মনে রাখিও, এই যে বনে বনে ভ্রমণ,—এই যে মরণভয় তুচ্ছ করিয়া ঘোর হিংস্রজন্তুগণ শিকার করিয়া মনে মনে আনন্দলাভ, ইহা সেই মহাযজ্ঞের পূর্ব্বানুষ্ঠান।—ভাই সূর্য্যকান্ত ! তোমায় একটি অনুরোধ,—তুমি আর কখন আমায় 'যুবরাজ' বলিয়া ডাকিও না।"

সূর্য্যকান্ত। কেন যুবরাজ?—'যুবরাজ' বলিয়া তোমায় ডাকিব না কেন? রাজা বিক্রমাদিত্য কি তবে রাজা নন?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ বলিল,—"জলশূন্য নদী যেমন, রাজ্যশূন্য রাজাও তেমনি!"

সূর্য্যকান্ত। কেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায়কে কি তবে লোকে যশোহরের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করে না?

প্রতাপ। স্বীকার করিবে না কেন? তোমার হিন্দুস্থানী ভৃত্যটিও কি তোমায় 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করে না? ইহা প্রায় তদ্রূপ। দেখ, কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য, মোগল অনুগ্রহ ক'রে আজ আমার পিতা ও পিতৃব্যকে 'রাজা' উপাধি দিয়াছেন; লোক-সাধারণ ভাবিতেছে, না জানি বাদসাহের কতই অনুগ্রহ!—কিন্তু এ ভূয়া রাজসম্মানে লাভ কি? ইচ্ছা করিলেই যে, রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারে,—ইচ্ছা করিলেই যে, এই যশোহরের শাসনভার আর একজনের হস্তে দিতে পারে,—অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যাহার খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার প্রদত্ত রাজা বা মহারাজা, আমির বা উজীর—কোন উপাধিরই কোন মূল্য নাই। এ উপাধি দেওয়া, রাজার স্বকার্য্যোদ্ধারের একটা ফন্দি মাত্র। যাহার এতটুকুও স্বাধীনতা নাই,—হাত-পা-মন অবধিও যার অধীনতা-নিগড়ে আবদ্ধ, তার আবার সম্মান কি? আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ও পিতৃব্য মহাশয়ও যে, এই ছেলে-ভুলানো উপাধি লইয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ বোধ করেন, ইহাই আমার দুর্ভাগ্য। তাই বলিতেছি, ভাই! তুমি আর আমায় যুবরাজ বলিয়া সম্বোধন করিও না।

তেজস্বী প্রতাপের সেই বিশাল চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সূর্য্যকান্ত

মরমে মরিয়া গেল। ব্যথার ব্যথী শঙ্করের চক্ষু হইতেও টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। শঙ্কর বলিল,—

"ভাই, সার্থক এ মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছ! তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। তোমা হইতেই যেন বঙ্গের———"

প্রতাপ বাধা দিয়া কহিল, "শঙ্কর, চল যাই, যমুনাতীরে বসিয়া, তোমার মুখে ভগবানের নাম-গান শুনি। এস সূর্য্যকান্ত।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলকান্ত-মণিপ্রভ যমুনার শোভা,—আ মরি মরি! এমন শোভা দেখিয়াও, লোকে সৌন্দর্য্যের পূজা করিতে বঞ্চিত থাকে! উপরে উদার অনন্ত আকাশ—কালো মেঘের উপরে মেঘ—তার উপরে মেঘ—তার উপরে মেঘ—এইরূপ কালো মেঘের অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে; আর নিম্নে অসীমবিস্তৃতা যমুনা,—কালো জল বুকে করিয়া, কালিমময়ী হইয়া, কল-কল নাদে সাগরোদ্দেশে ছুটিয়াছে। দুই পার্শ্বে ঘন বৃক্ষরাজী শাখায়-শাখায় পাতায়-পাতায় মিশামিশি হইয়া, স্থির নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।—সেও কালো। সূর্য্য, অস্ত যায়-যায় হইয়াছে। সুদৃশ্য বলাকা-শ্রেণী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে। স্তব্ধ, গম্ভীরা প্রকৃতি,—আরও স্তব্ধ, গম্ভীরা হইয়াছে। সূর্য্যের শেষরশ্মি ঘন বৃক্ষরাজী ভেদ করিয়া, ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছে। আর স্বয়ং সূর্য্য, যেন ক্রমশই একটু একটু করিয়া যমুনাগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে।

প্রকৃতির এই শান্ত-স্নিগ্ধ গোধূলি সময়ে, এই পরম প্রীতিপ্রদ মুহূর্ত্তে, জগতের কোলাহল দূরে রাখিয়া, বন্ধুত্রয় এই পরম রমণীয় স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আর তাঁহাদের সেই বীরজনোচিত বেশভূষা নাই। অদূরে ভৃত্যগণ তাঁহাদের অশ্ব ও বেশভূষাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; সেইখানে তাঁহারা বেশভূষাদি পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন।

পাঠক মনে রাখিবেন,—ইহা আজ প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের ঘটনা। মোগলরাজত্বের প্রথম অভ্যুদয়। স্থান—এই বঙ্গদেশাধীন সুন্দরবনের অন্তর্গত যশোহর নগরস্থ নদীতীর।

নবতৃণাঙ্কুরশোভিত মনোহর এই নদীতীরে আসিয়া বন্ধুত্রয় উপবেশন করিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের সকল ক্লান্তি দূর হইল। যমুনার সেই কল কল তান, অদূরস্থ নৌকার মাঝিগণের সেই সারি গান, সেই সুস্নিগ্ধ মধুর সমীরণ,—উপরে সেই উদার অনন্ত আকাশ, দূরে ঘন বৃক্ষশ্রেণী,—সমধর্ম্মা একপ্রাণ যুবকত্রয়,—প্রকৃতির সেই মুক্ত-প্রাঙ্গণে বসিয়া, অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, ভাবগদগদকণ্ঠে, দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া, সকলকে মাতাইয়া, গায়িতে আরম্ভ করিলেন—

পাষাণি! পাষাণ-প্রাণ হ'বে না কি বিগলিত।
কতদিনে দুঃখ-নিশি হ'বে মাগো সুপ্রভাত!—
প্রকৃতি-সন্তান তোর ডাকিতেছে অবিরত॥

অতি ধীরে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উচ্চে,—আরও উচ্চে,—আরও উচ্চে সেই স্বর উঠিল। গায়ক ও শ্রোতা,—সে গানে ধন্য হইল। গান গায়িতে গায়িতে দরবিগলিতধারে শঙ্করের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। শঙ্করও কাঁদে, প্রতাপও কাঁদে, আর সূর্য্যকান্তও অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে থাকে। গানের সে সম্মোহন সুর, প্রত্যেকের হৃদ্‌তন্ত্রী কাঁপাইয়া বাজিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ বলিল,—

"ভাই শঙ্কর! মা সত্যই পাষাণী! নহিলে এত ডাকি, প্রাণে কি একটুও দয়া হয় না?"

শঙ্কর। সেকি ভাই, তিনি যদি পাষাণী,—তবে দয়াময়ী, করুণাময়ী মা আর কে? ভক্ত অভিমানভরে যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলেন বটে, কিন্তু মার আমার অসীম দয়া, অনন্ত করুণা! একবার ডাকার মত ডাকো দেখি ভাই,—মা কি ছেলে ফেলে থাকিতে পারেন?

সূর্য্যকান্ত। শঙ্কর! তোমার হৃদয়টি এমনি কোমল যে, গান গায়িতে গায়িতেই যেন নয়নে নির্ঝরিণী বহিয়া যায়! তাই ভাবি, তুমি কেমন করিয়া ভাই, শিকার কর!

প্রতাপ। ডাকার মত ডাকা চাই, এই কথাই ঠিক।—কিন্তু কৈ, ডাকিতে ত শিখিলাম না? হায়! আমি শৈশবে মাতৃহীন,—মায়ের আদরও বুঝি নাই, মাকে ডাকিতেও শিখি নাই।—কিন্তু না ডাকিলে কি ভাই, মাকে পাওয়া যায় না?

শঙ্কর। নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু তবু আমরা না ডাকিয়াও থাকিতে পারি না। ইহাই স্বাভাবিক। এই শক্তি ও অধিকার আছে বলিয়া, মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। আর অন্য প্রাণী এই জন্যই মনুষ্য হইতে হীন।

প্রতাপ। মাকে ডাকিলেই প্রাণ জুড়ায়,—বাসনা-অনলে হৃদয় আর দগ্ধ হয় না,—অসীম শান্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু আমি দুর্ভাগ্য,—মাকে ডাকিতেও শিখিলাম না,—জীবনে শান্তিও পাইলাম না। দিবা-নিশি অশান্তি-অনলেই দগ্ধ হইতেছি!

সূর্য্যকান্ত। আমার মনে হয়, বাসনাই সকল দুঃখের আধার, সকল জ্বালার মূল,—বাসনার নিবৃত্তিতেই সুখ।

শঙ্কর। সে কথা সত্য; কিন্তু এই বাসনা না থাকিলে মানুষ তিষ্ঠিতেও পারিত না। ভগবানের কি খেলা দেখ, প্রাণে বাসনাও দিয়াছেন,—অথচ বাসনা-নিবৃত্তিতেই সুখ!

প্রতাপ। আমি বরং সুখ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ঐ যমুনার জলে ভাসাইতে পারি, কিন্তু আজন্মসঞ্চিত বাসনারাশি বিসর্জ্জন করিতে পারি না!—বাসনায় কি সুখ নাই?

সূর্য্যকান্ত। বাসনার তৃপ্তি নাই, পরিসমাপ্তি নাই; এক যায়, আর

হয়!—ঐ যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলিয়াছে, বাসনা-তরঙ্গও মানবপ্রাণে অমনি করিয়া খেলিতে থাকে! কয়টা সাধই বা পূর্ণ হয়,—জীবনে কয়টা আকাঙ্ক্ষাই বা মিটিয়া থাকে! তাই জ্ঞানী ব্যক্তি বাসনার নিবৃত্তি করিয়া সুখের মুখ দেখিয়া থাকেন।

শঙ্কর। ইহার মূলে অন্য কথাও আছে। মানুষের ভাগ্যে সুখ যে মিলে না, তাহার অন্য কারণও আছে। অনেক সময় আমাদের সুখের লক্ষ্য—আত্মপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু ইহা মনে রাখিও ভাই, সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে,—আত্মবিসর্জ্জনে। যদি প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে চাও, তবে বাসনা বিসর্জ্জন না করিয়া, পরের মঙ্গল-মন্দিরে আত্মোৎসর্গ করিও, তাহাতেই অপার সুখ পাইবে!

প্রতাপ। সার কথা! আপনাকে উৎসর্গ করিতে না পারিলে, নর-ভাগ্যে সুখ নাই! আমার বাসনা, আপনাকে লইয়া নহে, এই সমগ্র বঙ্গদেশকে লইয়া!—এ বাসনা কি মিটিবে না?

সূর্য্যকান্ত। তুমি অতি শৈশব হইতে যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান দিয়াছ, তাহা যে হৃদয়ে উঠিয়াই হৃদয়ে বিলীন হইবে, এ কথা আমার মনে ধরে না। আমরা সকলের মঙ্গলের জন্য, দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিব,—সুখ দুঃখের প্রতি চাহিব না,—যাহা বিধির বিধান, তাহাই অবনতমস্তকে লইব,—সাধ কি মিটিবে না?

শঙ্কর। দেবতার মন্দির, দেবতাই রক্ষা করিবেন;—তুমি আমি কি গর্জ্জিত মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ হইতে একটি তৃণও তুলিয়া লইতে পারি? তাঁহাতেই নির্ভর মনুষ্যের চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যচ্যুতি না হইলে, অগ্রসর হইতে পারিব। এ আশা কি পূর্ণ হইবে না?

প্রতাপ। এস ভাই, তিনজনে মিলিয়া, তিনজনের হৃদয় এক বাসনায় পূর্ণ করি। এস ভাই, তিনজনে একই সঙ্গে, বক্ষে বক্ষে আলিঙ্গন

করিয়া, একই মহাপ্রাণে ডুবিয়া যাই! সন্ধ্যার ঐ নির্ম্মল আকাশ-পানে চাহিয়া দেখ,—ঐ আকাশ কি সুন্দর! ঐ উচ্ছ্বসিতা যমুনার হৃদয়ও কি সুন্দর! এই অরণ্যানীও কি সুন্দর! আমাদের প্রাণের বাসনাও সুন্দর!—সকলই সুন্দর,—সকলই শোভাময়!

শঙ্কর। এখন এই সকল সৌন্দর্য্যের সার—সেই পরম সুন্দরকে অন্তরে ভাবো,—অন্তর আলোকে উদ্ভাসিত,—প্রাণ পুলকে উদ্বেলিত,—হৃদয় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

শঙ্কর গায়িলেন,—

'যা হবার তাই হবে
আমি কেন দোষী হই!'
ওমা শিবে! সর্ব্ব জীবে
এই শেখা মা কৃপাময়ি'।
মনের তম পুড়ে যাক্,
পাপের বোঝা হোক্ খাক্,
ভালো মন্দ তোমায় থাক্,
জানি না মা, তোমা বই!—
বিপদে সম্পদে শ্যামা,
তোমা পানে চেয়ে রই॥

তখন তিন বন্ধুতে মিলিয়া, আবার সেই সম্মোহনস্বরে, যমুনার কালো জল কাঁপাইয়া, সন্ধ্যাকাশ প্লাবিত করিয়া, অরণ্যানীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, গায়িতে লাগিলেন—

'যা হবার তাই হবে
আমি কেন দোষী হই।'
ওমা শিবে। সর্ব্বজীবে
এই শেখা মা কৃপাময়ি'।

গীত সমাপনান্তে প্রতাপ বলিলেন, "জীবনে বড় কি বল দেখি ?"

সূর্য্যকান্ত। ভক্তি।

প্রতাপ। তুমি কি বলো ?

শঙ্কর। জ্ঞান।

প্রতাপ। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আমার মতে কার্য্য।

ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম—তিনের মিশ্রণ করিও,—সংসারে বিজয়লাভ করিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় এখন পরকালচিন্তায় বিভোর। 'শমন শিয়রে সমুপস্থিত,—দিন ফুরাইয়াছে,—এখন হরিনামই একমাত্র সম্বল'—এই ভাবিয়া তাঁহারা জীবনের অন্তিম-সোপান আশ্রয় করিয়াছেন। ধরা-বাঁধা নিয়মে, যোগেযাগে, কোন রকমে বৈষয়িক কার্য্য সমাধা করিয়া,—লোকজনদের দ্বারা জমিদারীর আদায়-উস্থল করিয়া,—সন সন রাজার রাজস্ব চালান দিয়া, তাঁহারা একরূপ নিশ্চিন্ত আছেন। এ বয়সে আর কূট রাজনীতির আলোচনা করা,—আপনাদের প্রভুতার বিস্তার করা,—সম্রাট আকবরের সহিত টক্কর দিয়া, তাঁহাকে উঁচাইয়া, কোন কিছু করা,—দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, গোলা-গুলি-তরবারির আশ্রয়-গ্রহণ করা, তাঁহাদের ধাতে সহিতে পারে না। সুতরাং এ হিসাবে, তাঁহাদের মনের তেজ, উৎসাহ, উদ্যম, উদ্দীপনা, অভিমান,—এ সকলই নিবিয়া আসিয়াছে। সম্রাট-দত্ত 'রাজ'-উপাধি, আর প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক 'মহারাজ' সম্বোধনই, ঐহিকজীবনের চরমসম্মান মনে করিয়া, তাঁহারা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত আছেন। তবে এমন একদিন ছিল বটে, যখন গৌড়াধিপতি দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সুলেমান ও তৎপুত্র দাউদের স্বাধীনতাস্পৃহা, অদম্য সাহস, লোকবিস্ময়কর বীরত্ব,—সম্রাট আকবরের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা, হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন,—এই সকল পৌরুষজনক কার্য্য দেখিয়া, কিছুক্ষণের জন্য মনটা উত্তেজিত হইয়া উঠিত। তা এখন আর সে দিন নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমেই সে সকল, আকাশ-কুসুম বোধ হইতে লাগিল। তারপর, বীরশ্রেষ্ঠ দাউদের অবসানের সঙ্গে

সঙ্গে, বঙ্গে পাঠানশক্তি, মোগল-কর্ত্তৃক চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে,—সে সকল অতীত-কাহিনী, বৃদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয়ের এখন স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। এখন তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন বিমলা শান্তি ও ভগবৎ-প্রীতিই পরম প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়।

ফলে, ভ্রাতৃদ্বয় আছেনও তাহাই লইয়া। কেবলই পূজা-অর্চ্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও সদালোচনা, বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা ও সঙ্গীতের উপাসনা,—এই লইয়াই তাঁহারা নির্ম্মল আনন্দ ও পরমা তৃপ্তি উপভোগ করিতেন। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দদাস ও তৎসাময়িক অন্যান্য কবিগণও সর্ব্বদাই ইহাঁদের চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত থাকিতেন।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, ইহাঁদের কুল-ধর্ম্ম শক্তি উপাসনা। গৃহে দেবী ভগবতীর মূর্ত্তিও আছে। কিন্তু অন্তরে ও লৌকিক আচারে, ইহাঁরা বিষ্ণুভক্তিরই বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকেন! কারণ ইহাঁরা জানিতেন, কালীকৃষ্ণ অভেদ,—সেই একমাত্র সত্য, নিত্য, সনাতন পূর্ণব্রহ্ম। তবে, যে মূর্ত্তির ধ্যানে, যাহার যে পরিমাণে অনুরাগ হয়, তাহার সেই মূর্ত্তির উপাসনা করাই প্রশস্ত। বলা বাহুল্য, সাধারণ শাক্ত বা বৈষ্ণব হইতে, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের ধর্ম্মজীবন অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

সম্রাট্ আকবরের অনুগ্রহে এবং তাঁহার অধীনে, সুন্দরবনের অন্তর্গত যশোহর বিভাগের শাসনভার তাঁহারা পাইয়াছেন। এই জমিদারীর বিপুল আয়।

এই ঐতিহাসিক তত্ত্বটুকু পাঠ করিতে, বোধ করি, কোন কোন পাঠকের কিঞ্চিৎ বিরক্তিবোধ হইতেছে। তা সে বিরক্তিটুকু ভোগ না করিলে, আসল কথা কিছুই পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে না। সুতরাং, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া, এই কয়েক পংক্তি পাঠ করিতে হইবে।

কবিবর ভারতচন্দ্র যে যশোহর দেশ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই যশোহর। আমাদের আখ্যায়িকার যিনি নায়ক,—এই অবসরে পাঠক, তাঁহার বিষয়েও দুই চারি কথা, কবির মুখেই শুনিয়া রাখুন ;—

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালি।
ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

এই যশোহর অতি প্রাচীন নগর। অনেক পুরাণেও যশোহরের নামোল্লেখ আছে। এবং এরূপ কথিত আছে যে, সেই আদর্শ-সতী দক্ষদুহিতা—জগন্মাতার অঙ্গবিশেষ পতিত হইয়া, এই স্থান পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

এই পুণ্যময়ী যশোহর নগরী, বিক্রমাদিত্যের পিতা ভবানন্দ কর্তৃক সঞ্জীবিত, উল্লসিত ও ধন-ধান্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়াছিল। ইহা হইতেছে ১৫৬০।৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা,—আজ প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের কথা। ভবানন্দ, পাঠান-রাজসরকারে অতি বিশ্বস্ততা ও নিপুণতার সহিত কার্য্য করিয়া, রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। পিতা ও পিতৃব্যের পদানুসরণ করিয়া, বিক্রমাদিত্য এবং বসন্ত রায়ও, কালে দাউদের একান্ত অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। অধিক কি, এই যে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় নাম—ইহাও দাউদ-প্রদত্ত। তাঁহাদের আসল নাম ছিল—শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ। এদিকে যখন মোগল-পাঠানের

ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইতেছিল,—দূরদর্শী ভবানন্দ তখন নিরাপদ হইবার জন্য, দাউদের নিকট হইতে যশোহর প্রদেশ জাইগীর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, সপরিবারে সেখানে গিয়া, বস-বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠান-রাজ দাউদও, 'যুদ্ধের পরিণাম কি হয়' ভাবিয়া, অসংখ্য ধনরত্নাদি যশোহরে ভবানন্দের নিকট গচ্ছিত রাখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সেই হইতেই এই রায়-পরিবারের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয় হয়। ইহাঁরা বঙ্গজ কায়স্থ।

তার পর যথাকালে, মোগল-পাঠানের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। নর-রক্তে বসুন্ধরা কলুষিত হইল। যথাকালে মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবরের গলে বিজয়-বৈজয়ন্তী শোভা পাইল। সমগ্র ভারতের তিনি দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা হইলেন।

দাউদের ন্যায় সম্রাট আকবরও, যশোহর দেশের শাসনভার এবং রাজস্ব আদায়ের ভার,—বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের প্রতি অর্পণ করিলেন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় দুই ভাই। সহোদর নহে,—খুড়তুত জাসতুত ভাই। কিন্তু স্নেহে ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রাণের টানে, ইহাঁরা দুই জনে সহোদর অপেক্ষাও অধিক স্নেহপরায়ণ। সে স্নেহ এত যে, একজন আর একজনের জন্য, বুঝি, প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নন।

বিক্রম জ্যেষ্ঠ, বসন্ত কনিষ্ঠ। দুই ভায়ে মিলিয়া-মিশিয়া, পরামর্শ-যুক্তি করিয়া, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভবানন্দ এ সময় অতি বৃদ্ধ,—এক রকম কাজের-বার। তথাপি সে পাকা হাড়ে এত বুদ্ধি খেলিত যে, সময়ে সময়ে এক একটা অতি গুরুতর কঠিন রাজনৈতিক সমস্যার কথা,—সেই অশীতিপর বৃদ্ধ, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে বিষম দুর্ভাবনার হাত হইতে নিশ্চিন্ত করিতেন।

কালের ডাকে, বৃদ্ধ ভবানন্দ, ইহলোক হইতে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু সরিবার আগে, তিনি এক অলৌকিক লক্ষণাক্রান্ত, রাজজনোচিত সুদর্শন, প্রিয়তম পৌত্র-মুখ দেখিয়া যান। এবং তিনিই সেই প্রিয়তম পৌত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন—প্রতাপাদিত্য। প্রতাপের জন্মকাল —১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ।

দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস গেল, বর্ষের পর বর্ষ গেল,—এমন কত বর্ষও অতীত হইল,—ক্রমে বিক্রমাদিত্য এবং বসন্ত রায়ও বৃদ্ধ হইলেন। বৃদ্ধ হইয়া, তাঁহারা পরকাল-চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। সে পরকাল-চিন্তার কথা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।

এখন এই শান্তিপ্রদ, সুস্থির পরকাল-চিন্তার সহিত,—এক ঘোর অশান্তিপ্রদ, অস্থির, উন্মত্তকর ইহকালীন চিন্তার সংঘর্ষণ হইল। প্রশান্ত, স্থির, অচঞ্চল, ক্ষুদ্র সরোবরের সহিত,—এক অতি অশান্ত, অস্থির, প্রবল-বাত্যান্দোলিত বিশাল বারিধির সমাবেশ হইল। জ্যোৎস্না-পরিপ্লুত, মলয়-মারুত হিল্লোলিত, মৃদুমধুর সঙ্গীত-নিনাদিত, বসন্ত-বিরাজিত, কুসুমিত কুঞ্জ-কুটীরে,—সহসা দ্বাদশ-রবি-সমুত্থিত, বিশ্ব-বিধ্বংসকারী তীব্র জ্বালাময় উত্তাপ প্রবিষ্ট হইল। সে উত্তাপে জ্যোৎস্না নিবিল, বায়ু নিশ্চল হইল, গান থামিল, ফুল শুকাইল, কুঞ্জ ঝলসিয়া গেল।

সাধের বাঁশী আর বাজিল না। কবিতার সুধাপান আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। সঙ্গীতের সম্মোহন সুরে, আর কেহ আপনাকে চিনিতে পারিল না।

বাঁশরীর বিনিময়ে ভেরী, কবিতামৃতের বিনিময়ে নরশোণিত, আর সঙ্গীতের বিনিময়ে ঘোর আর্ত্তনাদ,—বঙ্গের ইতিবৃত্তে যুগান্তর উপস্থিত করিল।

বাঁশী বাজাইয়া, কবিতা লিখিয়া, গান গাহিয়া, অনেক দিন ত কাটাইলাম ;—আজ একবার প্রাণ ভরিয়া, মন খুলিয়া, হৃদয়ের মলা-মাটী দূর করিয়া,—এস ভাই, এস !—আজ সেই প্রাতঃস্মরণীয়, পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের গুণগানে জীবন সার্থক করি !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালী—বীর, বাঙ্গালী—যোদ্ধা, বাঙ্গালী—স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষাকারী,—অধিক কি, বাঙ্গালী বঙ্গের সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজাধিরাজ—রাজরাজেশ্বর,—এ কথা, আজিকার দিনে, বাঙ্গালী-পাঠকের কেমন লাগিবে, জানি না। কারণ, জগৎ জুড়িয়া কলঙ্ক—বাঙ্গালী দুর্ব্বল!—বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই, মনে সাহস নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই; বাঙ্গালী ভীরু, কাপুরুষ ও নিস্তেজ;—বাঙ্গালী লাঠী খেলিতে জানে না, বাঙ্গালী তরবারি ধরিতে জানে না;—বাঙ্গালী বন্দুকের শব্দে মূর্চ্ছা যায়, বাঙ্গালী আগ্নেয় অস্ত্রের নামে ভয় পায়;—সুতরাং বাঙ্গালী অতি অপদার্থ ও হেয়,—ইত্যাকার এবং আরও অনেক প্রকার কথার আলোচনা করিয়া, একদল (ইহাঁদের সংখ্যাই অধিক) আপন আপন বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম,—বাঙ্গালী বীর,—বাঙ্গালী যোদ্ধা,—বাঙ্গালী স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষাকারী,—অধিক কি, বাঙ্গালী বঙ্গের সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজাধিরাজ—রাজরাজেশ্বর,—একথা বাঙ্গালী পাঠকের মনে ধরিবে কি? পাঠক কি, তাঁহাদের আত্মজ-সংস্কার ভুলিতে পারিবেন? বাল্যে বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং যৌবনে ইংরেজী বিদ্যালয়ে, বাঙ্গালী-চরিত্র সম্বন্ধে, তাঁহারা যে ভুল শিক্ষা পাইয়াছিলেন,—ইংরেজী ইতিহাস-লেখকের এবং ইংরেজ-পদাঙ্কানুসারী বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের ইতিহাস-গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া, তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন,—অধমের এ অধম গ্রন্থ পড়িয়া,

সহসা কি তাঁহারা মন হইতে সেই বহুদিনের বিশ্বাস অপনোদন করিতে সমর্থ হইবেন ?

দুর্ভাগ্য !—লোক-শিক্ষকের পদে আসীন হইয়া, অনেকেই অম্লান-বদনে, তালে-বেতালে, যখন-তখন বাঙ্গালীর কাপুরুষত্ব প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হন ! ইংরেজ ইতিহাস-লেখক বাঙ্গালীকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,—পণ্ডিতপুঙ্গব সাহেব মেকলে স্বজাতি-সমাজে যে ভাবে বাঙ্গালীর পরিচয় দিয়াছেন,—মর্ম্মান্তিক বিড়ম্বনার কথা,—কোন কোন বাঙ্গালী লেখকই আবার সেই সব কথার প্রতিধ্বনি করিয়া, কাব্যে ও ইতিহাসে আপনাদের গুণপনা প্রকাশ করিয়া থাকেন ! অধিক কি, এই প্রতাপ-চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়াও, কোন কোন স্বদেশভক্ত মহাত্মা, সেই সহজ পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন ! তাই এক একবার মনে হয়,—বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালীর এ চরিতাখ্যায়িকা পড়িবেন কি ?—আর পড়িলেও, সকলে বিশ্বাস করিবেন কি ?

তা পড়ুন বা না পড়ুন,—বিশ্বাস করুন বা না করুন,—এখন ত দাদার কথায় শাদার পিঠে কালি দিয়া যাই ;—অতঃপর ভয় কি,—শ্রীঅগ্নিদেব আছেন,—উপহার দিবার ভাবনা বড় ভাবিতে হইবে না !

প্রতাপাদিত্য, বিক্রমাদিত্য রায়ের একমাত্র পুত্র ;—রূপবান্, বিদ্বান্ ও অশেষ গুণে গুণবান্। তাঁহার তুল্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট মেধা অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। তিনি একবার যাহা দেখিতেন বা শুনিতেন, তাহা তাঁহার অন্তরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যাইত। বাল্যকাল তাঁহার গৌড়নগরেই কাটিয়া যায়।

গৌড়েই তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ হয়। পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর পুরস্ত্রীগণের সহিত তিনি যশোহরে আগমন করেন। যশোহরে আসিয়া উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে

অর্পিত হন। অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা,—অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই সকল বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও অদ্ভুত পারদর্শিতা জন্মিল। শিক্ষকগণ বালকের প্রতিভা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাঁহাদের যাহা পুঁজি-পাটা ছিল, তাহা ফুরাইল। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র প্রতিভাবান্ প্রতাপ শেষে নিজেই নিজের শিক্ষক হইলেন। তিনি আপন অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তিবলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্ববিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ—সকলেই নির্নিমেষনয়নে বালকের পানে চাহিয়া রহিল।

বলা বাহুল্য, বাল্যকাল হইতেই প্রতাপ,—তেজস্বী, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা হইলেন। গৌড়ে অবস্থানকালে, সেই সুকুমার শৈশবেই প্রতাপের হৃদয়ে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হয়। কালে, তাহাই অঙ্কুরিত ও কাণ্ডযুক্ত হইয়া, ফুলে-ফলে সুশোভিত হইয়াছিল মাত্র।

গৌড়েশ্বর সুলেমান ও দাউদের চরিত্রই, প্রতাপের বাল্যশিক্ষার প্রধান উপকরণ হয়। সুলেমান ও দাউদের অদ্ভুত পরাক্রম, অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা, উড়িষ্যাবাসী হিন্দুনরপতিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ, অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা—এই সকল বীরোচিত কাহিনী, পিতা ও পিতামহের নিকট, বালক প্রতাপ অতি আগ্রহের সহিত শুনিত। সে আগ্রহ দেখিয়া, সুদূরদর্শী ভবানন্দ, বালকের পরিণাম কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন।—আনন্দে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িত। তখন তিনি স্নেহভরে বালককে বুকে ধরিতেন এবং তাহার মুখচুম্বনপূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন,—'দাদা আমার! বেঁচে থাকো,—সুখে থেকো,—পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যেয়ো!' এমন

কি, কোন সময় বালক অশান্ত হইলে কিংবা একটা বিষম বায়না ধরিলে, বৃদ্ধ তাহাকে যুদ্ধের গল্প শুনাইয়া, সে যাত্রা অব্যাহতি পাইতেন।

তার পর প্রতাপ যখন অপেক্ষাকৃত বড় হইল, তখন বুঝিল, পৃথিবীর সকল বীর জাতিই স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসাধ্যসাধন,—এমন কি, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

ধীরে ধীরে বালকের হৃদয়-পটে এক মহাভাব অঙ্কিত হইল। ধীরে ধীরে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার কল্পনা জাগিল।

বিধির বিধানে, এই সময়ে একটি মহাপ্রাণ বালক আসিয়া, প্রতাপের সহিত মিলিত হইল। যেন কোন্ অজানিত দেশ হইতে, একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি আসিয়া, প্রতাপের হৃদয়-জ্যোতিতে সংমিশ্রিত হইল। যেন জন্ম-জন্ম চির-পরিচিত, চির-বাঞ্ছিত একখানি মুখ আসিয়া, প্রতাপের সম্মুখে দাঁড়াইল।

দর্শনমাত্রই, যেন উভয়ে উভয়কে চিনিল;—উভয়েই উভয়ের মনের কথা বুঝিল;—উভয়েই প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি করিল।

প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, বুঝি এক দেহ—এক মন হইয়া, উভয়েই উভয়কে ভালবাসিল। এক জীবন-ব্রতে উভয়েই উভয়কে উৎসর্গ করিল। প্রতিজ্ঞা করিল,—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

এই মহাপ্রাণ বালকের নাম—শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। শঙ্কর, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। প্রতাপ, এই প্রাণোপম বন্ধুর সকল ভার গ্রহণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে, কোথা হইতে, আর একটি তেজস্বী বালক আসিয়াও জুটিল। প্রতাপ তাহাকেও কোল দিলেন;—তাহার সহিতও আত্মহৃদয় বিনিময় করিলেন। এই সৌভাগ্যবান্ বালকের নাম—সূর্য্যকান্ত গুহ।

তখন তিন জনে গলাগলি করিয়া, দিবারাত্র একই ভাবে বিভোর

হইয়া, একই ধ্যানে—একই জ্ঞানে, এক মহাযজ্ঞের বিরাট্ কল্পনায় ব্রতী হইল।

কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না,—তিনটি বেগবতী ধারা, কি অপ্রতিহত তেজে ও অবিশ্রান্ত গতিতে সাগরোদ্দেশে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্ণে, রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়, পাত্র-মিত্র-অমাত্যাদি পরিবৃত হইয়া, ভগবানের নাম-গান শ্রবণ করিতেছিলেন। গায়ক, আত্মভাবে বিভোর হইয়া, সুমধুরকণ্ঠে দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছেন; আর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী, তন্ময় হইয়া, সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছেন। গায়ক, একজন কবি ও সাধক;—সকলেই তাঁহাকে বিশেষরূপে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে;—তাই তিনি মুক্তপ্রাণে উন্মুক্ত তানে, সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া, স্বরচিত একটি সাধন-সঙ্গীত আলাপ করিতেছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি-স্বরগ্রামে, প্রত্যেক মিলন-তানে সুধাবর্ষণ হইতেছিল। গায়ক—স্বয়ং কবি গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস গাহিতেছিলেন;——

"ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানুষ জনমে সতসঙ্গে, তরহ এ ভব-সিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনি জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন, চপল সুখ সব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন, কিবা আছে ইথে পরতীত রে।
কমলদলজল জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥"

ধর্ম্মপ্রাণ বিক্রম ও বসন্তরায়, ধর্ম্মপ্রাণ কবির মুখে, তাঁহারই রচিত এই সাধন-সঙ্গীত শুনিয়া, একেবারে গলিয়া গেলেন। অশ্রুজলে

তাঁহাদের অপাঙ্গ ভাসিয়া গেল। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন হইতেও ঝর ঝর জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সসম্ভ্রমে উঠিয়া, কবির গলদেশে পুষ্প-মাল্য পরাইয়া দিলেন। ভাবগদগদকণ্ঠে কহিলেন,—

"ভাগ্যবান্! পূর্ব্বজন্মের বহুপুণ্যফলে এই দুর্লভ কবি-জীবন লাভ করিয়াছ;—তুচ্ছ মণি-মুক্তা-হার তোমায় আর কি দিব,—স্বভাবসুন্দর এই ফুলমালাই তোমার যোগ্য-উপহার।—তোমার এ গানের মূল্য নাই।"

বসন্তরায় উঠিয়া, কবিকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। কহিলেন,—

"বন্ধু, গানটি আবার গাও;—আমার পিপাসা এখনও মিটে নাই।"

রাজা বসন্তরায় নিজেও একজন কবি এবং সুগায়ক; তাঁহার রচিত অনেক গান আছে। তিনি কবিকে প্রাণের সমান ভালবাসিতেন। গোবিন্দদাস তাঁহার একজন প্রধান অন্তরঙ্গ ছিলেন। অনেক সময় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রাণের প্রতিধ্বনি পাইতেন।

আবার সেই সুধাময় গান চলিল। এবার সেই কবি-কণ্ঠের সহিত কবি-কণ্ঠের সংযোগ হইল। বসন্ত রায় আত্মবিহ্বল হইয়া, উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে গোবিন্দদাসের সহিত যোগ দিলেন। সভায় আনন্দের স্রোত বহিল। সকলে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

অতঃপর বিদ্যাপতির সুধার সমুদ্র মন্থন হইতে লাগিল। গোবিন্দ-দাস গাহিলেন,—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু

নয়ন না তিরপিত ভেল।——"

ভাবপ্রবণ বসন্তরায় বাধা দিয়া আপনাআপনি কহিয়া উঠিলেন,—"আ-হা-হা-! জন্মাবধি সেই রূপ-মাধুরী দেখিয়া আসিতেছি,—চোখের তৃপ্তি হইল না বটে!—তাই সে ছবি হৃদয়ের হৃদয়ে রাখিয়া দিয়াছি,—হায়! তবুও ত পূর্ণ-তৃপ্তি পাইলাম না!"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ, ভাবাবেশে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, নিজেই গোবিন্দদাসের সহিত গায়িতে আরম্ভ করিলেন,—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু

নয়ন না তিরপিত ভেল।

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু

শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু

না বুঝনু কৈছন কেলি।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু

তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥

কত বিদগধ জন রসে অনুমগন

অনুভব—কাহু না পেখ।

বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে

লাখে না মিলিল এক॥"

বিক্রমাদিত্য নয়নাশ্রু মুছিয়া, জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—

"সত্য, লাখের মধ্যে এমন একজনও ভাগ্যবান্ দেখি না। কবি! তুমিই ধন্য!—লোকের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহার অন্তরের

ছবি প্রকাশ করিয়াছ! (গোবিন্দের প্রতি) গাও ঠাকুর,—গাও! ভাই বসন! তুমিও উহাঁর সহিত যোগ দাও। তোমার মুখে, 'মহা-কবির এই মধুর পদাবলী শুনিতে শুনিতে, যেন আমার সেই শেষদিনের সেই শেষমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়।—হরি হে! ত্রাণ করো নাথ!"

বসন্তরায় জ্যেষ্ঠের মন বুঝিয়া, গোবিন্দকে কি ইঙ্গিত করিলেন! জমাট আসরে করুণরসের প্রস্রবণ বহাইয়া, শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণের সুরে সুর মিলাইয়া, কবিদ্বয় গান ধরিলেন,—

"যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটাইনু
মেলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্ধো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি,
পার হবো কোন্ উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহু বিদ্যাপতি সেহ মনে গুণি,
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥"

অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া, গায়কদ্বয় গান শেষ করিলেন। বিক্রমাদিত্যও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যেও কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিল। বসন্ত রায়, গদগদ কণ্ঠে বিক্রমাদিত্যকে কহিলেন,—

"দাদা, দিন ত ফুরাইয়া আসিয়াছে,—চিরদিনই ফাঁকি দিয়া কাটাইয়াছি ;—আর আজ এই জীবন-সন্ধ্যায় সলজ্জভাবে, হরিচরণারবিন্দ মাগিতে হইতেছে! হায়! এ দুঃখ, এ ক্ষোভ কি রাখিবার স্থান আছে ?"

বিক্রমাদিত্য বসন্তকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

"বসন, দুঃখ কর কেন ভাই? তুমিই ভাগ্যবান্ ;—এ অংশে বরং আমিই কাঙাল। আমিই সারাজীবন বিষয়-মোহে ডুবিয়া থাকিয়া, এই শেষ-দশায় পরকালের চিন্তায় মন দিয়াছি মাত্র। আর তাই কি ছাই, সকল সময়ে চিত্ত স্থির রাখিতে পারি? যা হোক ভাই,—সার্থক আমি তোমায় ভাইরূপে পাইয়াছিলাম। ভাই, তোমার এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব, আমার এ তাপদগ্ধ জীবনকেও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে! আহা, আজ কি অপূর্ব্ব আনন্দই লাভ করিলাম। (গোবিন্দদাসের প্রতি) চলুক কবিবর,—চলুক। হরি হে! যেন বাকী কটা দিন এই ভাবেই কাটিয়া যায়!"

এবার গোবিন্দদাস, হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাসে, একাকীই গায়িলেন,—

"তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন-দয়াময়,
অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম, নিন্দে গোঙায়নু,
জরা শিশু কতদিন গেলা।

নিধুবনে রমণী- রস-রঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অব তারণ ভার তোহারা॥"

গান শেষ হইল। সকলেই ভাবে ভোর—একরূপ বাহ্যজ্ঞান-রহিত। স্বয়ং বিক্রমাদিত্য হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন। সভাস্থ সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। সুনীল আকাশ দিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়িয়া, কুলায় ফিরিতেছে। এমন সময় সহসা একটি বাণবিদ্ধ পক্ষী,—যেখানে ভক্তবৃন্দ ভাবে মাতোয়ারা হইয়া হরিধ্বনি করিতেছেন, তাহার অনতিদূরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। পড়িয়া, যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র শরীরের কতকটা রক্ত, ভূমিতল আর্দ্র করিল। পাখীটি তখনও প্রাণের আশায়, সেই অন্তিমের অবশিষ্ট ক্ষুদ্র শক্তিটুকু, সবটা নিয়োজিত করিয়া, বাণ হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা পাইল। বলা বাহুল্য যে, তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সে পঞ্চত্ব পাইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুহূর্ত্তমধ্যে এই ঘটনাটি হইয়া গেল। সঙ্গীতামৃত-পানে বিভোর বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির দৃষ্টি এই ঘটনাতে পড়িল। তাহাতে সকলেরই প্রাণে ব্যথা লাগিল। বিশেষ—সেই সময়, সেই স্থান, সেই সঙ্গীতের সেই সম্মোহন স্বর;—সে স্বর তখনও সকলের কাণে এবং প্রাণে বাজিতেছে। বিক্রমাদিত্য সদুঃখে বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! পাখীর প্রাণ,—বাণবিদ্ধ হইয়া আর কতক্ষণ টিকিতে পারে!"

তার পর কহিলেন, "কার এ কাজ?—এমন নিষ্ঠুর কে?

বিক্রম, বসন্তের মুখপানে চাহিলেন; কহিলেন,—"প্রতাপ ত নয়?"

বসন্ত রায় একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিক্রম পুনরায় কহিলেন, "হাঁ, আমার বোধ হইতেছে, এ প্রতাপেরই কাজ। প্রতাপ ভিন্ন এমন নিষ্ঠুর আর কে?"

বসন্ত রায় আপন কপাল টিপিয়া ধরিয়া, পুনরায় জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। বিক্রমাদিত্য আবার বলিলেন,—"আমার অনুমান ঠিক কিনা,—সন্ধান লও দেখি, বসন!"

বসন্ত রায় একজনকে ইঙ্গিত করিলেন; সে চলিয়া গেল। বিক্রমাদিত্য বলিতে লাগিলেন,—"ব্যাপারখানা কি, বুঝিয়াছ বসন? গুণধর পুত্র আমার শিকারে গিয়াছিলেন; বাড়ী ফিরিবার মুখে, পিতা ও পিতৃব্যকে সে সংবাদটা জানান্ দিলেন;—বেশীর ভাগে আপনার বিদ্যার পরিচয়টাও কতক দেখাইলেন;——বুঝিলে ব্যাপারখানা?—হা মধুসূদন! তোমার মনেও এই ছিল?

বৃদ্ধের চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল পড়িল।

ইতিমধ্যে বসন্ত রায়ের সে লোক ফিরিয়া আসিয়া, দূর হইতে বসন্ত রায়কে ইঙ্গিতে জানাইল যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের অনুমানই সত্য,—তাঁহার পুত্র প্রতাপ কর্ত্তৃকই এই পক্ষী নিহত হইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বসন্ত রায়েরও অনুমান হইয়াছিল যে, প্রতাপই পক্ষীটিকে বাণবিদ্ধ করিয়াছে। তার পর তাঁর লোক আসিয়া, যখন দূর হইতে ইঙ্গিতে জানাইল যে, তাঁহাদের অনুমানই সত্য,—তখন তিনি প্রতাপের জন্য কিছু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু মনের সে ভাব গোপন রাখিয়া জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, "দাদা, এজন্য আপনি দুঃখ করিবেন না। হাজার হউক, প্রতাপ এখনও ছেলেমানুষ,—বালক; তার উপর দুঃখ বা রাগ করিয়া, আপনি চোখের জল ফেলিবেন না। বয়সে প্রতাপের এ দোষ শোধ্‌রাইবে।"

অন্যান্য যাহারা সেখানে ছিল, বসন্ত রায়ের ইঙ্গিতে, এই সময়ে তাহারা একে একে চলিয়া গেল। কেবল তাঁহারা দুই ভাই সেই দরদালানসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বেড়াইতে লাগিলেন।

বিক্রম। কেমন, আমার অনুমান সত্য কি না বল?—কৈ তোমার সে লোক যে, এখনও ফিরিল না?

বসন্ত রায় নীরবে নতমুখে, ভূমিপানে চাহিয়া রহিলেন। বিক্রমাদিত্য বলিতে লাগিলেন,—

"লোক আর ফিরিবে কোন্ মুখে?—হা ভাগ্য! সাধে কি ভাই, আমি জ্যোতিষিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া এত উৎকণ্ঠিত হই? উহার "রবিস্থানে চতুর্থ অংশে রাহু, শনি এবং মঙ্গলের স্পষ্ট যোগ আছে, এবং ইহাদের উপর বৃহস্পতি ও শুক্রের দৃষ্টি আদৌ নাই";—ইহার ফল কি ভীষণ ভাব দেখি? আমি যে ওকে শিকার করিতে দিতে কেন এত

নারাজ, তাহা ত তুমি সকলই জান। সত্য বলিতেছি, আমার বড় ভয় হয়,—ও কখন্ কি করিয়া বসে! শেষে কি এই অন্তিমদশায় ছেলের হাতে প্রাণটা খোয়াইব? হয়—আমি, না হয়—তুমি! প্রতাপের পিতৃস্থানীয় আর কে? ভাই, ভাব দেখি, ওর ঐ কোষ্ঠীর ফল যদি সত্য সত্যই ফলে, তাহা হইলে এই রায় পরিবারে কি মর্ম্মান্তিক শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে!”

বসন্ত। না দাদা,—আপনি অতটা ভাবিবেন না। ‘পিতৃহন্তা’ কোষ্ঠীতে স্পষ্ট নাই। আরও এক কথা,—যখন প্রতাপের মন্দের দিক্‌টা আমরা এত সূক্ষ্মরূপে ভাবিতেছি, তখন ওর ভালর দিকটাও সেইরূপ সূক্ষ্মভাবে ভাবা আমাদের কর্ত্তব্য। ভালর দিকটা ভাবুন দেখি,—প্রতাপের “বৃষরাশিতে চন্দ্র, কর্কটে বৃহস্পতি এবং নবমাধিপতি লগ্নে সমস্ত শুভ গ্রহের দৃষ্টি আছে।” ইহার ফল একচ্ছত্র স্বাধীন ভূপতি-পদ। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, প্রতাপ একদিন রাজরাজেশ্বর—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভূপতি হইয়া, জননী-জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিবে? ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রতাপের ‘পিতৃদ্রোহিতা’র কথাটাও একদিন কাল ভাবিবার বিষয় বটে।

বিক্রমাদিত্য একটু নীরব থাকিয়া, কি ভাবিয়া উত্তর করিলেন,—

“তাহাও যে একেবারে অসম্ভব, ইহা আমি মনে করি না!”

বসন্ত। সে কি দাদা!—সম্রাট আকবর যে এখন ভারতের সম্রাট! যে শক্তিবলে বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুত এবং দুর্দ্ধর্ষ পাঠানও বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে,—কোন্ ব্রহ্মাস্ত্রবলে প্রতাপ সে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত করিবে? না, দাদা! না,—কোষ্ঠীর ফল্ কখনই সত্য নয়।

বিক্রম। তাহাই হউক,—আমার বংশের কাহারও যেন পিতৃহন্তা হইয়া, রাজরাজেশ্বর হইতেও না হয়! উঃ! এ কল্পনাতেও শরীর

শিহরিয়া উঠে। যাই হউক, প্রতাপ সম্বন্ধে যখন আমার মনে ক্রমেই অবিশ্বাস জন্মিতেছে, তখন উহাকে কৌশলে স্থানান্তরিত করাই যুক্তি-যুক্ত। কারণ, দেখিতেছি, যতই উহার বয়স বাড়িতেছে, ততই উহার সাহস, বিক্রম, তেজস্বিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুরতাও বর্দ্ধিত হইতেছে। এমন অবস্থায় উহাকে দীর্ঘকালের জন্য সুদূর প্রবাসে পাঠাইতে না পারিলে, কিছুতেই উহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না। কারণ, বিদেশবাসে, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-পাশ ছিন্ন হওয়ায়, মন স্বভাবতই কিছু উদার হয়। প্রতাপের মন কোনক্রমে একবার উদার হইলে, উহার দ্বারা আর কোন নিষ্ঠুর কার্য্যেরই আশঙ্কা থাকিবে না—'পিতৃ-দ্রোহিতা' ত দূরের কথা। কেমন বসন,—তোমার মত কি?—প্রতাপকে কিছুদিনের জন্য খুব দূরদেশে পাঠান উচিত হইতেছে না?

বসন্ত রায় এ কথার কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিলেন না। কারণ জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি; সেই জ্যেষ্ঠই যখন এমন কথা বলিতেছেন, তখন অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ অর্থ আছে। অথচ প্রতাপের প্রতি একান্ত স্নেহাধিক্যবশতঃ, তাহাকেও দীর্ঘকালের জন্য চোখের আড় করিতে, স্নেহ-প্রাণ বৃদ্ধের মন সরিতেছে না। এমন অবস্থায় তিনি আর বেশী কিছু না বলিয়া, কেবল এইমাত্র বলিলেন,—"আচ্ছা দাদা, আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক দু'দিন পরেই করিবেন; কিন্তু তার আগে প্রতাপকে আরও কিছুদিন আমা-দের কাছে রাখিয়া, ওর মতি-গতি পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আহা! ছেলেমানুষ,—বিদেশ-বিভুমে তার বড় কষ্ট হবে।"

কিন্তু যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবে। ভবিতব্য কে রোধ করিবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যশোহরের রাজ-প্রাসাদ অতি সুদৃশ্য ও মনোহর। প্রাসাদটি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত,—অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভে ও উচ্চ দেওয়ালে, চূণ-বালির নক্সাযুক্ত কত লতা, কত পাতা,—কত ফুল, কত ফল,—কতবিধই সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শোভা পাইতেছে। প্রাসাদের গগনস্পর্শী উচ্চ চূড়া নানাবর্ণে রঞ্জিত ও নানা শিল্পসংযুক্ত হইয়া, রায় বংশের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রস্তরক্ষোদিত মূর্ত্তি সকল প্রাসাদের চারিদিকে সুসজ্জিত থাকিয়া, লোকসাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, ভাস্করের গুণপনা প্রচার করিতেছে।

বাহিরের শোভা এই, অন্তঃপুরের শোভা আরও মনোহর,—আরও চিত্তাকর্ষক। সেকালের হিন্দুর রাজ-অন্তঃপুর,—পাঠক অনুভবেই সে শোভা বুঝিয়া লউন।

এই অন্তঃপুরের এক সুরম্য প্রকোষ্ঠে বসিয়া, প্রতাপ নিবিষ্টমনে, তদগতচিত্তে একখানি আলেখ্য দেখিতেছিলেন। আলেখ্যখানি দেখিতে অতি সুন্দর; দেওয়ালে সংলগ্ন;—কোন দক্ষ চিত্রকরের অপূর্ব্ব তুলিকায় অঙ্কিত। সেই প্রকোষ্ঠে আরও অনেকগুলি চিত্র শোভিত ছিল। কিন্তু প্রতাপের চক্ষু আর কোন দিকে বিন্যস্ত না হইয়া,—কেবল সেই একই আলেখ্যের প্রতি, পলকরহিত অবস্থায় স্থির হইয়া রহিয়াছে। বহুক্ষণ এইরূপ একাগ্রমনে, নির্নিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে, প্রতাপের সেই তেজোদ্দীপ্ত বিশাল নয়নযুগল হইতে ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। চোখের জলে, বুকের ছবি মুখে প্রতিভাত হইল। মৃদুগম্ভীরস্বরে, ঈষৎ

কম্পিতকণ্ঠে, সেই ছবিকে লক্ষ্য করিয়া, প্রতাপ আপনা-আপনি কহিলেন,—

"ধন্য তুমি!—ক্ষত্রিয়কুলে তুমিই অমর! সুকুমার কৈশোরে ষোড়শ-বর্ষ বয়সে, তুমি যে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছ, তাহা স্মরণ করিলেও পুণ্য আছে! আর আমি?—হা অদৃষ্ট!—কি অধম ও ঘৃণিত জীবন আমার,—এই অষ্টাদশবর্ষ বয়সেও আমি গৃহে বসিয়া, স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া, কেবলমাত্র ভোগসুখেই জীবনযাপন করিতেছি! কোথায় বা তোমার ঐ শৌর্য্য,—আর কোথায় বা তোমার ঐ অলৌকিক বীরত্বের কণাংশ! অথচ তুমিও মানুষ, আর আমিও মানুষ!"

এই কথা বলিতে বলিতে, সেই মহাপ্রাণ যুবক কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু উত্তেজিত হইয়া বলিল,—

"মা ভবানী কি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন না? জননী জন্মভূমিকে কি আমি অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিব না?"

"কেন পারিবে না?—অবশ্যই পারিবে!"

অনিন্দ্যসুন্দরী এক কিশোরী, সজলনয়নে, বীণাবিনিন্দিকম্পিতকণ্ঠে, এই কথা বলিতে বলিতে, সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সুন্দরীর চরণ-চুম্বিত এলো চুল, ধূপছায়া রঙের পট্টবাস পরিধান, চন্দনচর্চ্চিত দেহ, সর্ব্বাঙ্গে পদ্ম-গন্ধবিরাজিত, হস্তে ফুল ও বিল্বপত্র,—সেই মোহিনী মূর্ত্তিতে, মুক্তস্বরে সুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—

"কেন পারিবে না?—অবশ্যই পারিবে! যদি আমি সতী হই,—কায়মনোবাক্যে ভগবতী পূজা করিয়া থাকি, তবে দর্প করিয়া বলি-তেছি, তোমার আজীবনসঞ্চিত আশা ফলবতী হইবে,—মোগলের হাত হইতে তুমিই দেশকে উদ্ধার করিতে পারিবে!"

প্রতাপ, সাশ্রুনেত্রে পশ্চাতে চাহিলেন,—বোধ হইল কে যেন আশার

কথা শুনাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। পরে দেখিলেন, আশা—মূর্ত্তিমতী, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব—জীবনাধিক পদ্মিনী।

পদ্মিনী বলিলেন,—"আমার প্রাণাধিক! এ বিরলে বসিয়া, একদৃষ্টে ঐ ছবির পানে চাহিয়া, কাঁদিতেছ কেন?"

প্রতাপ উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে সেই মোহিনী প্রতিমার কণ্ঠ বেষ্টন করিলেন, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—

"শুন পদ্মিনি! আজ এই শয়নগৃহে বসিয়া, আপনমনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি,—হঠাৎ এই ছবির দিকে দৃষ্টি পড়িল। এ ছবি আর কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ভাব আর কখনও আমার মনে উদয় হয় নাই। দেখ, পাপ কৌরবের অধর্ম্ম-যুদ্ধেও এই বালক, কি অদ্ভুত তেজস্বিতার সহিত আত্মপরাক্রম দেখাইতেছে! সপ্তরথি-পরিবেষ্টিত হইয়াও, কি অসাধারণ বীরত্বের সহিত আপন পথ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা পাইতেছে! অথচ এই বালকের বয়স ষোড়শবর্ষ মাত্র। অর্জ্জুনের প্রাণাধিক প্রিয়, সুভদ্রার নয়ন-তারা, বালিকা উত্তরার জীবনসর্ব্বস্ব অভিমন্যু,—সকলের স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া, কেমন অনায়াসে, হাসিতে হাসিতে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে!—আর আমি যুবা বয়সে ঘরে বসিয়া, আলস্যে দিনের পর দিন গণিয়া যাইতেছি! হায়, বাঙ্গালী-জীবনের এই অভিশাপ কি কেহ ঘুচাইতে পারিবে না? আর সকলেও যা, আমিও তাই হইলাম! প্রিয়ে, এই সব ভাবিয়া, ছবির পানে যত চাই, ততই চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। শেষে যখন মুক্ত-কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিয়া, জগজ্জননীকে মর্ম্মব্যথা জানাইতেছিলাম,—ব্যথার ব্যথী তুমি সুভাষিণী,—তুমিই আসিয়া সু-কথায় আমার প্রাণ জুড়াইলে!"

প্রেমময়ী পদ্মিনী, মুহূর্ত্তকাল তাঁহার সেই স্বাভাবিক ছলছল করুণ

আঁখি দুটি স্বামীর আঁখিযুগলের উপর রাখিলেন, এবং প্রেমপরিপ্লুতস্বরে কহিলেন,—

"হৃদয়েশ্বর! ও ত পটে-আঁকা ছবি; ও ছবি দেখিয়াই যখন তোমার বুকের ভিতর তরঙ্গ উঠিয়াছে,—তখন না জানি, আজ আমার হৃদয়ের ছবি দেখিলে, তোমার হৃদয়-সিন্ধু কি পরিমাণে উথলিয়া উঠিবে!

প্রতাপ, পদ্মিনীকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে আগ্রহপ্রকাশ করিলেন।

প্রফুল্লমুখী পদ্মিনী কহিলেন,—

"গৃহে প্রবেশ করিয়াই ত আমি সে কথা বলিয়াছি!—তুমিই বাঙ্গালী-জীবনের কলঙ্ক দূর করিবে,—তুমিই দেশকে স্বাধীন করিবে! যদি এ কথা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তুমি এ দাসীর মুখ দেখিও না!"

প্রতাপ, আদরে প্রণয়িনীর অধর চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"পদ্মিনি! দেখিব, তোমার পদ্মিনী নাম কেমন সার্থক হয়! রাজ-পুত-রমণী—ভীমসিংহের পদ্মিনী, যেমন সতী ছিলেন, তুমিও আমার সেই-রূপ সতী-প্রতিমা! দেখিব সতি, সতীবাক্য কেমন স্বার্থক হয়!"

পদ্মিনী স্বামীর চরণ স্পর্শ করিয়া উত্তর করিলেন,—

"যদি তোমার চরণে আমার আন্তরিক ভক্তি থাকে, তবে মা-ভবানীকে স্মরণ করিয়া আবার বলি,—তুমিই দেশকে স্বাধীন করিয়া রাজরাজেশ্বর নামে অভিহিত হইবে!—সে শুভদিন আগতপ্রায়!"

এই বলিয়া স্বামীর হস্তে, মায়ের প্রসাদী ফুল ও বিল্বপত্র প্রদান করিলেন।

প্রতাপ, ভক্তিভরে সেই ফুল ও বিল্বপত্র মস্তকস্পর্শ করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—

"দেখো' সতি, তোমার দেবী-পূজা না ব্যর্থ হয়! স্নানান্তে, বিশুদ্ধাচারে

দেবীপূজা করিয়া আসিয়া, আজ তুমি আমায় যে অমৃতময়ী বাণী শুনাইলে,—এক শঙ্কর ব্যতীত আর কেহই, এমন অমৃতময় আশ্বাস-বাক্যে আমায় সঞ্জীবিত করে নাই! প্রাণেশ্বরি! এই স্থান, এই সময়, আর এই স্বয়ং তুমি,—দেখিব, কেমন অচিরাৎ আমার জীবনব্রত উদযাপিত হয়!”

এবার সেই মহামহিমময়ী, সাধ্বী রমণী, অতি দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—

“প্রাণেশ্বর! উপরে দেবতা আছেন,—সম্মুখে এই তুমি আছ,—আর—আর আমার গর্ভস্থ এই সন্তান আছে,—আমি ত্রিসাক্ষী করিয়া বলিতেছি,—তুমি আশ্বস্ত হও,—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। গত নিশীথে, মা আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়া, ইহা বলিয়া গিয়াছেন;—আর আজ পূজার সময়, আমার সম্পূর্ণ জাগ্রৎদশায়, মা স্পষ্টকণ্ঠে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন!”

প্রতাপ আনন্দে অধীর হইয়া, পুনরায় পদ্মিনীকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন,—

“প্রাণাধিকে! সার্থক তোমার ভবানী পূজা,—সার্থক তোমার স্বামী-ভক্তি! সতি! তোমার কল্যাণে, আজ সত্য সত্যই আমি কৃতার্থ ও ধন্য হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই গর্ভস্থ শিশু, যেন তোমার রত্নগর্ভা নাম প্রচার করে!”

অতঃপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—

“প্রিয়ে, মায়ের এই মহাবাণী যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়।”

পদ্মিনী স্মিতমুখে কহিলেন,—

“স্বামিন্! সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিও।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ বাল্যেই মাতৃহারা। বিক্রমাদিত্য আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। পিতৃব্যপত্নী বসন্তরায়ের সহধর্ম্মিণীর নিকট প্রতাপ পুত্রবৎ স্নেহ পাইয়া থাকেন। এক দিন সেই পিতৃব্যপত্নী প্রতাপকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"বাছা, তোমার উপর দেখিতেছি, ঠাকুরের বড় বিরক্তিভাব। তুমি শিকার করিতে যাও,—শঙ্কর সূর্য্যকান্ত প্রভৃতিকে লইয়া মল্লযুদ্ধ কর,—বন্দুক-তলোয়ার লইয়া সর্ব্বদা থাক,—ঠাকুর এজন্য তোমার উপর বড় অসন্তুষ্ট। তোমার খুড়া মহাশয় তোমার পক্ষ হইয়া যদি তাঁকে কোন কথা বলেন, তাহাতে তিনি আরও বেজার হন। দেখ, আমার কাছে তুমিও যে, রাঘবও সে। তাই বলিতেছিলাম কি বাছা, তুমি আর এ সকল কাজে লিপ্ত থেক' না। আহা, সাত নয় পাঁচ নয়, তুমিই দিদির একমাত্র রত্ন—বংশের দুলাল;—তোমাকে কেহ অস্নেহ করিলে, আমার বড় কষ্ট হয়। দিদি স্বর্গে গেছেন, তাঁকে আর এসব দেখিতে হইতেছে না;—আমি আছি, তাই বাবা, তোমায় নিষেধ করি, তুমি আর কর্ত্তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ ক'রো না।"

প্রতাপ। খুড়ী মা! রাজার ছেলে—রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—শিকার করিব না,—মল্লযুদ্ধ করিব না,—বন্দুক-তরবারি ব্যবহার করিতে শিখিব না,—তবে কি লইয়া দিনযাপন করিব,—ভাল, তুমিই বল?

পিতৃব্যপত্নী কহিলেন,—

"কেন, কর্ত্তারা বলেন, নিজেদের এত বড় জমিদারী তালুক-মুলুক রহিয়াছে, ইহাই দেখ-শুন না কেন! তাঁহারা বলেন, 'আমরা আর

কদিন,—ছেলেদের মধ্যে প্রতাপই সকলের বড়,—আমাদের অবর্ত্তমানে যশোরের রাজ-পাট ত উহাকেই রাখিতে হইবে'।”

এবার প্রতাপ একটু হাসিলেন। পিতৃব্য-পত্নী কহিলেন,—“হাসিলে যে বাছা!”

প্রতাপ। খুড়ী মা, তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া,—তোমার কাছে মনের কথা লুকাইব কেন,—খুলিয়াই বলি। 'যশোরের রাজপাট'—একথা শুনিলেই আমার হাসি পায়! মোগল বাদসাহের অনুগ্রহে এই সুখটুকু ভোগ করা বৈত নয়? যেদিন বাদসাহের এই সখের অনুগ্রহটুকু ফুরাইবে, সেই দিন আমরাও যা, আর যশোহরের একটা সামান্য প্রজাও তা। সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা হইতে না পারিলে, তার আবার রাজ্যই কি, আর রাজপাটই বা কি! তাই মা, আমার বাপ-খুড়ার কথা শুনিয়া হাসিয়াছিলাম,—সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করিও না।”

এবার পিতৃব্যপত্নী কহিলেন,—

“আরও বাছা, শুনি কিনা, তোমার জন্মস্থানে নাকি কি কুগ্রহ সংলগ্ন আছে,—তাহার ফল———না, সে কথা মুখে আনিতেও বাধিয়া যায়। তাই বাবা, কর্ত্তারা তোমাকে শান্তশিষ্ট দেখিতে চান।”

প্রতাপ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

“হাঁ, এ কথাটা আমিও মাঝে মাঝে শুনিতে পাই বটে। তা, খুড়ী মা, তোমার কি ইহা বিশ্বাস হয় যে, আমি পিতৃহন্তা হইব?”

এবার খুড়ী-মা বড় গোলে পড়িলেন। কিছু লজ্জিতভাবে বলিলেন,—

“না বাবা,—আমার মনে ও পাপ-কথা ধরেই না। আমি যেমন শুনিয়াছি, তেমনি তোমায় বলিলাম মাত্র। আহা, যার মুখ দেখিলে, অতি-বড়-শত্রুও মুখ তুলিয়া চায়, তার দ্বারা যে এমন মহাপাতক হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না।”

উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বসন্ত রায় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। পিতৃব্যকে দেখিয়া, প্রতাপ সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইলেন। বসন্ত রায় কহিলেন,—

"হাঁ, বলিতেছিলাম কি প্রতাপ,—তুমি বাবা ঐ সঙ্গীগুলিকে ত্যাগ কর। দাদা ক্রমশই তোমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছেন।"

প্রতাপ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, ধীরভাবে বলিলেন,—

"সঙ্গীগুলির অপরাধ কি, আপনি বিচার করুন।"

বসন্ত। দাদা বলেন, 'উহারাই যত অনর্থের মূল। নহিলে আমার সন্তান হইয়া প্রতাপ এত নিষ্ঠুর হইতেছে কেন?"

প্রতাপ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় উত্তর দিলেন,—

"নিষ্ঠুরতার কার্য্য কি করিলাম, খুড়া মহাশয়?"

বসন্ত। ঐ মিছামিছি শিকার-উপলক্ষে কতকগুলা প্রাণিহত্যা করা,—বনের মধ্যে হাঁক-ডাক করিয়া বেড়ানো,—গুলিগোলা তরবারি লইয়া খেলা,—আর শুনিতে পাই, 'দেশ স্বাধীন করিব—দেশ স্বাধীন করিব' বলিয়া, তোমরা নাকি একটা বুলি ধরিয়াছ,—এ সব তিনি ভালবাসেন না। তিনি বলেন কি, শান্তশিষ্ট হইয়া তুমি জমিদারী দেখ,—প্রজাদের কোন অভাব-অভিযোগ থাকে ত, তাহার প্রতিকার কর,—বাদসাহকে যথোচিত সম্মান করিতে শিখ,—আর সম্পূর্ণরূপে দাদার বাধ্য হইয়া চল। এই করিলেই তিনি জীবনের বাকী কটা দিন সুখে কাটাইয়া যাইতে পারেন!

এবার প্রতাপ কিছু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "এগুলি কি তিনি একাই বলেন?—আপনার মত কি তবে আমার অনুকূল?"

বসন্ত রায় মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন,—

"ঠিক যে অনুকূল, তা নয় ;—আমিও তোমায় ঐ সকল কাজ করিতে নিষেধ করি বাবা !"

এবার প্রতাপ, বিশেষ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া, জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"খুল্লতাত মহাশয় ! বুঝিলাম, এক ভগবান্ ভিন্ন, পৃথিবীতে আমার আর কেহ সহায় নাই ! তা ভাল,—আমি সেই মহা সহায়েই, আপন পথ আপনি পরিষ্কার করিব।"

বসন্তরায় এবার প্রতাপের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহমাখাস্বরে কহিলেন,—

"বাবা, ঐটিই হইতেছে—তোমার 'কু'। এ কচি-বয়সে প্রতাপ, তোমার এমন কি মহা অভাব উপস্থিত হইয়াছে যে, পিতা-পিতৃব্যের নিকট হইতেও তুমি তাহা পূরণ করিয়া লইতে পার না ? বল—তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি ?"

প্রতাপ। বলিলে কিছু রূঢ় হইবে,—আমার মনোগত অভিপ্রায় আপনারা ধারণা করিতেই পারিবেন না।

বসন্ত। তবু,—বল, একবার শুনি।

এবার প্রতাপ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—

"পিতৃব্য মহাশয় ! যদি কথা পাড়িলেন, তবে শুনুন। মোগল বাদসাহের অনুগ্রহে, ক্ষুদ্র যশোহর টুকুর উপর প্রভুত্ব করিয়া সন্তুষ্ট থাকা,—আমার ধাতে সহিবে না। আমার সে বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা,—যশোহরের নিরীহ প্রজাপুঞ্জের রক্ত শোষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার নহে ! ক্ষুদ্র যশোহরে বসিয়া, ক্ষুদ্র জমিদারীর কড়া-ক্রান্তি হিসাব করিয়া,—তাহাই আবার পরসেবায় তুলিয়া দিয়া, আপনার মনকে আমি প্রবোধ দিতে পারিব না। ইহার জন্য যদি আমাকে আপনাদের সকলেরই স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়,—দুর্ভাগ্য আমার,—আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি !"

বসন্ত রায় অন্তরে দুর্গানাম জপ করিয়া, চারিদিক্ চাহিয়া, ভয়ে ভয়ে কহিলেন,—"তবে কি তুমি দেশকে স্বাধীন করিয়া, স্বাধীনরাজ নাম লইতে চাও?"

প্রতাপ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"সে কথা আপনাকে আজ বলিব না,—আর এক দিন বলিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে বসন্ত রায়ের মনে, প্রতাপের কোষ্ঠীর ফলাফলের কথা জাগিল। ধীরে ধীরে তিনি প্রতাপের ভবিষ্যৎ ভাবিলেন। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষের সম্মুখে তিনি যেন সকলই দেখিতে পাইলেন। সহসা বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন।

বিক্রমাদিত্যের সহিত বসন্তের, প্রতাপ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। বিক্রমাদিত্য পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পুত্র, পিতার সম্মুখীন হইলেন।

বিক্রমাদিত্য মনোগত অভিপ্রায় সবটা প্রকাশ না করিয়া, কেবল এইমাত্র বলিলেন,—

"প্রতাপ, আমি স্থির করিয়াছি যে, তুমি কিছুদিন আগ্রায় গিয়া থাকো। আগ্রায় আমাদের যে প্রধান কর্ম্মচারী আছে, তাহার পরিবর্ত্তে তুমিই সেই কাজ করিবে। যশোহরের রাজস্ব-বিষয়ক যাবতীয় কার্য্য তোমার হাত দিয়াই সম্রাটের নিকট পঁহুছিবে। সেখানে তুমি আমাদের প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিবে। ইহাতে চাই কি, তোমার ভবিষ্যৎও খুব উজ্জ্বল হইতে পারিবে। সম্রাট্ আকবর-গুণী, গুণগ্রাহী ও ধর্ম্মপরায়ণ মহাশয় ব্যক্তি; যদি তুমি বিশেষ গুণপনা দেখাইয়া সম্রাটের চিত্তবিনোদন করিতে পার, তাহা হইলে, কালে তুমি একজন মহৎ লোক হইতে পারিবে। বিশেষ, এই উঠ্‌তি-বয়সে ঘরে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকাটা, কিছু নয়। আর কিছু না হউক, দেশভ্রমণে তোমার বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিবে এবং মনের উদারতাও বৃদ্ধি পাইবে। আমি শুভদিন

স্থির করিয়া, তোমার আগ্রাগমনের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি,—তুমি প্রস্তুত হও।"

প্রতাপ পিতৃবাক্যের কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া, ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

অতঃপর মনে মনে বলিলেন,—"মঙ্গলময় পরমেশ্বর! তুমি যা কর —মঙ্গলের জন্য,—যেন এই বিশ্বাস চিরদিন হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে!"

প্রতাপ প্রস্থান করিলে পর, বসন্ত রায় একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

"কিন্তু দাদা, যতই হউক, প্রতাপ এখনও বালক;—অত দূর-দেশে গিয়া কি, বৎস নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে? বিশেষ, সে মহা-রাজনৈতিক্ ক্ষেত্র। "কূটবুদ্ধি আমীর ওমরাহগণ সর্ব্বদাই নানা কূট-বিষয় লইয়া আপনাদের প্রাধান্য-স্থাপনে তৎপর।"—বালক প্রতাপ কি, সে সম্রাট-সভায় আপন বুদ্ধিবলে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইবে? তাই বলিতেছিলাম, এ সম্বন্ধে আপনার আরও একটু বিবেচনা করিলে ভাল হইত।"

বিক্রমাদিত্য। ভাই বসন, বিবেচনা যাহা করিবার, তাহা করিয়াছি। প্রতাপকে আপাতত দূরদেশে পাঠানো ভিন্ন, আমি আর অন্য কোন সদ্‌যুক্তি স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাতে যে, আমিও অসুখী হইব, তাহাও জানি। কিন্তু উপায় নাই। দেখ, দিন দিন ওর মতি-গতি যেরূপ দেখিতেছি,—ওর বিরুদ্ধে লোকজনের মুখে যেরূপ কাণাঘুসা শুনিতেছি, তাহাতে উহার পরিণাম আমি ভাল বোধ করি না। শেষে কি, এই শেষ-দশায়, সত্য সত্যই ছেলের হাতে—অপঘাতে প্রাণটা দিব?

বিক্রমাদিত্য একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন,—

"আর—এই ত ভাই, তুমিও বলিতেছিলে,—তোমার নিকট, ও কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে!"

বসন্ত রায় উত্তর করিলেন,—

"বলিতেছিলাম বটে,—কিন্তু দাদা, প্রতাপকে দেখিলে, উহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ঐ বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, তেজোদ্দীপ্ত করুণ নয়ন, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত রাজোচিত মুখচন্দ্রমা,—না না, —ঐ সুন্দর রূপ-মন্দিরে কখন পিশাচের অধিষ্ঠান হইতে পারে না!"

বিক্রম। আমিও তাহা বুঝি। ঐ একমাত্র পুত্রকে চোখের আড়্ করিয়া রাখায়, সময়ে সময়ে যে, আমার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইবে, তাহাও বুঝি। কিন্তু ভাই, এক একবার মনে কেমন একটা কু জাগে,—— না, যা স্থির ক'রেছি, তার আর অন্যমত করিব না।

অতঃপর কি ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন,—

"আর বসন, ইহাও তুমি ঠিক জানিও,—প্রতাপের ভাগ্যে যদি বিধাতা সত্য সত্যই সে মহা-সম্মান লিখিয়া থাকেন,—প্রতাপ যদি সত্যই একদিন সমগ্র বঙ্গের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা হইয়া, রাজরাজেশ্বর পদে আসীন হয়,—তবে আমি আপনা হইতেই তাহার সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিলাম।—অথবা বিধাতা আমাকে সেইরূপ মতি দেওয়াইলেন। নহিলে, এতদিনের পর হঠাৎ আমার মাথায় এ বুদ্ধি যোগাইল কেন? এই যে প্রতাপকে সম্রাটসকাশে পাঠাইতে স্থির করিয়াছি,—কে বলিতে পারে, ইহার পরিণাম কি? ভাই, আমার বোধ হয়, এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া, আমি অজ্ঞাতসারে প্রতাপের এক মহা উদ্দেশ্য-সাধনের সহায় হইলাম! প্রতাপ তেজস্বী, কার্য্যতৎপর ও বুদ্ধিমান্,—কে বলিতে পারে, গুণগ্রাহী সম্রাট্ ইহাকে কি চক্ষে দেখিবেন! দেখ, মানুষ ভাবে, বিধাতা করেন;—তুমি আমি গড়ি, দেবতা ভাঙ্গেন;—কি জানি, আমি

হয়ত এক ভাবিয়া প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাইতেছি,—বিধাতা হয়ত তাহাকে আর এক মহাকার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। প্রতাপের ন্যায় সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, প্রতিভাবান্ যুবকের সম্রাট্-সম্মিলন, বোধ হয় বৃথায় হইবে না। আমি কি করিতে পারি, বসন? মহাজনেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সার,—তাহাই সত্য;——

'ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

ধর্ম্মপ্রাণ বসন্ত রায়ও ভক্তি-বিগলিত অন্তরে মনে মনে বলিলেন—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ, তাঁহার সেই জীবনের সুখদুঃখভাগিনী,—চিত্তের শান্তি-দায়িনী, প্রাণোপমা সহধর্ম্মিণীর নিকট পিতার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। কহিলেন,—

"প্রিয়তমে, তবে আসি,—বিদায় দাও। যদি মা কালী কূল দেন, তবেই আবার দেশে ফিরিব,—নচেৎ এই পর্য্যন্ত।"

পদ্মিনী ছল্-ছল্ চক্ষে, কাঁদ-কাঁদ মুখে উত্তর করিলেন,—

"প্রাণেশ্বর! অমন কথা মুখে আনিও না,—নিশ্চয়ই তুমি সফল-মনোরথ হইয়া, হাসিতে হাসিতে, আবার এ দাসীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে। বুঝিলাম, যার মা নাই, পৃথিবীতে তার কেউ নাই! মা থাকিলে কি, আজ ঠাকুর তোমাকে সেই দেশ-দেশান্তরে পাঠাইবার কথা, মুখেও আনিতে পারিতেন?"

প্রতাপ স্নেহভরে সহধর্ম্মিণীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"সতি! দুঃখ করিও না,—কার্য্যসিদ্ধির জন্য, তোমার মুখ ভাবিতে ভাবিতে, আমি অতল সমুদ্রেও প্রবেশ করিতে পারি,—কিছুদিনের জন্য বিদেশবাস,—ইহা ত সামান্য কথা! চন্দ্রাননি! তোমার প্রেম-মুখ দেখিয়া আমি সকল দুঃখ ভুলিয়া আসিয়াছি,—পিতার এই নিষ্ঠুর ব্যবহারও ভুলিব। আমি ত তোমায় কতবার বলিয়াছি,—যতদিন না আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারিব, ততদিন পারিবারিক-সুখ আমার অদৃষ্টে ঘটিবে না। দেখ, পিতা ও পিতৃব্য চিরদিন আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন।—আমার জন্মকালীন কি মাথা-মুণ্ড 'কুগ্রহ' যে

উহাঁরা দেখিয়াছেন, আর তাহা দেখিয়া উহাঁদের মনে যে কি ধ্রুব-বিশ্বাসই জন্মিয়াছে, বলিতে পারি না। আর যদি সত্য সত্যই আমার অদৃষ্টে পিতৃ-হত্যার মহাপাতক লেখা থাকে, তাহা কি এইরূপ ক্ষুদ্র চেষ্টায়—ক্ষুদ্রতম পুরুষকারের দ্বারা খণ্ডিত হইবে?

সাধ্বী সহধর্ম্মিণী নির্নিমেষ নয়নে, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া-চাহিয়া, জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—

"কি বলিব, উহাঁরা গুরুজন,—পাপ-মুখে গুরুনিন্দা করিতে নাই,—কিন্তু কোন্ প্রাণে যে, উহাঁরা তোমা হেন নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের প্রতি এই ঘোর কলঙ্ক আরোপ করিতে চান, বলিতে পারি না। প্রিয়তম! সেই জন্যই কি উহাঁরা কৌশল করিয়া, তোমাকে রাজ্যের বহির্ভূত করিয়া দিতেছেন? যদি তাই হয়, তবে তোমারও যে গতি আমারও সেই গতি;—অধীনীকে সঙ্গে লও নাথ!"

প্রতাপ ঈষৎ ম্লানমুখে উত্তর করিলেন,—

"না প্রিয়ে, উপস্থিত ক্ষেত্রে তুমি আমায় ওরূপ অনুরোধ করিও না। উহাঁদের মনে যাই থাক্ করুন,—আমি কিন্তু নিশ্চয় বুঝিতেছি, এতদিনে আমার কালরাত্রি পোহাইল! কি ছার যশোহরের এই ক্ষুদ্র রাজ্যপাট,—আমি আত্মবলে ও দৈবানুগ্রহে একদিন এমন এক রাজ্যের অধীশ্বর হইব,—যাহার প্রভাবে, শত শত বীর, সহস্র সহস্র যোদ্ধা, লক্ষ লক্ষ নরনারী হৃদয়ের সহিত আমাকে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিবে! সেই অতুল সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে, মা-জগজ্জননী আমায় ডাকিতেছেন! প্রাণেশ্বরি! তোমার কল্যাণেই আমি মায়ের এই মহাবাণী শুনিতেছি। কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকো সতি! আমি কার্য্যোদ্ধার করিয়া শীঘ্রই আবার তোমার সহিত মিলিত হইব।"

পদ্মিনী আর কোন কথা না কহিয়া, সজলনয়নে কক্ষান্তরে গিয়া, ছন্ন

মাসের একটি সোণার শিশু আনিয়া, প্রতাপের কোলে দিলেন। প্রতাপ সেই শিশুর কোমল অধরে চুম্বন করিয়া, শিশুমাতার অধরে অধর মিলাইলেন। বলিলেন,—

"প্রিয়ে, আমার অনুপস্থিতিতে, এই শিশুই তোমার সান্ত্বনাস্থল হইবে। এই শিশুকে লক্ষ্য করিয়া, একদিন আমি তোমায় যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম, ভরসা করি, সে আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হইবে না। ইহার আকৃতি অবিকল তোমার ন্যায়। এমন একইরূপ মুখ, আমি কোথাও দেখি নাই। ঠিক যেন একটি প্রদীপ হইতে আর একটি প্রদীপ জ্বালিয়া, কোন অদ্বিতীয় কারিকর, আপন অতুল্য শক্তির পরিচয় দিয়াছে। এই পুত্রই আমার সৌভাগ্যোদয়ের সূচনা করিয়াছে ;—অতএব আমি এই পুত্রের নামকরণ করিলাম,—উদয়াদিত্য। উদয়কে লইয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, প্রিয়ে!"

অতঃপর প্রতাপ, তাঁহার সেই প্রিয়তম বন্ধু শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তের সহিত মিলিত হইলেন এবং আগ্রাযাত্রার সকল বন্দোবস্ত করিয়া, নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সে নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল। প্রতাপ সকলের নিকট বিদায় লইলেন। বাটী হইতে যাত্রা করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, তিনি অন্তঃপুরস্থ দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। ভক্তিভরে ভবানীকে ধ্যান করিয়া মনে মনে কহিলেন,—

"মা! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও। জননি! জন্মভূমির দুর্গতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে, মনে অতি উচ্চ আশা লইয়া, আজ আমি স্বদেশ হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত হইতেছি। দেখো মা,—মুখ রেখো। কার্য্যান্তে, হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া, আবার যেন তোমায় পূজা করিতে পারি। মাগো! তোমার কার্য্য তুমিই করিও। আর যদি আমাকে বিড়ম্বিত কর,—তবে মা, এই শেষ—আমি এ মুখ লইয়া আর দেশে ফিরিব না,—

তোমার পূজাও আর করিব না। জননি! জ্ঞান হওয়া অবধি কখন মাতৃমুখ দেখি নাই;—তুমিই আমার সেই স্নেহময়ী, করুণাময়ী, দয়াময়ী মা। মাগো, মা ভিন্ন ছেলের আব্দার আর কে রাখিবে মা?”

প্রতাপের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল।

প্রতিমামূর্ত্তির চক্ষেও যেন অশ্রুধারা। সে অশ্রু কেমন, ভক্তই তাহা বলিতে পারেন। প্রতাপ বুঝিলেন, মায়ের চরণে তাঁহার মর্ম্মকাতরতা স্থান পাইয়াছে। বড় আশ্বাসে তিনি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বারে আসিয়া প্রতাপ আর একখানি মোহিনী-প্রতিমা দেখিলেন। মুহূর্ত্তকাল উভয়েই উভয়কে অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, নীরবে পরস্পরের মুখচুম্বন করিলেন। প্রতাপ ইঙ্গিতে বলিলেন, “সতি! তোমার ভগবতীপূজা সার্থক হইয়াছে, —মা প্রসন্ন হইয়াছেন!”

প্রতাপ বিদায় হইলেন। বঙ্গের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয় হইবার সূচনা হইল। প্রকৃতি, তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের জন্য, নীরবে তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে স্থানান্তরে লইয়া চলিলেন।

বলা বাহুল্য, প্রাণোপম বন্ধু শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত, প্রতাপের সঙ্গী হইলেন। তাঁহারা তিনজনে একখানি সুদৃশ্য নৌকায় উঠিলেন। লোকজন দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া, তাঁহাদের পশ্চাতের নৌকায় গিয়া উঠিল। যশোহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া, সজলনয়নে প্রতাপকে দেখিতে লাগিল। বৃদ্ধ রাজা বসন্তরায় প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে এক দিনের পথ অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিয়া, ক্ষুণ্ণমনে যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রতাপের জীবন-নাটকের এক অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল।

ইতি প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যাহ্ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুসজ্জিত, সুবিস্তৃত নৌকায় আরোহণ করিয়া, প্রতাপ সহচরগণের সহিত ভাগীরথীর দুই পার্শ্ব দেখিতে দেখিতে চলিলেন। বিশাল গঙ্গা ফুলিয়া ফুলিয়া, লহরীলীলা তুলিতেছে। জলে সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। যেন অপরিমিত কাঁচা-সোণা তরল ও দ্রবময় হইয়া, তালে তালে নৌকাকে নাচাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

জলপথভ্রমণে স্বভাবতই আনন্দ হয়। তাহার উপর প্রতাপ, আজ জীবনের যে উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিতে অগ্রসর হইতেছেন,—এই গম্ভীর স্থানে, ততোধিক গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায়, বন্ধুদ্বয়ের আন্তরিক অকপট সহানুভূতিতে, সে আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। উপরে উদার অনন্ত আকাশ,—নিম্নে এই প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী,—জনমানবের কোলাহলশূন্য, সংসারের শঠতা ও অশান্তিশূন্য, এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থে আসিলে, মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া গিয়া, পরমানন্দ উপভোগ করে। মহাপ্রাণ প্রতাপ এতদিন সন্দেহের নিকৃষ্ট কারাগারে বন্দী থাকিয়া, যে অসীম যন্ত্রণা বুকে বহন করিতেছিলেন, আজ তাঁহার সে যন্ত্রণা সকলই বিদূরিত হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী, আজ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া, মনের সাধে আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল।

সময় বুঝিয়া ধর্ম্মপ্রাণ শঙ্কর, আপনার মধুময় কণ্ঠে গান ধরিলেন ;—

"দীনে দয়া কর ভগবান।
তোমারি চরণে, জীবনে মরণে,
সঁপে রাখি যেন প্রাণ ॥
তরঙ্গ তুফানে ভাসিয়ে না যাই,
তুমি ধ্রুব-জ্ঞানে জীবন কাটাই,
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ তোমারে জানাই,
যা করো তুমি বিধান ॥"

গান শুনিয়া প্রতাপ ও সূর্য্যকান্ত উৎফুল্ল ও আশ্বস্ত হইলেন। বন্ধুত্রয়ের নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

প্রতাপ কহিলেন, "ভাই শঙ্কর,—ভাই সূর্য্যকান্ত! বুঝি এতদিনে দেবতা প্রসন্ন হইলেন। বুঝি এতদিনে আমাদের জীবন-ব্রত উদযাপনের পথ প্রশস্ত হইল।"

অতঃপর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—

দেখ, বার্দ্ধক্যবশতঃ, পিতার আমার হিতাহিত জ্ঞান একরূপ তিরোহিত হইয়াছে ;—এখন মৃত্যু-ভয় তাঁহার বড়ই প্রবল। সে এত যে, আমি পিতৃহন্তা হইব সন্দেহ করিয়া, পিতৃব্যের পরামর্শে, আমাকে জন্মভূমি হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত করিলেন। বুঝিয়াছি, আমার পিতৃব্যই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক। তা তাঁহাদের ষড়যন্ত্র যাহাই হউক,—আমি কিন্তু এই অবসরে, আমার আজীবনসঞ্চিত আশা ফলবতী করিতে সচেষ্ট হইব। আমার বোধ হয়, পিতা ও পিতৃব্যের মন্দ অভিপ্রায়ই আমার পক্ষে শুভপ্রদ হইবে।"

অনুকূল বায়ুভরে নৌকা চলিতে লাগিল। প্রতাপ, শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত নৌকার ছাদে বসিয়া, দেশের অবস্থা দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

তিন জনে একই কথায়, একই বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত। কিরূপে বঙ্গের স্বাধীনতা আবার ফিরিয়া আসিতে পারে,—কি উপায়ে সোণার বঙ্গ আবার বঙ্গবাসীরই করায়ত্ত হয়,—কোন্ কৌশলে বাঙ্গালী বীর, দুর্দ্ধর্ষ মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, জগৎসমক্ষে বাঙ্গালীর বাহুবল দেখাইয়া, বাঙ্গালীর নামে জয়-পতাকা উড়াইতে পারে,—বন্ধুত্রয় একান্তমনে—সর্ব্বান্তঃকরণে সেই বিষয়েরই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌকা গৌড় নগরে উপস্থিত হইল। এই গৌড় একদিন বঙ্গের প্রধান রাজধানী ছিল। একদিন এই গৌড়ের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দু-রাজগণের আমলে, একদিন এই মহানগরী,—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে,—সর্ব্ববিষয়েই চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল;—কিন্তু হায়! এখন আর সেদিন নাই। কালের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে, সে স্থান এখন শ্মশানতুল্য।

এই সব ভাবিয়া, প্রতাপ অশ্রুপূর্ণলোচনে বন্ধুদ্বয়কে বলিলেন,—

"ভাই শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত! কি করিলে, আবার বঙ্গের সেই শুভ-দিন উপস্থিত হয়? কি করিলে, হিন্দু যেমন ছিল, আবার সেইরূপ হয়? দেখ, এই গৌড়—একদিন ইহার কি শোভাই না ছিল,—আর আজ তাহার কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! শুধু গৌড় কেন,—এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সমগ্র বঙ্গভূমি,—হিন্দুস্থানের এই শ্রেষ্ঠ অংশ, এখন মোগলের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ। হিন্দু-বীরগণ এখন শৌর্য্য, বীর্য্য, মান, অভিমান—সমস্তই ত্যাগ করিয়া, মোগলের দাসত্বই জীবনের সার করিয়াছে। স্থানে স্থানে যে দুই চারিজন হিন্দু-নরপতি আছেন, তাঁহারা নামে রাজা—মোগল সম্রাটেরই অনুগৃহীত,—যুদ্ধ, বিগ্রহ,

স্বাধীনতা-স্পৃহা—কিছুই তাঁহাদের নাই;—সুতরাং তাঁহারা আপন আপন অস্তিত্বেও একরূপ সন্দিহান;—এমন অবস্থায় আমার এই উচ্চ অভিলাষ,—এই দুর্দ্দমনীয় কল্পনার পরিণাম কি ভগবানই জানেন।”

বীরের বীর-হৃদয়,—ক্ষণেক আশায়, ক্ষণেক নিরাশায় দোদুল্যমান্ হইতে লাগিল।

তখন ধীরবুদ্ধি শঙ্কর বলিলেন,—

“প্রতাপ, একান্তমনে, ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিলে, তাহা ব্যর্থ হয় না। তাঁহার ইচ্ছা, তিনিই পূর্ণ করিবেন। কি উপায়ে, কেমন করিয়া যে তাহা হইবে, তাহা তিনিই জানেন। আমরা তাহার অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিতে গেলে অন্ধকার দেখিব মাত্র।”

প্রতাপ। সে কথায় আর এতটুকুও সন্দেহ নাই। তবু ভাই কি জানো,—যে অবধি না মনে একটা প্রবল বল পাইতেছি, সে অবধি অটল আস্থায় আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না।

শঙ্কর। এইবার সেই অটল আস্থা পাইবে। আমার মনে হইতেছে, সম্রাট-সাক্ষাৎই, তোমার সর্ব্ব অভীষ্টের সহায় হইবে।

প্রতাপ। বল,—তাই হউক। সেই আশায় বুক বাঁধিয়া ত বাটী হইতে বাহির হইয়াছি। মা ভবানীও যেন আমার কাণে কাণে সেই কথা বলিয়াছেন। তবুও কেমন সংশয়যুক্ত মন!——না ভাই, না; তোমার ন্যায় আজিও আমি সেই সর্ব্বশুভঙ্করীর চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে শিখিলাম না। মাগো, মনে বল দাও!

নৌকা অবিরাম গতিতে চলিতেছে। কত দেশ, কত নগর, কত জনপদ অতিক্রম করিল। নৌকা বাঙ্গালা মুলুক ছাড়াইল। অতঃপর রাজমহল, পাটনা, বারাণসী, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতিও অতিক্রম করিল। প্রতাপ ক্রমেই আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। হিন্দুর অতঃপতন

ও মোগলের পূর্ণ-উত্থানের দৃশ্যাবলী তাঁহার চক্ষে বিষাক্ত শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। এবার তিনি আপনমনে বলিলেন,—

"অহো, কি দুর্ভাগ্য! যাহাদের দেশ, যাহাদের জন্মভূমি, তাহারা আজ নিরন্ন ও বিবস্ত্র,—আর যাহারা জেতা ও বলবান্, তাহারাই ভোগৈশ্বর্য্যে বিহ্বল! স্বাধীনতার লীলা-ক্ষেত্র, বীরত্বের সজীব উৎস, পৃথিবীর নন্দনকানন,—হিন্দুস্থানের আজ কি মর্ম্মান্তিক শোচনীয় পরিবর্ত্তন! হিন্দুজীবনের আজ কি দারুণ অভিশাপ! হা ঈশ্বর! তোমার সৃষ্টিতে এমন হয় কেন? এ দুঃখের কি কোন প্রতিকার নাই? জেতা বিজেতাকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখে কেন? মানুষ মানুষকে এত সামান্য ভাবে কেন? এই পতিত হিন্দুর—এই পতিত জাতির কি পুনরুদ্ধার হইবে না? আবার কি এ জাতি সিংহবলে বলীয়ান্ হইয়া, মোগল-বিরুদ্ধে অসি ধরিতে পারিবে না? আবার কি সমগ্র হিন্দু এক হইয়া, গৃহবিচ্ছেদ ভুলিয়া, আপনাদের দেশ আপনারা লইতে সমর্থ হইবে না? উত্থান পতন, হ্রাস বৃদ্ধি, আলোক অন্ধকার,—তো তোমার নিয়ম; তবে হিন্দুর ভাগ্যে—বিশেষ বাঙ্গালী-জীবনে তাহার ব্যতিক্রম হয় কেন প্রভু?"

দরবিগলিতধারে প্রতাপের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তের মনেও এই ভাব বিরাজ করিতেছিল। তাঁহারাও ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামীর চরণে, আপনাদের মর্ম্মব্যথা জানাইতেছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা আগ্রা পঁহুছিলেন। এতদিনে তাঁহাদের ভাবময় জীবন, কর্ম্মময় জীবনে পর্য্যবসিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শুভ দিনে, শুভ মুহূর্ত্তে, বহুবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য লইয়া, প্রতাপ সম্রাট-সভায় উপনীত হইলেন। মানস-চক্ষে এতদিন তিনি যাহা কল্পনায় অবলোকন করিতেছিলেন, আজ চর্ম্ম-চক্ষে তাহা দেখিলেন। দেখিয়া, মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। সকলের অলক্ষ্যে, পলকের জন্য তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

মোগলকুলতিলক স্বয়ং বাদসাহ আকবরের দরবার। জনসাধারণের চক্ষে তাহা স্বর্গ-শোভা হইলেও,—সেই উচ্চাশয়, স্বাধীনপ্রকৃতি, বঙ্গীয় বীর প্রতাপাদিত্যের চক্ষে তাহা অন্যরূপ বোধ হইল। তিনি দেখিলেন, দরবারের শিরোদেশস্থ সেই মণি-মুক্তা-খচিত চন্দ্রাতপ,—সহস্র সহস্র হিন্দুর হৃদয়ের রক্তে নির্ম্মিত। সম্রাটের সেই স্বর্ণময় সিংহাসন,—অগণিত নরনারীর উত্তপ্ত অশ্রুতে গঠিত।—আর যে বিজয়-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া, সম্রাট সমগ্র ভারতের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন,—সেই মণিময় মুকুট—স্বাধীনতার সেই উজ্জ্বল নিদর্শন,——তাহা দেখিয়া প্রতাপের হৃদয়ে দারুণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল।

মনের এই ভাব, অথচ মুখে তাহার একটুকুও লক্ষণ প্রকাশ নাই। প্রতাপ নিমেষমধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে, দরবারের সেই শোভা বা তাঁহার আপন মনের এই বিকট আভা দেখিয়া লইলেন। দেখিয়াই, সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইলেন।—স্থির, অচঞ্চলভাবে তিনি চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সম্রাটের আসন হইতে কিছু দূরে পর্-পর্ আসন নির্দ্দিষ্ট,—যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য-স্থান নির্ণীত। প্রতাপ সসম্ভ্রমে যথাবিধি 'কুর্ণিস'

করিয়া, সম্রাটের সম্মুখীন হইলেন। একজন প্রধান সচিব, প্রতাপের সবিশেষ পরিচয় দিলেন। সম্রাট্ যথারীতি শিষ্টাচার বা রাজকায়দা দেখাইয়া, প্রতাপকে উপবেশন করিতে বলিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতাপ অতি অল্প দিন মধ্যে সম্রাটের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত মিশিলেন। মিশিয়া, মোগলদিগের রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি, স্বভাব-সংস্কার,—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইলেন। কোন্ স্থানে মোগলের মহত্ত্ব আর কোথায় বা মোগলের ক্ষুদ্রত্ব,—সেটি বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এইরূপে তিনি একে একে সম্রাট-সভার ভূষণস্বরূপ—বীরবল, টোডরমল্ল, মানসিংহ, ফৈজী, আবুল্‌ফজেল,—এমন কি কুমার সেলিমের নিকটও বিশেষ পরিচিত হইলেন। লোকচরিত্রে প্রতাপ চিরদিনই বিশেষ অভিজ্ঞ। তাহার উপর আলাপ-আপ্যায়ন ও মনোমুগ্ধকর কথাবার্ত্তায়ও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সুতরাং অল্লায়াসে সকলের সহিতই তিনি মিশিলেন,—সকলের প্রিয় হইলেন,—সকলের মনের ভাবও কিছু কিছু বুঝিয়া লইলেন।

অবশিষ্ট রহিল, প্রতাপের—সম্রাটের সহিত মেলা-মেশা। তা বিধাতার ইচ্ছায়, সে সাধও তাঁহার অপূর্ণ রহিল না। সাধ অপূর্ণ হওয়া দূরে থাক্,—শুভক্ষণে, এক দিনের একটি সামান্য ঘটনায়, তিনি সম্রাটের হৃদয়ের উপর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিলেন, এবং সেই হইতেই তাঁহার সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

গুণগ্রাহী সম্রাট্ আকবর, একদিন পাত্র-মিত্র-অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া,—কবি-বিদ্বান্-গুণিজন-বেষ্টিত থাকিয়া, সুকুমার কাব্যালোচনায় তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন। রাজকবি ফৈজী ও আবুলফজেল নানাবিধ কবিতা ও পার্শী গজেলাদি আবৃত্তি করিয়া, সম্রাটের চিত্তরঞ্জনে নিযুক্ত। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ, ভাবে গদ-গদ হইয়া, কবিদ্বয়ের মুখনিঃসৃত পদাবলীর

সহিত, আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। এই অবসরে যার যতটুকু বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও রসাভিজ্ঞতা,—বাক্‌ভঙ্গি কৌশলে ও নেত্রবক্ত্র বিকারে,—সে সেই পরিমাণ ক্ষমতা দেখাইবার সুযোগ ছাড়িল না। কবিতানুশীলনের পর সমস্যাপূরণ, পাদপূরণ প্রভৃতিও চলিতে লাগিল। ইহাতেও গুণগ্রাহী সম্রাট্, সভ্যগণের গুণের পরিচয় লইতে লাগিলেন। এই বিদ্বজ্জন-সভায়, এদিন, প্রতাপাদিত্যও উপস্থিত ছিলেন।

কিছুক্ষণের পর সম্রাট্ স্বয়ং একটি পদ আবৃত্তি করিয়া, সভ্যগণকে তাহা পূরণ করিতে বলিলেন। মধ্যে মধ্যে এইরূপ সমস্যাপূরণ উপলক্ষ্য করিয়া, তিনি সভ্যগণের বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা লইতেন। এ দিনও সেই-রূপ পরীক্ষা লইবার মানস করিয়া, সমাগত সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—

"শ্বেতভুজঙ্গিনী যাত চলি হেঁ"—এই সমস্যাটি তোমরা পূরণ কর দেখি। দেখিব, ইহাতে তোমরা কে কতটা শক্তির পরিচয় দাও!"

সভ্যগণ একে একে, ভালয়-মন্দে মিলাইয়া সমস্যাটি পূরণ করিলেন। কাহারও পূরণ, মন্দের ভাল হইল,—কাহারও চলনসই হইল,—কাহারও বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তম হইল। কিন্তু কোন পূরণই সম্রাটের মনে ধরিল না। তিনি তাহা আকার-ইঙ্গিতে জানাইলেন,—সভ্যগণও তাহা আপনা হইতে বুঝিতে পারিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, সম্রাট্ কিছু ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন,—

"আমার এই বিদ্বজ্জন-সভায় কি এমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত নাই, যিনি ইহা অপেক্ষা উত্তমরূপে ও স্বাভাবিকভাবে অদ্যকার এই সমস্যাটি পূরণ করিতে পারেন?"

সম্রাটের এই প্রশ্নে, সেই রসাভিষিক্ত পণ্ডিতসভা, সহসা অতি নিস্তব্ধ

গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তৎসঙ্গে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মুখও একটু একটু শুকাইল। সকলে হেঁটমুখে ভূমিপানে চাহিয়া রহিলেন।

সকল সভ্যের পশ্চাৎ হইতে একটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ যুবক উঠিয়া সম্রাটকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া, নির্ভীকচিত্তে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"জাঁহাপনা! যদি অনুমতি হয়, তবে এ দাস একবার চেষ্টা করিতে পারে।"

সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, সর্ব্বপশ্চাৎ হইতে এই ধ্বনি উত্থিত হইবামাত্র, সভ্যগণের সমবেত দৃষ্টি, এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইল। যুবকের সেই উন্নত ললাট, বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ আকৃতি ও আড়ম্বরবিহীন তেজস্বী ভাবভঙ্গী, ইতিপূর্ব্বে অনেকেই দেখিয়াছে, স্বয়ং সম্রাটও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন,—কিন্তু সময়গুণে, আজিকার এই ঘটনায়, তাহা সকলেরই বিশেষরূপে মন আকর্ষণ করিল। সম্রাট-সভার প্রত্যেক সভ্যই তখন যেন দেখিতে লাগিলেন,—এই তেজস্বী যুবক, কোন-না-কোন অংশে কিছু অসাধারণ। তাঁহারা সভার জনতা বৃদ্ধি করিতেছেন মাত্র,—কিন্তু এই যুবক যেন সেই জনতার মধ্য হইতেও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। তখন সকলে, কতকটা বিস্মিতভাবে সেই প্রতিভাবান্ যুবকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সম্রাট্ কহিলেন, "তুমি স্বচ্ছন্দে আমার এই সমস্যাটি পূরণ করিতে পার।"

এই বলিয়া পদটি পুনরায় আবৃত্তি করিলেন,—

"শ্বেত ভুজঙ্গিনী যাত চলি হেঁ।"

প্রতাপ অতি সরলভাবে, সুললিত ভাষে, স্বভাব-অলঙ্কারের যথোচিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, সমস্যাটি পূরণ করিলেন। *

* সেই সমস্যাপূরণের পদগুলি যে ঠিক কি, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতে

সম্রাট্, প্রতাপের সমস্যাপূরণ শুনিয়া, বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "যুবক! আমার এই বিদ্বজ্জন-সভায়, আজ তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিলে। তোমার সমস্যাপূরণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সুললিত ও স্বভাবসঙ্গত হইয়াছে। আমি তোমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। আজ হইতে তুমি আমার সভার একজন প্রধান সভ্য হইলে।"

সম্রাট্ প্রতাপকে বিশিষ্টরূপে পুরস্কৃত করিলেন এবং তাঁহাকে নানা-বিধ মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার দিলেন।

এই ঘটনা হইতে প্রতাপ, আকবরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। আকবর প্রতাপকে বিশেষ প্রিয়চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এই প্রিয়-দৃষ্টি হইতে স্নেহ, ভালবাসা, আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি,—একে একে সকলই আসিল। প্রতাপ সম্রাটের হৃদয়ের উপর প্রগাঢ় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত তিনি আকবর-চরিত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন;—আকবরের সেই অতি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির মূলতত্ত্ব বুঝিয়া লইলেন;—এবং তৎসঙ্গে সেই চির-উচ্চাভিলাষী যুবক, জীবনের চির-আশা ও প্রাণের দারুণ তৃষা মিটাইবার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, উপকৃত হইব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একাদিক্রমে, এমন তিন চারি বৎসর কাল সম্রাট-সভায় মিলিয়া-মিশিয়া,—প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত মিত্রতা করিয়া,—ভারত শাসন-সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানিয়া-শুনিয়া,—অধীন রাজন্যবর্গ ও সাধারণ প্রজামণ্ডলীর প্রতি তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া,—সর্ব্বোপরি খোদ সম্রাটের রাজ-নীতিচক্র অবগত হইয়া, প্রতাপ প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, রাজনীতি নামক পদার্থটি বড় বিষম পদার্থ। এ পদার্থটি লাভ করিতে হইলে, সময়ে সময়ে অনেক অপদার্থেরও উপাসনা করিতে হয়। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রটিও বড় বিষম ক্ষেত্র। খাঁটী মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্ম-জীবন লইয়া, এ ক্ষেত্রে যিনি বিচরণ করিব মনে করেন, তাঁহার ইহকাল-পরকাল—দুই-ই নষ্ট হয়। এই যে সম্রাট-কুলতিলক আকবর,—জগৎ জুড়িয়া যাঁহার নাম,—বিশাল ভারত যাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত,—তাঁহার মূল নীতি কি? যুদ্ধ বা সন্ধিবিগ্রহ, শান্তিস্থাপন বা রক্তপাত,—কোন্ নীতিবলে তিনি কর্ত্তব্য অবধারিত করেন? কোন্ নীতিবলে তিনি দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত ও পাঠান-শক্তি চিরকালের জন্য ভারত হইতে অন্তর্হিত করিয়াছেন?—আর কোন্ নীতি অবলম্বনেই বা, অপেক্ষাকৃত স্বল্পশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও, প্রবল প্রতাপে ভারতশাসনে সমর্থ হইতেছেন?

প্রতাপ, আনুপূর্ব্বিক ভাবিয়া দেখিলেন,—বিনা কৌশলে, বিনা কূটনীতির পরিচালনায়, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। বুঝিলেন,

রাজনীতি-ক্ষেত্রে সরল শিশুর প্রাণ, কিংবা নারীর হৃদয়, অথবা ধার্ম্মিকের ধর্ম্মজীবন লইয়া বিচরণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ধীরে ধীরে তিনি এক মহা-রাজনৈতিক চাল চালিলেন। সে চালে স্বয়ং সম্রাট্ আকবরও হটিলেন। সে কথা পরে বলিব।

ইত্যবসরে দূরদর্শী প্রতাপ, প্রাণোপম বন্ধু শঙ্করকে লইয়া পঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। সকল স্থানের অবস্থা ও মনুষ্য-প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। সূর্য্যকান্ত আগ্রাতে থাকিয়াই, মোগলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সূর্য্যকান্তের জীবনে এক বিপর্য্যয় ঘটিল।

মোগলদিগের সহিত অধিকতর মিশিবার জন্য, সূর্য্যকান্ত পূর্ব্ব হইতেই আরব্য ও পারস্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং অল্পদিনে তাহাতে কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উক্ত ভাষায় অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য, তিনি আগ্রাবাসী এক মৌলবীর নিকট, রীতিমত অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তোরাব আলি নামে একজন শিক্ষিত মোগল এই সময় আগ্রায় বাস করিতেন। অনেক হিন্দু ও মুসলমান, তোরাবের নিকট শিক্ষালাভ করিত। তোরাব সুপুরুষ, বয়সে প্রৌঢ়। আরবী ও পারসী ভাষায় একজন সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তোরাবের গুণ ছিল অনেক; কিন্তু একদোষেই সে সকল গুণ মাটী হইয়াছিল।—তোরাব অতি-বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও সন্দিগ্ধচেতা ছিল।

ফুলজানি নামে একটি বালিকা তোরাবের নিকট ছিল। তোরাব বলিত, বালিকাটিকে সে কুড়াইয়া পাইয়াছে। বালিকা কোথা হইতে আসিয়াছে,—কেমন করিয়া তোরাব তাহাকে পাইয়াছে,—সে কথা তোরাব কাহাকে বলে নাই। কেবল একজন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে

এইমাত্র বলিয়াছিল,—'কোন জলদস্যু এই বালিকাটি আমাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে।'

তোরাবের মনে বড় আশা ছিল যে, ফুলজানি বড় হইলে, তোরাব তাহাকে বিবাহ করিবে। ফুটন্ত মল্লিকার মত বালিকার সেই অপরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া, তোরাব মনে মনে অনেক সুখের কল্পনা করিত। তাহাকে মনোমত সাজে সাজাইয়া এবং নানা কাব্য শুনাইয়া, তোরাব অপার আনন্দলাভ করিত। কিন্তু যে কারণেই হউক, একদিনের জন্যও সে, এই বালিকার মন পাইত না। সংসারে তোরাবের আর কেহ ছিল না। দূরসম্পর্কীয়া একমাত্র বৃদ্ধা আত্মীয়া তাহার গৃহে থাকিত। তোরাব তাহাকে 'আয়ি' বলিয়া ডাকিত। ফুলজানিকে প্রথমে তোরাব এই আয়ির নিকট রাখিয়া দেয়। কিন্তু ফুলজানি কিছুতেই মুসলমানের অন্ন খাইতে চাহে নাই। অগত্যা তোরাব তাহার বাটীর সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র গৃহে ফুলজানিকে রাখিয়া দিল। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ, বালিকার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিল।——বালিকা কি তবে হিন্দু ?

হিন্দু কি,—কি, তোরাব তাহা কাহাকে জানিতে দিত না। তাহার মনে বড়ই আশা ছিল, দু'দিনে হউক, দু'মাসে হউক, দু'বৎসরেই হউক, —ফুলজানি একদিন-না-একদিন তাহাকে ভালবাসিবে,—একদিন-না-একদিন তাহাকে আত্মসমর্পণ করিবে। এত যত্ন, এত অনুরাগ, এত ভালবাসা,—সকলই কি বিফল হইবে ? কিন্তু মূর্খ তোরাব,—প্রণয়-দেবতার প্রসন্নতালাভে, তাহার কোন বিদ্যাই খাটিল না।

এই সময়ে সূর্য্যকান্ত তোরাবের অন্যতম শিষ্য হইলেন। সূর্য্যকান্তের সেই বীরোচিত দেহ, তদুপরি বীরত্বমহিমাপূর্ণ রূপরাশি,—সেই সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপ্ত রূপ-শ্রী,—তোরাবের মন আকর্ষণ করিল। সূর্য্যকান্ত

তোরাবের গৃহে আসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। যে গৃহে ফুলজানি থাকিত, তোরাব, তাহারই অন্যতর প্রকোষ্ঠে, সূর্য্যকান্তকে শিক্ষা দিতেন।

কারণ, কার্য্য ও কালের সংঘটন হইল।—প্রেমে ঈর্ষা মিশিল।—সূর্য্যকান্তকে উপলক্ষ্য করিয়া, তোরাবের হৃদয়ে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তোরাব আলি ফুলজানিকে যথেষ্ট বিলাসিতার মধ্যে রাখিয়াছিল। মোগল-রমণীগণ যে সমস্ত মূল্যবান্ সৌখীন্ দ্রব্য-সামগ্রীতে গৃহ সজ্জিত রাখে, ফুলজানির গৃহও সেই সকল দ্রব্যে সজ্জিত ছিল। ফুলজানির জন্য তোরাব বহুমূল্য মোগল-পরিচ্ছদ কিনিয়া দিয়াছিল। তোরাবের যত্নে ফুলজানি কিছু কিছু লিখিতে-পড়িতেও শিখিয়াছিল। কিন্তু এত সত্বেও ফুলজানির মনে সুখের লেশমাত্রও ছিল না। মোগলের বিলাস-দ্রব্যে তাহার প্রবৃত্তিই ছিল না। মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে, বালিকা কত রাত্রি বিনিদ্রনয়নে অনশনে ভূমিতলে পড়িয়া কাটাইয়াছে।

আবার এদিকে, ফুলজানির মন পাইবার জন্য, তোরাবও সকল কষ্ট সহিত। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় টুকুতে তখন প্রণয় দেবতা নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিলেও, তোরাব উঠিতে বসিতে প্রণয়-কাহিনী শুনাইয়া, আপনার ভালবাসার পরিচয় দিয়া, জীবনের সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত বুঝাইয়া, ক্রমে ক্রমে বালিকার চক্ষু ফুটাইতে লাগিল। বালিকা অতি অল্পদিনেই যেন সকলই বুঝিতে শিখিল।

পক্ষান্তরে, যে দিন হইতে সূর্য্যকান্ত তোরাবের শিষ্য হইয়াছেন, সেইদিন হইতেই ফুলজানির অন্তরে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। সূর্য্যকান্ত বুঝিতেন না যে, তাঁহার অলক্ষ্যে দুইটি বিশাল আঁখি তাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইয়া আছে! বুঝিতেন না যে, তাঁহার মূর্ত্তি লইয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, তাহার জীবনের কতখানি সুখ-দুঃখের রচনা করিতেছে! দুই একবার ফুলজানি ও সূর্য্যকান্তে দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে,—

তাহাও তোরাবের সাক্ষাতে; এবং দুই একটা কথাবার্ত্তাও হইয়াছে,—তাহাও তোরাবের সম্মুখে। বিশেষ সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে তখন স্বদেশের স্বাধীনতা-স্বপ্ন জাগিতেছিল,—সেই স্বপ্নে তিনি তখন বিভোর;—সুতরাং অন্য চিন্তার অবসরই তাঁহার ছিল না। মোগলের নিকট এই যে ভাষা শিক্ষা, ইহাও সেই স্বপ্নের সাফল্য হেতু।

স্বপ্ন ?—কে জানে, বাঙ্গালীর স্বাধীনতা-সুখ-আশা, স্বপ্ন বৈ আর কি হইতে পারে ? স্বপ্ন হউক,—কর্ম্মবীর সূর্য্যকান্ত, স্বপ্ন সত্য বলিয়াই জানিতেন। কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্যচ্যুতি হয় নাই।

কিন্তু ফুলজানি মনে মনে সূর্য্যকান্তকে বড়—বড় ভালবাসিল। প্রাণের সমান ভালবাসিল। কোথা দিয়া কি ভাবে এ ভালবাসা আসিল, তাহা বুঝানো দায়। সূর্য্যকান্তকে একদিন না দেখিলে, বালিকার কষ্টের সীমা থাকিত না। সূর্য্যকান্ত আসিয়া তোরাবের পার্শ্বে বসিতেন, পাঠ লইয়া চলিয়া যাইতেন,—সেই অবসরে, সেই অল্পসময়ের মধ্যে, বালিকা দূরে দাঁড়াইয়া অতৃপ্তলোচনে সূর্য্যকান্তকে দেখিতে থাকিত। দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া পড়িত।

সূর্য্যকান্ত কিছুই জানিলেন না, কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত তোরাব অতি শীঘ্রই সমস্ত বুঝিল ও জানিল। অধিকন্তু তোরাবের অত্যাচারে, ফুলজানি একদিন সকল কথাই বলিয়া ফেলিল।

শুনিয়া তোরাব মর্ম্মাহত হইল। সহসা যেন তাহাকে কালসর্পে দংশন করিল। সে দংশন ক্রমে অসহ্য হইল। উঠিতে বসিতে কোন-না-কোন ছলে সে, ফুলজানির উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। অথচ শিষ্যকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। বালিকা নীরবে সেই অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল।

একদিন তোরাব ফুলজানিকে বড়ই মর্ম্মপীড়া দিল। তাহার পিতা

মাতাকে উদ্দেশ করিয়া, অযথা অনেক কথা শুনাইল। কোমলহৃদয়া বালিকা, বড় কষ্টে সে যন্ত্রণা সহিল। নীরবে, শতধারে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তোরাব—পাপিষ্ঠ তোরাব, শেষ তাহাকে মুসলমানের অন্ন খাইতে বলিয়া বলিল,—

"তোমার হিঁদুয়ানির বড়ায়ে আর কাজ নাই! পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাও,—আমার কথা শুন। আমাকে বিবাহ করু,—সুখে থাকিবে। নহিলে তোমার অদৃষ্টে আরো অনেক দুঃখ আছে। এ কথা নিশ্চিত জানিও।"

ফুলজানি কাঁদিতেছিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"তুমি আর যাহা বল, তাহা শুনিব,—কিন্তু তোমার অন্ন খাইব না, কিংবা তোমাকে বিবাহও করিব না।"

তোরাব ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—

"যাহা খাইতেছ, ইহা কি আমার অন্ন নহে? তোমারই অনুরোধে, দয়া করিয়া এতদিন একজন ব্রাহ্মণ-পাচক রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আর না! আর আমি তোমার কোন কথা শুনিব না। আমার এত ভালবাসার উপযুক্ত পুরস্কার তুমি দিয়াছ! আমার কোমল স্বভাব তোমা হইতেই এমন কর্কশ হইয়াছে! কি বলিব ফুলজানি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! তোমায় না দেখিলে, আমার এ অধঃপতন ঘটিত না। তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াই, এই প্রৌঢ়বয়সে আমি বিবাহে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি। নহিলে এই গ্রন্থরাশিই আমার সকল সুখের আধার ছিল।"

তোরাব মুহূর্ত্তকাল আপন কপাল টিপিয়া ভূমিপানে মুখ নত করিয়া রহিল। শেষে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"এখনো বল, তুমি আমার হইবে কি না?"

ফুলজানি অবনতমুখী হইয়া নীরবে কাঁদিতেছিল; তোরাবের কথা শুনিয়া সমভাবেই কাঁদিতে লাগিল।

তোরাব আবার বলিল,—

"ফুলজানি, এখনও ভাবো! তুমি, যে হিন্দু-যুবাকে এত ভালবাসিয়াছ, সে ইহার কিছুই জানে না।—হায়, তবুও তুমি তাহাকে ভালবাস! আর আমি যে এতদিন ধরিয়া কায়মনোবাক্যে সাধ্যসাধনা করিয়া আসিলাম, তাহার প্রতিদান তুমি খুবই দিলে!—এই তোমার হিঁদুয়ানীর বড়াই? হিন্দু-রমণীর এই কৃতজ্ঞতা?"

ফুলজানি তবুও নীরব—কাঁদিতে কাঁদিতে সব শুনিয়া যাইতে লাগিল। তোরাব বলিতে লাগিল,—

"দেখ ফুলজানি! তুমি নিতান্ত বালিকা নও,—আপন ভালমন্দ বুঝিতে পার। যে হিন্দু যুবাকে তুমি ভালবাসিয়াছ, আমি মনে মনে তাহারও শত্রু হইয়াছি। আরও ভাবিয়া দেখ, সেই হিন্দুযুবা, কখনই মুসলমানীকে গ্রহণ করিবে না। আমি বুঝাইয়া দিব, তুমি আমার পরিণীতা ভার্য্যা! তবুও যদি তাহার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে,—তবে তোমাকে প্রাণে মারিব,—এ কথা স্বরূপ বলিলাম!"

ফুলজানি তথাপি নীরব; সেই নীরবেই কাঁদিতে লাগিল।

এবার তোরাব কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, তুমি কি মরিতেও ভয় কর না?"

এবার ফুলজানিও কথা কহিল; কষ্টের হাসি হাসিয়া, একরূপ অপরূপ-স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"হিন্দুর মেয়ে মরিতে ভয় করে না!"

তোরাব। তবে, যে তোমার প্রণয়ের দেবতা, তাহাকেই প্রাণে মারিব,—আমার পথ নিষ্কণ্টক করিব!

ফুলজানি শিহরিয়া উঠিল। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল,—"শিষ্যহত্যা!"

তোরাব। শিষ্য—গুরুহত্যা করিতে পারে, আর গুরু শিষ্য-হত্যা করিতে পারে না? দেখ, আমি মুসলমান,—আমি গুরুশিষ্য সম্বন্ধ-বিচার করিব না,—আপনার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, যে-কোনও উপায় অবলম্বন করিব।

ফুলজানি আর কথা কহিল না,—কথা কহিতে পারিল না;—নীরবে, মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায়, ধরাতল নিষিক্ত করিতে লাগিল। তাহার বুকের ভিতর যেন শত-বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল।

তোরাব বলিল, "আজ তোমাকে আমার অন্ন খাইতেই হইবে।"

ফুলজানি। আমায় ক্ষমা কর। যদি কখন তোমায় ভালবাসিতে পারি, তোমার অনুরোধ রাখিব—এখন আর আমায় কিছু বলিও না।

তোরাব কিছু নরম হইল, সে দিন আর কিছু বলিল না,—চলিয়া গেল।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ফুলজানি মুক্তহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে যুক্তকরে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল,—"হরি দয়াময়! দুঃখিনীকে দয়া কর। অসহায়ার গতি কর। এ তাপিত তনয়ার জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর।"

হৃদয়-ভার একটু লাঘব হইলে বালিকা মনে মনে বলিল,—

"আচ্ছা, আমি ভালবাসিলেই যদি তোরাব সুখী হয়, তবে আমি ভাল না বাসি কেন? সূর্য্যকান্তকে আমি ভালবাসি সত্য; কিন্তু কেহ ত তাহা আমায় বলিয়া দেয় নাই? তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি আপনা হইতেই ভাল বাসিয়াছি। আর তোরাবকে, এত চেষ্টা করিয়াও ভালবাসিতে পারিলাম না!—না, দোষ আমার নয়,—এতটুকুও নয়,—তোরাবের সেই পৈশাচিক অত্যাচার মনে হইলেও

দারুণ ঘৃণায় আমার প্রাণ জ্বলিয়া যায়,—সে পাপিষ্ঠকে ভালবাসিব কিরূপে? থাক্,—সে কথা আর তুলিব না।—মা আমার!' কি দুঃখই বিধাতা আমাদের কপালে লিখিয়াছিলেন! হায় মা! দুঃখিনী কন্যাকে ফেলিয়া, শেষে আত্মঘাতিনী হইলে! উঃ! তোরাব, তোমারই অত্যাচারে, মা আমার আত্মঘাতিনী!—আমি তোমায় ভাল বাসিব? তুমি ইহাও আশা কর?—হায়! মার সঙ্গে আমিও মরিলাম না কেন? হরি! এত দুঃখও আমাদের কপালে লিখিয়াছিলে?"

দীপ নিবিয়া গেল। সেই আঁধার ঘরে—আঁধার জীবন লইয়া, আর্দ্রভূমিতে আছাড়িয়া পড়িয়া, দুঃখিনী বালিকা, নিখিলের ব্যথাহারীকে মর্ম্মব্যথা জানাইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন সূর্য্যকান্ত আসিলে, তোরাব বলিল,—

"সূর্য্যকান্ত, আগ্রায় আর তোমরা কতদিন থাকিবে?"

সূর্য্যকান্ত। এখনও কিছু ঠিক নাই। আমরা যে শীঘ্র দেশে ফিরিব, এমন সম্ভাবনাও কিছু দেখি না।

তোরাব আপনার কপাল টিপিয়া ধরিল; বলিল, "তোমার সহচরগণ এখন কোথায়?"

সূর্য্যকান্ত। প্রতাপ ও শঙ্কর,—এখন পঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করিতেছে।

তোরাব। এই অল্পদিনে তুমি আরব্য ও পারস্যভাষায় যেরূপ পারদর্শী হইয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি!

সূর্য্যকান্ত। সে আপনারই অনুগ্রহ। আপনার অনুগ্রহে কেবল ভাষাশিক্ষা নহে,—আমি মোগলসমাজের রীতি-নীতিও কিছু কিছু শিখিয়াছি।

তোরাব। মোগলচরিত্রের বিশেষত্ব কিছু দেখিলে?

সূর্য্যকান্ত। অতি অল্পসংখ্যক মোগলকে বাদ দিয়া, অন্য সাধারণের চরিত্রে, বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বড়ই আধিক্য দেখি। অনেক সময় আমার মনে হয়,—যদি কখন মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, তবে এই বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই, তাহার এক প্রধান কারণ হইবে। নহিলে,—মোগল তেজস্বী, উৎসাহী, রাজনীতিজ্ঞ এবং রাজগুণেও ভূষিত বটে। কিন্তু সাধারণ মোগল বড়ই অত্যাচারী ও স্বভাবতঃ

অতি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি। দয়ামায়া তাহাদের বড় কম। সম্রাট্ আকবরের যে রাজনীতিকৌশল, তাহা অতি সুন্দর। কিন্তু আমার মনে হয়, সেলিম কি খস্রু,—বাদসাহের এ কৌশল সম্যক্‌রূপ বুঝিবেন না, এবং তাঁহার কি তৎপরবর্ত্তী বাদসাহগণও এই কৌশলে চলিবেন না। তাহাতেই তাঁহাদের অধঃপতন ঘটিবে। মোগল কিছু বেশী পরিমাণে ইহকালসর্ব্বস্ব,—ইহজীবনের সুখ-দুঃখ-চিন্তায় কিছু বেশী ব্যস্ত,—কিছু অধিক স্বার্থপর,—এবং অন্যের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াও আপনার পথ নিষ্কণ্টক রাখিতে যত্নবান্।

তোরাব। হিন্দু কি এ পক্ষে উদাসীন?

সূর্য্যকান্ত। এ কথা বলিলে অযথা বলা হইবে না যে, হিন্দুর ন্যায় আত্মত্যাগ করিতে পৃথিবীর কোন জাতি জানে না!

তোরাব। এটা হিন্দুর বড়াই মাত্র।

সূর্য্যকান্ত। মোগল তাহাই ভাবিয়া থাকেন বটে; কিন্তু যাঁহারা হিন্দুচরিত্র বিশেষরূপে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহা সত্য কি না।

তোরাব আর অধিকদূর অগ্রসর হইলেন না। শিষ্যকে বসিতে বলিয়া, কোথায় উঠিয়া গেলেন।

সূর্য্যকান্ত একান্তমনে আপন পাঠ পড়িতে লাগিলেন। সহসা কে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সূর্য্যকান্ত চাহিয়া দেখিলেন,—অনিন্দ্যসুন্দরী সেই বালিকা মূর্ত্তি—ফুলজানি। ফুলজানি ইতিপূর্ব্বে যেন অনেকক্ষণ অবধি কাঁদিয়াছিল, তাই তাহার চোখের কোলে এখনও জলের দাগ আছে। সূর্য্যকান্ত সস্নেহে জিজ্ঞাসিলেন,—

"ফুলজানি! তুমি কি কাঁদিয়াছিলে?"

ফুল। আমি তো রোজই কাঁদি, আপনি কি জিজ্ঞাসা করেন?

সূর্য্য। তুমি রোজ কাঁদ? কেন কাঁদ? আমি কেমন করিয়া জানিব? জানিলেই বা কি করিতে পারি?

ফুল। আমার বেশী কথা বলিবার অবসর নাই, তোরাব এখনই ফিরিয়া আসিবে। কেবল দুইটা কথা বলিয়া যাই,—আপনি শুনিবেন কি?

সূর্য্য। তুমি কে, জানি না ;—কি বলিবে বল।

ফুল। এই মোগল অতি পাপিষ্ঠ ও নরাধম,—ইহাকে বিশ্বাস করিবেন না। আমি আপনার শরণ লইলাম, আপনি আমায় উদ্ধার করিবেন।

সূর্য্যকান্ত কিছু বুঝিলেন না, ফুলজানির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ফুলজানিও কিছু বলিতে পারিল না। কি বলিবে-বলিবে করিয়া বলিতে পারিল না,—সে কাঁদিতে লাগিল। সেই সুন্দর মুখখানি নত করিয়া, ভূমিপানে চাহিয়া, নীরবে কাঁদিতে লাগিল। ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বারিবিন্দু ধরাতল নিষিক্ত করিতে লাগিল।

সূর্য্যকান্ত কিছু না বুঝিলেও বুঝিলেন,—এই বালিকা নিশ্চয়ই বিশেষ কোন মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছে,—আমায় সব খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না।

সূর্য্যকান্ত সাহস দিয়া বলিলেন,—

"ফুলজানি, আমি হিন্দু, দরিদ্র যুবক ;—আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয়, তাহা আমি নিঃসঙ্কোচে করিতে পারি।"

ফুলজানি চক্ষু মুছিতে মুছিতে গদগদকণ্ঠে বলিল,—

"আপনাকে আমায় এই নরক হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে আপনারও বিপদ!"

সূর্য্য। উদ্ধার!—আমার বিপদ! এ সকল কি, কিছুই বুঝিতেছি না।

ফুল। এই মুসলমান আপনার প্রাণবধ করিবে!

সূর্য্য। প্রাণবধ!—আমার অপরাধ?

ফুলজানি কিছু ইতস্ততঃ করিল; শেষ অবনতমুখী হইয়া বলিল,—

"তোরাবের বিশ্বাস, আমি আপনাকে ভালবাসি।"

বালিকার বুকের ভিতর সমুদ্রমন্থন হইতে আরম্ভ করিল।

সূর্য্যকান্ত ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,—"এ কথা কি সত্য?"

ফুলজানি ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিল, এবং সমভাবেই মুখ নত করিয়া, ভূমিপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যকান্তের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই বালিকা তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে!

তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে অনেক কথা সূর্য্যকান্তের মনে জাগিল;—"এই জন্যই কি বালিকা, প্রতি-প্রভাতে বাতায়নপথে আশানেত্রে চাহিয়া থাকে? এই জন্যই কি আমাকে দেখিবামাত্র বালিকা উৎফুল্ল হয়? এই জন্যই কি বালিকা আমাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠে?"

মুহূর্ত্তের জন্য সূর্য্যকান্ত চাহিয়া দেখিলেন,—ফুলজানির সেই লজ্জারাগ-রঞ্জিত অপরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সূর্য্যকান্ত বলিলেন,—

"ফুলজানি! আমার এই শিক্ষক তোরাব,—তোমার কে হন?"

ফুল। আমার কেহই নহে।

সূর্য্য। কেহই নহে? তবে—দেখ, আমি এতদিন এখানে আছি, কখন এ প্রশ্ন মনে জাগে নাই। কিন্তু আজ তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছি।—যদি তোরাব তোমার কেহই নন, তবে কি সম্পর্কে এখানে আছ?

ফুল। সম্পর্ক?—হিন্দুর সহিত মুসলমানের সম্পর্ক!

দূর হইতে তোরাব দেখিল, সূর্য্যকান্ত কাহার পানে চাহিয়া কি

শুনিতেছে। পরে দেখিল, ফুলজানি দ্রুতপদে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল!

সূর্য্যকান্তের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি যথারীতি চলিয়া যাইতেছেন, তোরাব বলিয়া দিল,—“সূর্য্যকান্ত, আপাততঃ কিছুদিন এখানে আসিও না। আমি কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিব।”

তোরাব ফুলজানিকে ডাকিল। ফুলজানি কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ কেহ কিছু বলিল না। শেষ অতি গম্ভীর-ভাবে তোরাব বলিল,—

“ফুলজানি! তোমার বড় সৌভাগ্য যে, আমি এখন অস্ত্রশূন্য আছি! নহিলে এই মুহূর্ত্তেই তোমায় দ্বিখণ্ড করিতাম। উঃ! কি বলিব?—তুমি এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও! এই হিন্দু কাফেরের প্রণয়-প্রার্থিনী তুমি? তাই, ইহার নিকট প্রণয়ভিক্ষা করিতেছিলে?—কতদিন এমন অবসর পাইয়া আসিয়াছ? এই হিন্দুর মেয়ের এত বড়াই?”

নিদারুণ ক্রোধে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া তোরাব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কে বলিবে, তোরাবের পদাঘাত লক্ষ্যচ্যুত হইয়াছিল কি না?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"ফুল,—ফুলবিবি,—ফুলজানি!"

ফুলজানি কথা কহিল না, সে কাঁদিতেছিল।

"ফুলজানি! আমি আসিয়াছি,—দরজা খুলিয়া দাও।"

ফুলজানি আপন মনে কাঁদিতেছিল,—সে উঠিল না, কথাও কহিল না। আগন্তুক পুনরায় ডাকিল, দরজায় আঘাত করিল, তবুও ফুল উঠিল না, উত্তরও দিল না। আগন্তুক বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এই ভাবেই গেল।

পঞ্চমীর চাঁদ অন্ধকার সরাইয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছিল। ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি ছড়াইয়া, জগৎ আলোকে উদ্ভাসিত করিতেছিল। যে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আর্দ্রভূমিতে আছাড়িয়া পড়িয়া ফুলজানি কাঁদিতেছিল, সেই প্রকোষ্ঠের এক মুক্ত বাতায়ন দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্না সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। জ্যোৎস্না, ফুলের অশ্রুপূর্ণ আঁখিদুটীর উপর পড়িয়া, বারিবিন্দুগুলি উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। ফুল ষোড়শী কিশোরী; —অপূর্ব্বসুন্দরী। তাহার রূপে সেই অন্ধকার ঘর যেন আলোকিত হইয়াছিল। সেই আলোর উপর চাঁদের আলো,—দুই আলোক মিশিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছে!

ফুল আপনমনে উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিল না, মুখে চোকে যে অলকা-গুচ্ছ পড়িয়াছিল, সে গুলিও সরাইল না। কাঁচলিশূন্য বক্ষের উপর বিক্ষিপ্ত অঞ্চল খানিও টানিয়া দিল না। তাহার চক্ষে অশ্রু

ঝরিতেছে,—দীর্ঘশ্বাসে তাহার সেই সুকোমল বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। নির্নিমেষ নয়নে ফুল বাতায়ন-পথে চাহিয়া রহিল।

চারিদিকে জ্যোৎস্নার আলো। সেই আলোর মাঝে, সেই বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া, চাহিয়া দেখ,—বোধ হইবে, যেন কোন সুনিপুণ ভাস্কর এই বিষাদ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া এই আঁধারঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে!

আগন্তুক সোহাগভরে আবার ডাকিল, "ফুল,—ফুলবিবি,—আমার ফুলজানি! উঠ,—দরজা খুলিয়া দাও, আমি আসিয়াছি।"

এবার ফুলজানি চমকিয়া উঠিল। সে এতক্ষণ কিছুই শুনিতে পায় নাই। এখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল।

তোরাব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল,—

"গৃহে দীপ নাই কেন? এতক্ষণ তোমার সাড়া পাই নাই কেন?"

ফুলজানি কোন উত্তর না দিয়া দীপ জ্বালিয়া দিল।

তোরাব। ফুল, তুমি কাঁদিতেছিলে বুঝি? এই অন্ধকার ঘরে, এই আর্দ্রভূমির উপর পড়িয়া, নিশ্চয়ই এতক্ষণ কাঁদিতেছিলে?

ফুল একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না।"

তোরাব। আচ্ছা দেখি, তোমার মুখখানি দেখি,—একবার আমার পানে চাহিয়া দেখ দেখি!

ফুলজানি আচ্ছা করিয়া চক্ষু মুছিয়াছিল। তোরাবের পানে চাহিতে চাহিতে, অলকাগুচ্ছ হাত দিয়া সরাইতে লাগিল। কিন্তু তবু দুই বিন্দু অশ্রু নয়নপ্রান্তে লুকাইয়াছিল, সহসা তাহা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

দেখিয়া তোরাবের মন গলিয়া গেল। অশ্রুমুখী বালিকার হাত দুখানি ধরিয়া সস্নেহে বলিল,—

"ফুলজানি! আমার কথা শুন। দেখ, আমি মানুষ বৈ আর কিছু নই। আমি যে তোমায় এত মর্ম্মপীড়া দিই, তাহাতে যে আমার কষ্ট হয় না, এমন মনে করিও না। বিশ্বাস করিবে কি না জানি না,—তোমাকে কষ্ট দিয়া আমি শতবার আপন শিরে করাঘাত করি! বড় ভালবাসি বলিয়া এমন হয়। ভালবাসি, তাই ঈর্ষা ও অভিমান হয়। নহিলে এমন দুর্ম্মন্ কে, তোমায় কষ্ট দিয়া,—কু-কথায় তোমায় জর্জ্জরিত করিয়া সুখী হয়?—হায় বালিকা! আমার প্রেম তুমি বুঝিলে না?"

বলিতে বলিতে তোরাবের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল;—গদগদ কণ্ঠে তোরাব পুনরায় বলিল,—

"ফুলজানি, তোমায় চোখে দেখিয়াই যে আমার মনে কি সুখ,—কি আনন্দ হয়, তাহা বোধ হয় তুমি বুঝ না। আজ আট বৎসর কাল তোমায় পাইয়াছি,—এই আট বৎসর তোমায় লইয়া আমি যে কত সুখের কল্পনা করিয়াছি,—হায়, তাহা কে জানিবে? মানুষ মানুষের মর্ম্মব্যথা বুঝে না!"

এবার ফুলজানি কথা কহিল। ধীর ভাবে বলিল,—"তুমি আমায় ভালবাস, তা আমি জানি।"

তোরাব। ভালবাসি? না, মিথ্যা কথা! আমি ভালবাসি না। প্রকৃত ভালবাসা আমি জানি না। যদি তোমায় প্রকৃত ভালবাসিতাম, তাহা হইলে, আমার এ রোগের প্রতিকার হইত।

এবার তোরাবের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল! সেই জলপূর্ণ চক্ষে, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় বলিল,—

"আমার কি রোগ?—আমি তোমায় নিদারুণ কষ্ট দিই! ভালবাসিয়া, কে কাহাকে এমন নিষ্ঠুর চণ্ডালের ন্যায় কষ্ট দিতে পারে? ঐ মুখ, যাহা দেখিলে সব দুঃখ ভুলিয়া যাইতে হয়,—হায়! ঐ মুখ মলিন

করিয়া,—ঐ মুখের হাসিরাশি মুছাইয়া, কে এমন নিষ্ঠুর দানবের কাজ করিতে পারে?”

ফুল। তবে আর কষ্ট দিও না।

তোরাব নীরবে অশ্রু ফেলিতে লাগিল। সেইরূপ অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে আবেগভরে বলিল,—

“সত্য, আমি দুষমন্!—আমি, যাহা মনে আসে, তাহাই বলিয়া ফেলি। কিন্তু এই কি আমার স্বভাব?—না। তোমার ঐ রূপের শিখা আমার অন্তরের অন্তরে হিংসার আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে! লোকে বিস্ময়ে তোমার পানে চাহিয়া থাকে,—তোমার অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল দেখিয়া আত্মহারা হয়,—আমি তাহা দেখিতে পারি না। তাই সর্ব্বচক্ষুর অন্তরালে তোমাকে রাখিয়াছি। হায় ফুলজানি! তুমি এখনও বুঝ নাই, ক্ষুদ্র বালিকা হইয়াও, এ বৃদ্ধের হৃদয়ে, তুমি কি তরঙ্গ তুলিয়াছ? দুনিয়ার সার যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম, তাহাও আমি ভুলিতে বসিয়াছি—নহিলে এই কি প্রণয়ের বয়স? দোহাই ফুলজানি! একবার এ হৃদয়ের পানে চাও,—আর কাহারও নয়নের পানে চাহিও না—কে জানে নয়নে নয়নে কি তাড়িত বহিয়া যায়!”

ফুল। ভাল, আর কাহারও পানে চাহিব না।

তোরাব জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিল;—বলিল,—“এত কাব্য পড়িলাম,—এত বিদ্যা শিখিলাম,—কিন্তু হায়! আমার এ দারুণ হিংসা-বৃত্তি ত ঘুচিল না? ফুল, কেন তোমার এত রূপ হইল? কেন তুমি তোমার ঐ রূপের শিখা লইয়া, এ দরিদ্রের কুটীরে আসিয়াছিলে? স্বভাবতই তোমার এই শোভা; তার উপর, হায়! কেন তোমায় এত কাব্য শুনাইয়া, এমন সরলে শোভাময়ী করিলাম?

“ঐ দেখ, কি সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ! কি মধুর জ্যোৎস্নাধারায়

পৃথিবী স্নাত হইতেছে! দূরে চাহিয়া দেখ, স্ফীত স্রোতস্বতী উছলিয়া উছলিয়া কি মধুর লীলা করিতেছে! সব সুন্দর, সব শোভাময়! তুমিও কি সুন্দর! এই সৌন্দর্য্যের মাঝে আমি ডুবিয়াছি!

"কিন্তু কৈ, পারি না! যে অবধি এই হিন্দু যুবাকে এখানে স্থান দিয়াছি, সেই অবধি আমার শান্তি-সুখ—সকলই গিয়াছে। আমি আগে কিছুই বুঝি নাই। বুঝিলে এমন কাজ করিতাম না। সত্য করিয়া বল দেখি,—তুমি তাহাকে ভালবাস না ?"

ফুলজানি নীরব রহিল; তোরাব আবার বলিতে লাগিল,—

"শিক্ষার জন্য সেই হিন্দু আমার কাছে আসে; তেমন মেধাবী শিষ্য আমার আর কেহই নাই;—নানা কারণে সে আমার বড়ই প্রিয়। কিন্তু আমি জানিতাম না যে, পরিণামে হায়! সেই-ই আমার শত্রু হইবে!—সেই-ই আমার সকল আশা নির্ম্মূল করিয়া, আমাকে জীয়ন্তে পোড়াইবে! দেখ, আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ সকলই গিয়াছে। দারুণ হিংসায় আমি জর্জ্জরিত!—ও! ফুলজানি! যাক্—নিবে যাক্,—তোমার ঐ রূপের আগুন নিবে যাক্। আমি মনের মধ্যে রূপের জ্যোতিতে তোমায় বসাইব।—তোমার বাহিরের রূপ নিবিয়া গিয়া আমার অন্তরের শান্তি-সুখ আবার ফিরিয়া আসুক।—ঈশ্বর কি সে দিন আবার দিবেন ?"

তোরাবের সকল কথা ফুলজানি বুঝিল না; কিন্তু তোরাবের সেই কাতরতা দেখিয়া, অন্তরে সে কষ্ট অনুভব করিল। তাহার একটু দয়াও হইল।

কিন্তু দয়া এক, আর ভালবাসা আর। বলা বাহুল্য, ফুলজানি কিছুতেই তোরাবকে ভালবাসিতে পারিল না। বরং তাহার প্রতি উত্তরোত্তর অধিকতর ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সূর্য্যকান্ত তাহার চক্ষে পড়িয়াছে, বালিকা না বুঝিয়াও তাহাকে ভালবাসিয়াছে।

যেমন গোলাপের কার্ব্বা সহসা ভাঙ্গিয়া দিলে তাহার সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে,—সে সৌরভের কথা কাহাকে জানাইয়া দিতে হয় না,—সেইরূপ সূর্য্যকান্তের আবির্ভাবে সহসা প্রণয়-পরিমল যেন চারিদিক্ আমোদিত করিল। সে সৌরভে ফুল আত্মহারা হইল। অন্তরের অন্তরে বালিকা, সূর্য্যকান্তকে আত্মসমর্পণ করিল।

মূর্খ তোরাব, রমণীহৃদয়ের রহস্য না বুঝিয়াই, ভালবাসা লাভের আশায় ফুলের উপর অত্যাচার করিত।—নিষ্ঠুর কথায় তাহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া দিত। হতভাগ্য বুঝিত না যে, ফুল বালিকা হইলেও রমণী বটে। রমণীহৃদয়ের এই প্রণয়-রহস্য তোরাবের বিদ্যা-বুদ্ধির অগম্য। সে কাব্য শুনাইয়া, বহুরূপ যত্ন-চেষ্টা করিয়া, যাহার মন পাইবার প্রয়াস পাইত,—সেই সরলা ফুলজানি, কি জানি কেন, তাহার প্রতি বাম হইয়া, অযাচিতভাবে তাহার সেই হিন্দুশিষ্যকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

নহিলে,—প্রতাপ-সহচর সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে, প্রেম-তরঙ্গ-তুফান উত্থিত হইবার, আদৌ অবসরই ছিল না।

তোরাব ফুলজানিকে আরও কত কথা বলিল,—কত বুঝাইল,—কত উপদেশ দিল,—ভাবী সুখের কত কল্পনার ছবি দেখাইল,—কিন্তু কিছু-তেই কিছু হইল না।

তোরাব আলি সে দিনের মত নিরাশ হইয়া, গভীর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। ফুলজানিও যেন হাঁপ ছাড়িয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, শয্যায় শায়িত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:—

দুই একদিন মধ্যেই সূর্য্যকান্ত সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার শিক্ষক তোরাব অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন,—কেন গিয়াছেন, কেহ সে সংবাদ বলিতে পারিল না।

ফুলজানির করুণ প্রার্থনা, সূর্য্যকান্ত ভুলেন নাই। কিন্তু বীরের সেই বীর-হৃদয়ে তখন প্রেম-প্রণয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বদেশ, স্বজাতি, জননী-জন্মভূমি,—ইহাই তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগিতেছিল। মোগলের অত্যাচার, তাহা হইতে দেশ-উদ্ধার,—এই চিন্তায় বীরের হৃদয় পূর্ণ ছিল।—সে দুর্ভেদ্য অজেয় দুর্গে তখন মদনের ফুলশর কিছু করিতে পারিল না।

তবে ফুলজানিকে কি তিনি ভুলিয়া ছিলেন? না। হিন্দুবীর—বিপন্নের বন্ধু, অসহায়ের সহায়। যে, কাতর প্রার্থনায় তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে,—সে, যে কেহ হউক না কেন,—আত্মশোণিত বিনিময়েও তাহাকে রক্ষা করিতে তিনি তৎপর। তাই তিনি ফুলজানিকে ভুলিতে পারিলেন না। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সূর্য্যকান্ত ফুলজানি কিংবা তোরাবের কোন সংবাদ পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে হইল, হয়ত দুর্ব্বৃত্ত মোগল, ফুলজানিকে হত্যা করিয়াছে,—নয়, কোন্ দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে।

ফুলজানি বলিয়াছিল,—"মোগলের সহিত হিন্দুর আবার সম্পর্ক কি!"

ফুলজানি তবে হিন্দু?—কিন্তু সত্য সত্যই কি হিন্দু?——হায়! কোন্ দুর্ভাগার এ কন্যারত্ন এমন দুর্ব্বৃত্ত মোগলের হাতে পড়িয়াছে?

সূর্য্যকান্ত কয়েকদিন ধরিয়া এই সকল বিষয় ভাবিলেন। তারপর ক্রমেই সে চিন্তা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

এদিকে প্রতাপ বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া, শঙ্কর সমভিব্যাহারে, পুনরায় আগ্রায় আসিলেন। তখন তিন বন্ধুতে মিলিয়া, বিপুল উৎসাহে, মোগল-রাজ্য-ধ্বংসের পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাঠক অবগত আছেন, যশোহরের রাজস্ব-বিষয়ক যাবতীয় ভার এখন প্রতাপের হস্তে। বুদ্ধিমান্ প্রতাপ মনে একটা কি ঠাওরিয়া, আজ প্রায় চারি বৎসরকাল, যশোহরের রাজকর, এক কপর্দ্দকও সম্রাট্‌কে প্রদান করেন নাই। রাজকর্ম্মচারিগণ দুই চারিবার এ কথা প্রতাপকে জানাইয়াছিল। প্রতাপ তাহার কোন পরিষ্কার উত্তর না দিয়া,—"কি জানি,—কার্য্যগতিকে রাজস্ব পঁহুছিতে বিলম্ব হইয়াছে,—যাই হউক এই আইল বলিয়া"—এইরূপ ধরণের ফাঁকা উত্তর দিয়া, অথচ মৌখিক প্রীতিসৌজন্যে কর্ম্মচারিগণকে বাধ্য রাখিয়া, দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। শেষ কর্ম্মচারিগণ বাধ্য হইয়া, খোদ সম্রাটকে এ কথা জানাইল। তখন সম্রাট স্বয়ং, প্রতাপকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলেন। প্রতাপ উত্তর দিলেন,—

"জাঁহাপনা! আমিও ইহার কারণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, রাজ্যমধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। হয়ত যোগ্য কর্ম্মচারীর অভাবে প্রজাশাসন না হইয়া প্রজা-পীড়ন হইতেছে,—আর প্রজারাও তাই ধর্ম্মঘট করিয়া খাজনা-দেওয়া বন্ধ করিয়াছে;—নয়ত বা জমিদারকে হীনবল বুঝিয়া, প্রজারা অশিষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে।"

সম্রাট তাঁহার সেই বিশাল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—

"কেন? তোমার পিতা ও পিতৃব্য কি তবে এখন সম্পূর্ণরূপে কাজের-বার হইয়াছেন?"

প্রতাপ দেখিলেন, মাছ টোপ গিলিয়াছে! তিনি মনে মনে কহিলেন,—"এই অবসর;—হে অন্তর্য্যামী দেবতা! আমায় ক্ষমা করিও,—এই বার আমি এক বিষম রাজনৈতিক চাল চালিব। পিতঃ! অধম সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।"

ধাঁ করিয়া প্রতাপ উত্তর দিলেন,—

"হাঁ, জাঁহাপনার অনুমানই একরূপ সত্য। আমার পিতা ও পিতৃব্য—দুইজনেরই এখন বার্দ্ধক্য দশা। বিশেষ পিতৃদেব কিছুদিন হইতে বৈষয়িক কার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত;—পিতৃব্য মহাশয় কোনও রকমে রাজ-কার্য্য চালাইতেছেন। তা জানি না,—তিনিই বা কি ভাবিয়া, দীর্ঘকাল জাঁহাপনার প্রাপ্য-কর পাঠাইতে উদাসীন আছেন! যাই হউক, আমিও নিশ্চিন্ত নহি,—ইহার সবিশেষ কারণ অবগত হইবার জন্য, আমি যশোরে লোক পাঠাইয়াছি। এক্ষণে জাঁহাপনার যেরূপ আদেশ হয়, এ দাস অবনতমস্তকে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছে।"

সম্রাট্ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, কি ভাবিয়া কহিলেন,—

"প্রতাপ, তুমি যদি আমার প্রাপ্য-কর শীঘ্র সংগ্রহ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমাকেই যশোহর-রাজ্যে অভিষিক্ত করি। বিশেষ, প্রবীণ বৃদ্ধের হস্তে অধিককাল রাজ্যভার থাকাটা কিছু নয়। তুমি উৎসাহশীল নবীন যুবক; তোমার বিবিধ গুণগ্রামে আমি মুগ্ধ;—আমি আশা করি, যশোহরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া, তুমিই সুচারুরূপে রাজ্য পরিচালন করিতে পারিবে।"

প্রতাপ শিষ্টাচার দেখাইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "সে, জাঁহাপনার—দাসের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের পরিচয়। যাই হউক, আপনি কৃপা করিয়া উপস্থিত কিছুদিনের জন্য আমায় সময় দিন,—আমি যেরূপে, যেমন করিয়া পারি, সমস্ত রাজস্ব এককালে সংগ্রহ করিয়া দিব।"

আকবর এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি প্রতাপকে ছয়মাসের সময় দিলেন। সুচতুর প্রতাপ তিন মাসের মধ্যে সম্রাটের প্রাপ্যকর সমস্তই এককালে রাজকোষে অর্পণ করিলেন। সম্রাট প্রতাপের কার্য্যদক্ষতায় বিশেষ প্রীত হইয়া, সেই বিপুল রাজস্ব হইতে প্রতাপকে তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক-স্বরূপ দিলেন, এবং 'ফারমান' প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে যশোহর-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বঙ্গদেশে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

চতুর প্রতাপ এই অবসরে কহিলেন,—

"জাঁহাপনা! বিষয়ের লোভ বড় লোভ! আমার পিতৃদেব বা পিতৃব্য মহাশয় যতই বৃদ্ধ হউন, পরকাল-চিন্তায় যতই মনোনিবেশ করুন,—হঠাৎ আমার এ আশাতীত সম্মানে, চাই কি, তাঁহারাও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন,—এবং যশোহরের রাজ-সিংহাসন আমাকে সহজে ছাড়িয়া না দিতেও পারেন। জাঁহাপনা! মনুষ্যস্বভাবই এই। বিশেষ, পিতৃব্য মহাশয়ের সহিত আমার স্বাভাবিক কিছু জ্ঞাতিবিরোধও আছে। আর তিনি বা যদি ইহাতে উপেক্ষা করেন, তাঁহার পুত্রগণও হয়ত ইহাতে বাদী হইতে পারেন। এইরূপ সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া আমি প্রার্থনা করি—আপনি অধীনের সমভিব্যাহারে কিছু সৈন্য প্রদান করুন। সৈন্যবল থাকিলে, আমি নিরাপদে যশোরের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে পারিব।"

সম্রাট ভাবিলেন, প্রতাপের কথা যুক্তিযুক্ত বটে। তিনি বলিলেন,—

"কিছু সৈন্য কেন,—তোমার অধীনে আমি দ্বাবিংশতি সহস্র সুদক্ষ রণকুশল ও প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ করিতেছি। দেখ, শুধু যশোহর নয়,—বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে এখনও মধ্যে মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ছোট-খাট রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে;—এখনও রাজ্যভ্রষ্ট পাঠান হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, প্রাণের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া, আমার রাজ্যে অশান্তি-বহ্নি উদ্দীপিত করিয়া থাকে; তুমি যোগ্য ব্যক্তি,—তোমার অধীনে এই বিপুলবাহিনী থাকিলে, বঙ্গদেশের সুশাসন জন্য আমার কোন ভাবনাই ভাবিতে হইবে না। অতএব, তুমি নির্ভয়ে ও পূর্ণ উৎসাহে যশোহরে প্রত্যাগমন কর। আমি তোমার স্বদেশগমনের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

এতদিনে বিধাতা, দুঃখিনী বঙ্গভূমির প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।—এতদিনে প্রতাপের জীবন-যজ্ঞের মহা আয়োজন অনুষ্ঠিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—
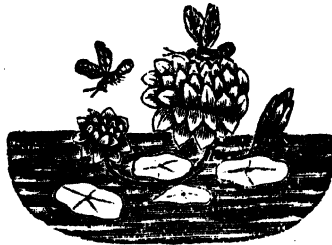
"দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া, সম্রাট আকবরের প্রতি যাঁহাদের অচলা ভক্তি আছে, আকবরের নাম করিতেই যাঁহারা অজ্ঞান হন, তাঁহাদের সেই ভক্তি-বিশ্বাস সর্ব্বথা প্রযুজ্য নহে। অন্ততঃ, প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থানকালে, আকবরের প্রথম রাজত্বসময়ে, বঙ্গদেশের অবস্থা তেমন সুখশান্তিপ্রদ ছিল না। আকবর, তখন বহু বুদ্ধি খাটাইয়া, হিন্দু ও মুসলমানকে এক করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সময় বঙ্গের বহুস্থানে বহু অরাজকতা ও বহু পীড়ন-অত্যাচারও ছিল। এই পীড়ন অত্যাচারের মূল কারণ,—পদদলিত ও আহত পাঠানকে কোন ক্রমে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না দেওয়া। কিন্তু সেই মর্ম্মাহত, শেষ-স্বাধীনতালাভ-চেষ্টায়-তৎপর পাঠানকে দমন করিতে গিয়া, উদ্ধত ও অতি-নিষ্ঠুর মোগল-রাজ-কর্ম্মচারিগণ অনেক সময় অনেক নিরীহ হিন্দুপ্রজারও সর্ব্বনাশসাধন করিত। মোগলের বিশ্বাস ছিল,—এই রাজ্যভ্রষ্ট, হৃতসর্ব্বস্ব পাঠানের সহিত, অনেক বঙ্গীয় প্রজার এবং হিন্দু-নরপতিরও তলে তলে যোগ আছে। কথাটা যে একেবারে মিথ্যা, অবশ্য তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান-পরিশূন্য, সৌভাগ্যগর্ব্বে স্ফীত, মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কারস্বরূপ মোগল-রাজকর্ম্মচারিগণ,—প্রকৃত শান্ত শিষ্ট অনেক বঙ্গীয় প্রজাকেও যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিত। তাহাদের গৃহ-লুণ্ঠন, স্থল-বিশেষে তাহাদের গৃহ-দাহন এবং কোথাও কোথাও বা তাহাদের দেবালয় অপবিত্রকরণ,—এই সকল পৈশাচিককাণ্ড সমাধান করিয়া, মোগল রাজপুরুষগণ সুখানুভব

করিত। ইহা ব্যতীত অনেক সময় অন্যায় ও অত্যধিক করভারে তাহাদিগকে নির্য্যাতিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। সুতরাং সে সময়ে বঙ্গীয় প্রজাসাধারণ আকবরের ভারতশাসনে সন্তুষ্ট ছিল না। তবে অন্যান্য যবন নরপতির তুলনায়, তাহারা আকবরকে, 'মন্দের ভাল' বলিত মাত্র।

লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতাপ, বঙ্গীয় জনসাধারণের মনের এই ভাব পূর্ব্বেই কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তারপর যখন সম্রাটের অনুগ্রহে, সেই দ্বাবিংশ সহস্র বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া, তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইতেছিলেন,—সেই সময় শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তের সহিত অতি সূক্ষ্মভাবে এই বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, বঙ্গদেশকে যদি তিনি মোগলের অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, সমগ্র দেশ সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সহায় হয়। প্রতাপ বুঝিলেন, হিন্দুরক্ত এখনও একেবারে জল হয় নাই।

মনে মনে তাঁহার আরও সাহস বাড়িল। এতদিনে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল,—সমগ্র ভারত না হউক, সমস্ত বঙ্গদেশ নিশ্চয়ই তিনি স্বাধীন করিতে সমর্থ হইবেন। তখন সেই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুত্রয়—প্রতাপ, শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত,—মনের আনন্দে, পূর্ণ-উৎসাহে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। শঙ্কর আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—

"প্রতাপ, মনে পড়ে কি সেই কথা,—আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, নিঃসহায়ে ক্ষুণ্ণমনে, এই দুইটি দরিদ্র বন্ধুকে লইয়া,—কখন আশায় কখন নিরাশায় হাসিয়া-কাঁদিয়া, যখন তুমি জন্মভূমি হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলে?—আর আজ দেখ ভাই,—ভগবানের কি অপূর্ব্ব মহিমা!—সেই তুমি—সেই দুইটি দরিদ্র-বন্ধুর সহিত, আজ বিপুলবাহিনী সঙ্গে

লইয়া,—প্রচণ্ড তেজে ও মহা-সমারোহে, যশোহরের রাজসিংহাসনে বসিতে যাইতেছ!"

ভগবৎ-প্রেমিক শঙ্করের চক্ষু দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। সেই অবসরে সূর্য্যকান্তও মুক্তকণ্ঠে কহিলেন,—

"আর এখনও সেই উচ্চতম সম্মান অবশিষ্ট।—ভরসা করি, ঈশ্বর-কৃপায় তাহাও এইরূপে সিদ্ধ হইবে।"

প্রতাপ কৃতজ্ঞ অন্তরে, প্রীতিভরে কহিলেন,—

"শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত ব্যতীত প্রতাপ আর কি? ভাই! উপরে ভগবান্, আর নিম্নে তোমরা দুই প্রাণোপম সুহৃৎ,—সিদ্ধি অসিদ্ধি, এই তিনের উপর নির্ভর করিতেছে জানিও।"

প্রতাপের এই সৌভাগ্য-সংবাদ,—যশোহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দ উৎপাদন করিল। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্তরায়ও এ সংবাদে সুখী হইলেন। কিন্তু দূরদর্শী বিক্রম ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্নেহাস্পদ বসন্ত রায়কে, পৈতৃক সম্পত্তির কিয়দংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাঁহাকে, পৃথক মালিকানা-স্বত্বে স্বত্ববান্ করিয়া দিয়াছিলেন। এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক বসতবাটীও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল!

যথাকালে প্রতাপ সদলবলে যশোহরে উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রান্তভাগে শিবির সংস্থাপিত করিয়া, যথারীতি সৈন্য সুসজ্জিত পূর্ব্বক, তিনি সর্ব্বাগ্রে নগর অবরোধ এবং ধনাগার হস্তগত করিলেন। বিনা বিঘ্নে, বিনা আয়াসে এবং বিনা রক্তপাতে তাঁহার এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইল। বিক্রমাদিত্য বা বসন্ত রায়—কেহই তাঁহার কোন কার্য্যের গতিরোধ করিলেন না। অধিকন্তু তাঁহারা কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে লইয়া, আপনা হইতেই প্রতাপের সহিত সাক্ষাতের জন্য, প্রতাপের শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

এরূপ শিষ্টাচারদর্শনে প্রতাপ মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইলেন। অপরাধীর ন্যায় অতি বিনীতভাবে, করযোড়ে পিতা ও পিতৃব্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় প্রতাপের বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ না করিয়া, প্রতাপের মঙ্গলকামনাই করিলেন। ইহাতে প্রতাপ, আরও মরমে মরিয়া গেলেন।

প্রতাপ, পিতা ও পিতৃব্যকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের পদধূলি লইয়া কহিলেন,—

"আশীর্ব্বাদ করুন, এইবার যেন আমার আজীবনসঞ্চিত আশা ফলবতী হয়। আর প্রার্থনা করি, আমার কোন কার্য্যে আপনারা কোনরূপ বাধা দিবেন না। দেখুন, রাজনীতি-মার্গ বড়ই কুটিল ও বিঘ্নময়; তাই আমি কৌশল করিয়া, কতকটা আপনাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, সম্রাটের এই প্রসাদলাভে সক্ষম হইয়াছি। এরূপ পন্থার অনুসরণ না করিলে, আমার জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা আমি মিটাইতে পারিতাম না। আমার সে আকাঙ্ক্ষা যে কি, দুই দিন পরে তাহা জানিতে পারিবেন। ভরসা করি, আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া, আমার উচ্চলক্ষ্যের বিচার করিয়া, আপনারা আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। বিশেষ, সন্তান সর্ব্বসময়েই পিতা ও পিতৃব্যের নিকট ক্ষমার্হ।"

প্রতাপের এই আন্তরিকতাপূর্ণ অকপট কথায়, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়,—দুইজনেই প্রতাপকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলেন।

বিক্রমাদিত্য স্নেহভরে কহিলেন,—"বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সৎপথে থাকিয়া, চিরজীবী হইয়া রাজধর্ম্ম পালন কর। আমি আর তোমার কার্য্যে বাধা দিতে যাইব কেন বাবা? আমার আর কটা দিনই বা বাকী! হরি হে, পার কর দয়াময়!"

বিক্রম পুনরায় কহিলেন, "প্রতাপ, তুমি যে নিজগুণে সম্রাটকে সন্তুষ্ট

করিয়া, এরূপ উচ্চ সম্মানলাভে সক্ষম হইয়াছ, ইহাতে আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তবে বাবা, বাসনার অন্ত নাই,—এই টুকু স্মরণ করিয়া, হরিপাদপদ্মে মতি রাখিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিও,—আমার এইমাত্র অনুরোধ।"

প্রতাপ নীরবে মস্তক অবনত করিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, "হাঁ, দাদা যাহা বলিলেন, ঐ কথাই সার, প্রতাপ! শান্তি অপেক্ষা জীবনের প্রিয়-বস্তু আর কিছুই নাই। এই শান্তিলাভের জন্য আপনাকে যতটা সংযমশীল করিতে পারিবে, ততই অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিবে। দেখ, শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বত্রই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

প্রতাপ, পিতৃব্যের কথাও নীরবে, অবনতমস্তকে শুনিলেন। মুখে কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু অন্তরে একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

যশোহরের শাসনদণ্ড-ভার গ্রহণ করিয়া, প্রতাপ অতি অল্পদিনের মধ্যে রাজকীয় যাবতীয় কার্য্য অতি সুচারুরূপে সমাধা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে যশোহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইল। সকলেই মুক্ত অন্তরে তাঁহার দীর্ঘায়ু ও সর্ব্বসিদ্ধি কামনা করিতে লাগিল। যশোহর নগরী স্বভাবতই উর্ব্বরা ও শস্যপূর্ণা; তাহার উপর প্রতাপ বুদ্ধিকৌশলে, সেই উর্ব্বরস্থানকে দ্বিগুণ উর্ব্বরিত করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই তিনি বহুসংখ্যক শ্রমজীবী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, স্বভাবদুর্গম সুন্দরবনের অধিকাংশ স্থলে খাল খনন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা ব্যতীত সুস্বাদু সলিলপূর্ণ বহু সরোবরও খোদিত হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে যে স্থান গভীর অরণ্যময় ছিল, এক্ষণে তাহা ক্ষেত্ররূপে ও নদীরূপে পরিণত হইয়া,—রাজ্যের শোভা, শ্রী ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

এই সকল কার্য্যের পর প্রতাপ, যশোহরের চারিদিকে সুদৃঢ় মৃণ্ময়-প্রাকার নির্ম্মাণ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল দুর্গ অতি দুর্ভেদ্য। শত্রুর গুলি, গোলা বা কামান,—সহজে ইহা ভেদ করিতে সমর্থ নহে। অতঃপর যুদ্ধোপযোগী বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল। কারণ, সে সময় বঙ্গে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের বিশেষ উপদ্রব ছিল।

সৈনিক-নিবাসের প্রতি প্রতাপের প্রখরদৃষ্টি ছিল। যাহাতে সৈন্যগণের কোন কষ্ট না হয়,—সৈন্যগণ যাহাতে চিরদিন তাঁহাতে অনুরক্ত থাকে, সে বিষয়ে যত্ন করিতে প্রতাপ কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

তার পর প্রতাপ ভাবী মহাযুদ্ধের আয়োজনোপযোগী প্রচুর পরিমাণে গুলি, গোলা, কামান, বারুদ, তীর, ধনু, লাঠী, তরবারী প্রভৃতি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজ রাজধানীতে ইহার জন্য এক বৃহৎ কারখানাও সংস্থাপিত করিলেন। অধিকন্তু মদন, সুন্দর, সুখা এবং দুর্দ্ধর্ষ জলদস্যু ফিরিঙ্গি রডা প্রভৃতি কয়েক জন যুদ্ধ-কুশল, মহাপরাক্রমশালী সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। কি উপায়ে, কোন্ কৌশলে সমগ্র বঙ্গদেশ মোগলের করালগ্রাস হইতে উদ্ধার করা যায়,—কি করিলে হিন্দুর দেশে পুনরায় হিন্দুরাজা হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারে,—প্রাণোপম বন্ধু শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তকে লইয়া, অহরহ তিনি সেই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

প্রাণময়ী পদ্মিনী এ সময়ে স্বামীকে বিশেষরূপে উৎসাহ ও সাহস দিতে লাগিলেন। সতীর সেই তেজস্বিতাপূর্ণ আন্তরিক উদ্দীপনায়, প্রতাপ অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে প্রতাপের পরম লাবণ্য-বতী এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। এই কন্যার নাম বিন্দুমতি।

স্বাধীনচেতা প্রতাপ যখন তাঁহার জীবনযজ্ঞের এই মহাআয়োজনে নিযুক্ত, সেই সময় তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করি-লেন। মহা সমারোহে পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া, প্রতাপ পুনরায় তাঁহার মহা অভীষ্ট সাধনে মনোযোগী হইলেন।

শঙ্কর-সূর্য্যকান্তের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন,—সর্ব্বাগ্রে দেশীয় রাজগণকে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীদিগকে হস্তগত করা যুক্তিযুক্ত। কারণ, মোগলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, গৃহশত্রু হইয়া কেহ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে না পারে,—সে বিষয়ে সতর্ক থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য।

প্রতাপ সর্ব্বাগ্রে উৎকলীশক্তির পরীক্ষা লইতে মনস্থ করিলেন। সে সময়ে উৎকলের হিন্দু-রাজগণ একেবারে বীর্য্যশূন্য ও স্বাধীনতা-রক্ষা-

পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রতাপ ভাবিলেন, সমগ্র উড়িষ্যাকে হাত করিতে পারিলে, তাঁহার কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হয়।

পিতৃশ্রাদ্ধের পর, তীর্থগমন উপলক্ষ্যে, শুভদিনে শুভক্ষণে, তিনি উড়িষ্যাযাত্রা করিলেন। সঙ্গে অল্পসংখ্যকই সৈন্য লইলেন। কিন্তু অল্প-সংখ্যক হইলেও তাহারা প্রকৃত বীর, সাহসী, রণ-নিপুণ ও মৃত্যুভয়রহিত। শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত এই সেনাদলের অধিনায়করূপে নিযুক্ত হইলেন।

ভগবদ্ভক্ত বসন্ত রায় প্রতাপকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে প্রতাপ যেন তাঁহার জন্য উড়িষ্যার জাগ্রৎ দেবতা উৎকলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও গোবিন্দদেব নামক কৃষ্ণমূর্ত্তি যশোহরে আনয়ন করেন। প্রতাপ, পুণ্যবান্ পিতৃব্যের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে, প্রতিশ্রুত হইলেন।

উড়িষ্যার আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া প্রতাপ বুঝিলেন, এই সকল রাজন্যবর্গকে বশীভূত করিতে পারিলে, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বিশেষ মোগলনিগৃহীত পাঠানগণ দলে দলে প্রতাপের বশ্যতা স্বীকার করিল,—তাঁহার শরণাপন্ন হইল,—মোগলবিরুদ্ধে বিধিমতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে, অতি দৃঢ়তার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। প্রতাপ জগ-ন্নাথক্ষেত্রে পুণ্যকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, উড়িষ্যার ভুজবল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কৌশল করিয়া তিনি উড়িষ্যার মধ্যভাগ হইতে সেই উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ ও গোবিন্দদেবের বিগ্রহ-মূর্ত্তি হস্তগত করিলেন।

এই দারুণ দুঃসংবাদে ধর্ম্মনিষ্ঠ উৎকলীগণ দিশাহারা হইল। তাহারা ভৈরববিক্রমে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতাপ অদ্ভুত কৌশলে উৎকলীগণকে পরাজিত করিলেন।

এইবার উড়িষ্যার সমগ্র রাজন্যবৃন্দের আসন টলিল। তাঁহারা সকলে

সমবেত হইয়া, ভীমবিক্রমে পুনরায় প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল,—অসাধারণ যুদ্ধকৌশলগুণে, প্রতাপ এবারও জয়যুক্ত হইলেন।

উৎকলী রাজন্যবর্গ হতাবশিষ্ট সৈন্যসামন্তাদি লইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রতাপের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, প্রতাপ ঐশীশক্তিসম্পন্ন—ভবানীর বরপুত্র। নহিলে, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া, কিরূপে তিনি অগণিত রণকুশল উৎকলী-সৈন্যকে পরাজিত, নির্য্যাতিত ও বিধ্বস্ত করিলেন? বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহারা প্রতাপের শরণাপন্ন হইলেন। মহানুভব প্রতাপও, যথার্থ মিত্রের ন্যায়, তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিলেন।

এইরূপে অল্লায়াসে, উড়িষ্যাকে সম্পূর্ণরূপে আপন অধীনে আনিয়া, হৃষ্টমনে প্রসন্ন অন্তঃকরণে, প্রতাপ স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত বিজয়-বার্ত্তা, সমগ্র বঙ্গদেশে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রচার করিল। এত দিনে বাঙ্গালীর নির্জীবপ্রাণে আবার সজীবতার লক্ষণ দেখা দিল;—এতদিনে বাঙ্গালীর স্বাধীনতাস্পৃহা আবার বলবতী হইল। বাঙ্গালী বুঝিল যে, প্রকৃত নেতা অভাবে এতদিন তাহারা মরিয়াছিল;—ঈশ্বর সদয় হইয়া তাহাদের সেই নেতা পাঠাইয়াছেন;—এখন তাহারা জীবিত জাতির ন্যায় জগতে বিচরণ করিতে পারিবে।

সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতাপের মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিজয়-লব্ধ বহু ধন-রত্নাদি লইয়া, বিজয়-পতাকা উড়াইয়া, বিজয়-সঙ্গীত গান করিতে করিতে, প্রতাপ সদলবলে স্বদেশে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনে সমগ্র যশোহর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। গৃহস্থ, দ্বারে মঙ্গল-ঘট সংস্থাপিত করিয়া, আম্র-পল্লবের মালা গাঁথিয়া, শুভচিহ্ন প্রকাশ করিল। পুরনারীগণ ঘোর রোলে আনন্দসূচক শঙ্খধ্বনি করিয়া, পুণ্যবান্ প্রতাপের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। নগরের নানাস্থানে বিজয়তোরণ সংস্থাপিত হইয়াছিল; তদুপরি নহবতাদি বাদ্য বাজিতে লাগিল। প্রশস্ত রাজপথ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত ও লোকারণ্যে পরিণত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। চতুর্দোলায় সুশোভিত প্রতাপাদিত্যকে বেষ্টন করিয়া, বিজয়ী সেনাগণ মনের আনন্দে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে আশা, উল্লাস ও আনন্দ বিরাজিত।

এই পরম পুণ্যময় মুহূর্ত্তে, প্রতাপ সর্ব্বাগ্রে সেই উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ ও গোবিন্দদেব বিগ্রহ,—পূজ্যপাদ পিতৃব্যের সম্মুখে রাখিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বহু পূজকব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক, বিশেষ যত্নসহকারে ঐ দুই দেবতা যশোহরে আনীত হন।

বসন্ত রায় কীর্ত্তিমান্ ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কহিলেন,—

"প্রতাপ, সার্থক তোমার তীর্থ গমন! আজ তুমি আমায় যে দুই অমূল্যনিধি উপহার দিলে,—ইহার তুলনা নাই। বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সর্ব্বজয়ী হও এবং চিরজীবী হইয়া থাকো।"

শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে, মহা সমারোহে, রাজা বসন্ত রায় ঐ দুই দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় মহাভাগ প্রতাপও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, যশোহরের মধ্যভাগে, 'যশোহরেশ্বরী কালী' মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, লোকসাধারণ্যে 'ভবানীর বরপুত্র' নামে অভিহিত হইলেন। বহু অর্থব্যয়ে ও বিপুল আয়োজনে, এই পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সকল শুভকার্য্য সম্পন্নের পর, একদিন পদ্মিনী হাসিহাসি মুখে প্রতাপকে কহিলেন, "নাথ! এতদিনে দাসীর কথা ফলিল!—দাসীকে কি পুরস্কার দিবে,—দাও!"

প্রতাপ উত্তর দিলেন,—"প্রিয়ে! জন্ম জন্ম তোমার বাহুমূলে বন্দী থাকিব,—এই অঙ্গীকার-পুরস্কার দিতেছি।"

এই বলিয়া সেই কুসুমকোমলা, প্রাণময়ী, সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে আলিঙ্গন করিলেন। মুখচুম্বন করিয়া পুনরায় কহিলেন,—

"চন্দ্রাননি! আমিই তোমার—আমাকে ছাড়িয়া তুমি আর কি পুরস্কার চাও? সতি! তোমার আশ্বাস-বাণীর প্রথম অংশ ফলিয়াছে; কিন্তু সে উদ্দাম বাসনার আর বিলম্ব কত? কত দিনে আমার জীবনের সেই মহাব্রত উদ্‌যাপিত হইবে?"

পদ্মিনী। বিলম্ব আর অধিক নাই। মা-যশোরেশ্বরী আপনার পথ আপনি খুঁজিতেছেন। তাঁর ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। এখন কিছুকাল তিনি তোমার পূজাই গ্রহণ করিবেন,—ইহা আমার মন বলিতেছে।

এই সময়ে একটি টুক্‌টুকে, ফুটফুটে কচি-মেয়ে আসিয়া, প্রতাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মধুমাখা আধ-আধ স্বরে কহিল,—

"বাবা, সকলকে সব দিলে, কৈ, আমায় ত কিছু দিলে না?"

প্রতাপ, মেয়েটির মুখচুম্বন করিলেন। পরে তাহারই স্বরের অনুকরণ করিয়া কহিলেন,—

"সকলকে সব কি দিলুম মা ?—আর তোমায় কি দিলুম না ?"

"কেন,—যুদ্ধ থেকে এসে দাদাকে তরোয়াল দিলে,—মাকে মা-কালীর হাতের নোঙা দিলে,—আর আমি ছেলে-মানুষ কি না,—তাই ব'ল্লে, 'মা বিন্দু, একটা চুমো দিবি আয় তো রে !"

কন্যার দুইগালে ঘন ঘন চুম্বন করিয়া, হাসিয়া প্রতাপ কহিলেন,—"আচ্ছা মা, তুমি কি চাও—বল ?"

তখন সোহাগে ভর করিয়া, সেই মধুমাখা আধ-আধ-স্বরে, সোহাগভরে বিন্দু কহিল,—"আমি কি চাই ?—তা আমি কি জানি ? তুমি বল না—আমি কি চাই ?"

প্রতাপ। তুমি একটি ছোট্ট হরিণ চাও,—না মা ?

ইতিপূর্ব্বে বিন্দু একদিন একটা হরিণ দেখিয়া বায়না করিয়াছিল—'আমি ঐ হরিণের সঙ্গে খেলা কর্‌বো'—প্রতাপ তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বিন্দু। হরিণ ?—আচ্ছা, তাই দিও।

প্রতাপ। আজই পাইবে, মা।

বিন্দু একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিল; মা হাসি-হাসি মুখে, আশ্বাসপূর্ণ চোখে জানাইলেন,—"হাঁ, পাইবে।"

সে দিন প্রতাপের এক শ্যালিকা, ভগিনীর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। পদ্মিনী অপেক্ষা তিনি বয়সে ছোট। ভগিনী ও ভগিনীপতি, সোণামুখী বিন্দুকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহারও একটু আমোদ করিতে সাধ যাইল। তিনি সেখানে গিয়া বিন্দুর সঙ্গে আগ্‌ড়োম-বাগড়োম বকিয়া, তাহার মন পাইয়া, শেষে কহিলেন, "হাঁ মা বিন্দু, তুমি তোমার বাপকে বেশী ভালবাস,—না মাকে বেশী ভালবাস ?"

এ প্রশ্নে বিন্দু বড় গোলে পড়িল। মাসীর কথায়, সে যে, কি উত্তর দেয়, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। মায়ের মুখের পানে

চাহিল,—দেখিল, মা টিপি-টিপি হাসিতেছেন ; মায়ের বসনাচ্ছাদিত স্তনের দিকে তাকাইল,—দেখিল, স্তন দুটি ঈষৎ কাঁপিতেছে ; তার পর বাপের মুখের পানে চাহিল,—দেখিল, বাপ হাস্যবদনে অনিমেষনয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ;—তখন সেই এক-রত্তি মেয়ে বিন্দু, সাহস পাইয়া, মায়ের স্তনে বাঁ-হাতের চড় মারিল, আর ডান-হাতের কচি আঙুল দিয়া বাপের গোঁফ ধরিয়া টানিয়া, মাসীকে উত্তর দিল—'দুজনকে'।

এই সোহাগপূর্ণ উত্তরে, বিন্দুর গালে মাসীও চুমো খান, মাও ছল ছল চক্ষে চুমো খান, আর পিতাও কন্যাকে বুকে করিয়া লইয়া আবেগ-ভরে চুমো খাইতে থাকেন। বিন্দু, চুম্বনের এরূপ একাধিপত্য দেখিয়া, তাহারই জয় হইল ভাবিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাসির লহরী তুলিয়া দিল।

তখন বিন্দুর সেই মাসী, আনন্দপূর্ণ স্মিতমুখে ভগিনীপতিকে কহিলেন,—

"রায় মশাই, রাজত্ব বল, আর দেশজয় করা বল,—এর বাড়া সুখ কিন্তু আর নাই। গৃহধর্ম্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাই আমার এক একবার মনে হয়, যুদ্ধ করিবার সময় কি, প্রাণটাকে তোমরা লোহা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাও ?—নহিলে 'ষ্যাথ্' বল্‌তে মানুষ মারো কি রকমে ?"

প্রতাপ একটু হাসিলেন। বিন্দুর মাসী পুনরায় কহিলেন,—

"আচ্ছা, এই বিন্দুর মুখ মনে পড়িয়াও কি, লোক মারিতে ও কাটিতে, তোমাদের একটু দয়া হয় না ? আহা, তাদের ঘরেও তো এমনি সব বুক-জুড়োনো কচি-কচি মুখ আছে !"

প্রতাপ একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—

"ভগিনি ! যে ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে শুধু নারীর প্রাণ লইয়া বাঁচিলে, আমাদের চলিবে না। অবস্থাবিশেষে আমাদিগকে কুসুম অপেক্ষা কোমল এবং অবস্থাবিশেষে আমাদিগকে বজ্র অপেক্ষাও

কঠিন হইতে হয়। ইহাই রাজধর্ম্ম। এক্ষণে ঈশ্বর আমাকে এই ধর্ম্মের পথিক করিয়াছেন। আমার সদুদ্দেশ্য সাধনে কেহ অন্তরায় হইলে,'আমি যে-কোন উপায়ে সে অন্তরায় দূর করিব। তাহাতে লোক-প্রচলিত ধর্ম্ম, অধর্ম্ম,—ইহকাল, পরকাল,—আপন, পর—কিছুই দেখিব না। গুরু হউন, সন্তান হউন, স্ত্রী হউন,—কিছুতেই আমার লক্ষ্যচ্যুতি ঘটিবে না। অধিক কি,—ভগিনি! এই যে প্রাণাধিকা কন্যাকে লইয়া এত আমোদ-আহ্লাদ করিতেছি, কর্ত্তব্যবোধ করিলে এবং আবশ্যক হইলে, এই কন্যা-কেও আমি প্রাণে মারিতে কুণ্ঠিত হইব না!"

প্রতাপের সেই স্বাভাবিক তেজোদ্দীপ্ত চক্ষু দপ্ দপ্ জ্বলিতে লাগিল। বিন্দুর মাসী শিহরিয়া উঠিল।
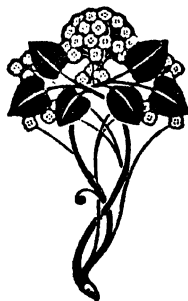
একাদশ পরিচ্ছেদ।

উড়িষ্যাবিজয়ের পর প্রতাপের প্রভুতা, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা—সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইল। তাঁহার লোকবল, বাহুবল ও অর্থবল আরও বর্দ্ধিত হইল। বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী ও রাঢ় দেশীয় রাজন্যবর্গ আপনা হইতে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। বিনা বিঘ্নে, বিনা গোলযোগে সকল স্থান হইতে তাঁহার রাজস্ব আদায় হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই সকল রাজস্বের এক কপর্দ্দকও সম্রাটের হস্তগত হইল না।

প্রতাপের দক্ষিণ ও বামহস্ত স্বরূপ—শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত, এ সময়ে বিপুল উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অশ্রান্ত শ্রমে ও বিপুল অধ্যবসায়ে, বঙ্গের নানা স্থানে দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহাতে বঙ্গভূমি চির-স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইয়া, আপন গৌরবে আপনি গৌরবময়ী হইতে পারে,—বঙ্গীয় বীরগণ যাহাতে স্বাবলম্বনপ্রিয়, শ্রমসহিষ্ণু ও কার্য্যতৎপর হইয়া, মোগলের করালগ্রাস হইতে দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়,—এই দুই মহাপুরুষ আপনাদের সর্ব্ববিধ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া, অহর্নিশ সেই চেষ্টায় তৎপর রহিলেন। বাগ্মীপ্রবর শঙ্কর সুবা-বঙ্গের প্রত্যেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, সকলকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মাতাইয়া তুলিলেন। বলিলেন,—

"ভাই সব! হিন্দুর দেশে বিধর্ম্মী মোগলের আধিপত্য কেন? এই অসংখ্য নদ-নদী-সরোবর-শোভিত, ষড়্‌ঋতু-বিরাজিত স্থান,—যেখানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমান অধিষ্ঠান;—ধনে-ধান্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে,—যে স্থান পৃথিবীর মধ্যে অতুল্য;—যে স্থান লাভের জন্য কত রক্তপাত, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, কত হাহাকার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে;—যাহার জন্য

মোগল-পাঠান জীবনকেও তুচ্ছ বোধ করিতে পারিয়াছে,—সেই পুণ্যভূমি বঙ্গভূমি—সোণার বাঙ্গালা এখন মোগলের পদানত! ভাই! তোমার দেশ, তুমি না দেখিলে আর কে দেখিবে? প্রতিজ্ঞা কর, প্রাণ থাকিতে আর মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবে না। বল,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!" শপথ কর,—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন!" —এরূপ করিলে—মা-কালী অবশ্যই মুখ তুলিয়া চাহিবেন! দেখ, বিধাতা সদয় হইয়া তোমাদিগের রাজা মিলাইয়া দিয়াছেন; এত দিনে তোমাদের একজন নেতা মিলিয়াছে;—তোমরা সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রবল প্রতাপান্বিত, বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের জয়ঘোষণা কর।"

শঙ্করের এইরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ তেজস্বিবাক্যে, বঙ্গের আপামরসাধারণ মাতিয়া উঠিল। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিল,—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারা প্রতাপাদিত্যের সাহায্য করিবে।

সূর্য্যকান্ত বঙ্গের দুঃস্থ অধিবাসিবর্গকে অর্থসাহায্যে কৃতজ্ঞতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন।

তখন এই দুই স্বদেশভক্ত বীর, মোগলের গতিরোধার্থ নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বঙ্গের চারিদিকে যেমন দুর্ভেদ্য দুর্গসকল প্রস্তুত হইল, তেমনি সেই দুর্গোপযোগী অগণিত সেনাও সংগৃহীত হইল। বলা বাহুল্য, দেশ অকস্মাৎ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, তাহার কিছুই অসংস্থান রহিল না।

এই সময়ে রায়গড়, মাতলা, জগদ্দল, শালিখা প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মিত হইল। তীক্ষ্ণদর্শী চার-চক্ষু প্রতাপ সকল দুর্গের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর প্রতাপ নিজ রাজধানী ধূমঘাটে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। এত বড় বৃহৎ দুর্গ তৎকালে কোথাও পরিদৃষ্ট হইত

না। এই দুর্গ দীর্ঘে ও প্রস্থে প্রায় পাঁচ ক্রোশ হইবে। দুর্গের চারিদিক সুদৃঢ় মৃণ্ময়-প্রাকারে পরিবেষ্টিত ও কামানশ্রেণীতে সুশোভিত হইল। দুর্গের চারিদিকে চারিটি সিংহ-দ্বার রহিল। মধ্যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। দুর্গমধ্যে পুষ্করিণী, উদ্যান, পণ্যবীথিকা—কোন-কিছুরই অভাব রহিল না। বহুসংখ্যক শ্রমজীবী ও সুদক্ষ শিল্পী পাঁচ বৎসরকাল অশ্রান্ত পরিশ্রমে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। শুভদিনে, প্রতাপ সপরিবারে দুর্গ-প্রবেশ করিলেন। ধূমঘাট সেদিন আনন্দোৎসবময় হইল।

প্রতাপের এক গুরু ছিলেন, নাম—শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন। তর্কপঞ্চানন একজন ঘোর তান্ত্রিক ও ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে, প্রতাপ, গুরুর মত লইয়া কার্য্য করিতেন। গুরুও প্রতাপকে আত্মজের ন্যায় ভালবাসিতেন।

গুরু-শিষ্যে একদিন কি পরামর্শ হইল। স্থির হইল যে, সমগ্র বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়া, একদিন এক বিরাট-সভা আহূত হউক। সাধারণ্যে প্রকাশ থাকুক, অমুক দিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হইবে; কিন্তু তদুপলক্ষে জানা যাইবে,—বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার ভিন্নধর্ম্মী—ভিন্নবর্ণী লোকদিগের মধ্যে, প্রতাপের প্রতি কাহার মনোভাব কিরূপ। তাহার সম্যক্ পরিচয় না পাইলে, প্রতাপের সেই মহাসঙ্কল্পসাধনে—স্বদেশের চির-স্বাধীনতা-রক্ষায় নানা বিঘ্ন ঘটিতে পারে,—গুরু এইরূপ বলিলেন। প্রতাপও সর্ব্বান্তঃকরণে গুরু-বাক্যের অনুমোদন করিলেন। বলা বাহুল্য, শঙ্কর এবং সূর্য্যকান্তও গুরুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সরলপ্রাণ বসন্ত রায় বলিলেন,—"ইহা ত সুখের সংবাদ। প্রতাপের আমার রাজ্যাভিষেক হইবে,—ইহা অতি উত্তম পরামর্শ। আহা, আজ যদি দাদা থাকিতেন!"

প্রতাপের ইঙ্গিতমাত্র এক প্রকাণ্ড সভা-মণ্ডপ প্রস্তুত হইল। নানা-বিধ উত্তম উত্তম আহারীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগৃহীত হইল। এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের বাসস্থানের যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত হইল।

মহাভাগ শঙ্করের প্রতি এই মহা নিমন্ত্রণের ভার অর্পিত হইল। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার মিত্র ও করদরাজগণকে এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তি-বর্গকে তিনি পরম যত্নে ও মহা সমাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। বাঙ্গালী, বিহারী, উৎকলী,—সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। যাহাতে নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে যশোহরে উপনীত হন,—শঙ্কর বিশেষ বিনয় সহকারে, সেজন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, সকলেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

বৈশাখী পূর্ণিমা। বঙ্গের শুভ দিন। আজ বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক। বাঙ্গালীর চরম সৌভাগ্য। বাঙ্গালী-জীবনের সফল স্বপ্ন। হায়, ইহাই শেষ!

যশোহর ধামে আজ আনন্দ-বাজার। হাট, মাঠ, ঘাট, বাট,—সর্ব্বত্র আনন্দময়। যে জন্ম-দুঃখী, তাহার মুখেও আজ আনন্দ ধরে না। নাগরিকগণ মনের উল্লাসে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে এবং হল্লা করিয়া বেড়াইতেছে। দোকানী-পসারী আজ মনের সাধে দোকান সাজাইয়া বেচা-কেনা করিতেছে। রাস্তার দুইধার ফুলের মালায় ও দেবদারু-শাখায় শোভিত। মাঝে মাঝে এক একটি সুসজ্জিত তোরণ। তোরণে ফুলের ঝাড়, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া—শোভা পাইতেছে। চারিদিকে নৃত্য-গীত, রং-তামাসা, হাসি-মস্করা চলিতেছে। নহবৎ মিঠা-আওয়াজে বাজিতেছে। বাঁশী—ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সাহানা আলাপ করিতেছে। বালকবালিকাগণ রঙ্গিন কাপড় পরিয়া, কেহ বা নববস্ত্রে ভূষিত হইয়া, সোহাগভরে উৎসবক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। এবং মধ্যে মধ্যে এ উহাকে—সে তাহাকে আপন আপন "আঙা কাপড়" দেখাইতেছে। গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে মঙ্গল-ঘট, কদলী-বৃক্ষ, আম্র-শাখা বিরাজিত। পুরনারীগণ গৃহের ছাদে উঠিয়া, থাকিয়া-থাকিয়া, দলবদ্ধ হইয়া, অনন্দসূচক শঙ্খধ্বনি করিতেছে। দেবালয়ে ঘোর রোলে কাঁশর-ঘণ্টা বাজিতেছে। গৃহস্থের দৈনিক পূজায়ও আজ ধূম। এইরূপ চারিদিক আনন্দ ও উৎসবময়। আনন্দ-বাজারে সকলেই আজ আনন্দ লুটিতেছে।

ধূমঘাটের দুর্গের শোভা আরও মনোহর—আরও প্রীতিকর। দুর্গের শিখরদেশে পত্ পত্ শব্দে জয়-পতাকা উড়িতেছে। প্রাতঃকাল হইতে সৈনিকগণ দলে দলে সুসজ্জিত হইয়া, বিস্তৃত মাঠে শ্রেণী দিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝম্ ঝম্ শব্দে বিজয়-বাদ্য বাজিতেছে। মধ্যে মধ্যে আনন্দ-সূচক তোপধ্বনি হইতেছে। সৈনিকগণ বীরবেশে সমর-প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত। তাহাদের মধ্যে দুই দল হইল। দুই দলে কৃত্রিম সমর-ক্রীড়া চলিল। বাঙ্গালী দর্শক ভাববিভোর হইয়া, আপনাদের সৌভাগ্যের চরম অবস্থা বুঝিয়া, মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতে লাগিল; এবং মধ্যে মধ্যে—"জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়" বলিয়া আকাশ-মেদিনী কম্পিত করিয়া তুলিল।

বাঙ্গালী-জীবনের সেই পুণ্যময় মুহূর্ত্তে, বৈশাখী পূর্ণিমার সেই শুভ তিথিতে, বঙ্গের শেষবীর—বাঙ্গালীর গৌরবস্থল—সেই ক্ষণজন্মা মহা-পুরুষ—পুণ্যশ্লোক প্রতাপাদিত্য, আত্মবলে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিলেন। মহা সমারোহে, অথচ শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। মহারাজ হীরকখচিত স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া, বামে সহধর্ম্মিণীকে লইয়া, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রপূত হইয়া, রাজরাজেশ্বর পদে আসীন হইলেন। সকলে "জয় জয়" শব্দে সেই বিরাট্ সভামণ্ডপ কাঁপাইয়া তুলিল।

দানে প্রতাপ সেদিন কল্পতরু হইয়াছিলেন। অর্থী ও অভাজন সেদিন মনের সাধে অর্থ সংগ্রহ করিল। রাজ্ঞী একজন ব্রাহ্মণকে একটি স্বর্ণ-মুদ্রা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হাত হইতে সেটি খসিয়া স্বর্ণ-কলসে পতিত হইল। তিনি পুনরায় সেই কলস হইতে আর একটি স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া ব্রাহ্মণকে দিতে গেলেন। প্রতাপ এ ঘটনাটি লক্ষ্য করিলেন। কহিলেন,—

"রাজ্ঞি! ইতিপূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণকে তুমি যে মুদ্রাটি দিতে উদ্যত হইয়াছিলে, এটি কি সেই মুদ্রা?"

রাণীর চৈতন্য হইল। অপরাধীর ন্যায় কহিলেন,—"আজ্ঞে না মহারাজ! আমি ঠিক বলিতে পারি না যে, ইহা সেই মুদ্রা।"

প্রতাপ। তবে আর মনে এতটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া, এখনি ঐ স্বর্ণ-কলস সমেৎ সমস্ত মুদ্রা ব্রাহ্মণকে দান কর।"

প্রতাপের আদেশ প্রতিপালিত হইল। সভার মাঝে 'জয় জয়' ধ্বনি পড়িয়া গেল। সকলে তাঁহাকে 'দাতাকর্ণ' বলিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনায় কিছু কৌতূহলী হইয়া, এক ব্রাহ্মণ প্রতাপের মনের বল পরীক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রাজা ও রাণী যেখানে উপবিষ্ট হইয়া, জনসাধারণের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেছিলেন,—ব্রাহ্মণ কিছু সঙ্কুচিত হইয়া, জড়সড়ভাবে, সেই সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতাপ গম্ভীরভাবে ইঙ্গিতে জানাইলেন—"কি চাও?"

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমার প্রার্থনা কিছু উদ্ভট রকমের;—অথচ তাহা আপনার পক্ষে, অসম্ভবও নয় এবং অসাধ্যও নয়।

প্রতাপ। (ধীরভাবে) কি—বলুন।

ব্রাহ্মণ অধোবদনে ভূমিপানে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতাপ দৃঢ়তার সহিত পুনরায় বলিলেন,—"আমার নিজের ধর্ম্ম ও সত্য ব্যতীত, আপনি যা চান, তাই দিব।"

এবার ব্রাহ্মণ যেন কিছু সাহস পাইলেন। একবার সভার চারিদিক দেখিলেন। তীব্রকটাক্ষে একবার রাণীর পানে চাহিলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন,—"মহারাজ! আমাকে অভয় দিন।"

প্রতাপ স্মিতমুখে ইঙ্গিতে তাহা জানাইলেন। এবার ব্রাহ্মণ তীব্রকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"মহারাজ! আমি আপনার মহিষীকে প্রার্থনা করি।"

সেই বিরাট-সভা সহসা অতি নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সকলে মনে মনে প্রমাদ গণিল। পরিম্লান মুখে, ভয়চকিত-দৃষ্টিতে, পরস্পর পরস্পরকে তাহা জানাইল। কেহ বা অন্তরে দুর্গানাম জপ করিল।

প্রার্থী ব্রাহ্মণ সেই রত্নসিংহাসনের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রতাপ একবার মহিষীর পানে চাহিলেন। জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন,—

"প্রিয়ে! আজ পরীক্ষার দিন। মা যশোরেশ্বরী আজ আমায় পরীক্ষা করিতেছেন। সাধ্বি! সতীত্বের মাহাত্ম্য দেখাও,—স্বামীকে সত্য-পাশ হইতে মুক্ত কর।"

রাণী কোন উত্তর না দিয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রতাপ সহধর্ম্মিণীর মনের ভাব বুঝিলেন। প্রেমপরিপ্লুত গদগদকণ্ঠে কহিলেন,—

"প্রিয়ে! অসম্ভব ভাবিতেছ? তোমার নারীধর্ম্ম নষ্ট হইবে, স্থির করিতেছ? আর সহসা আমাতে উন্মত্ততা আসিল কি না, নিরীক্ষণ করিতেছ? (স্মিতমুখে) না প্রিয়ে! আমি উন্মত্ত বা অপ্রকৃতিস্থ হই নাই। সে আশঙ্কা করিও না। আমি বেশ সহজ জ্ঞানে ও সুস্থির চিত্তে তোমায় বলিতেছি, তুমি স্বামীর মুখ রাখো,—জগতে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাও! দেখ, রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ কালে,—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সঙ্কল্পে,—স্বদেশ রক্ষার জন্য,—সকল সময়ে আমি সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলেও,—এই মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মক্ষেত্রে, এই পুণ্যময় মুহূর্ত্তে, সত্যপালনে

আমি ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কারণ, এখন আমি রাজা,—ঈশ্বর এখন আমাকে সকলের প্রভুপদে বরণ করিয়াছেন।”

প্রতাপের এই উদার ধর্ম্মমত ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দেখিয়া,—উচ্চলক্ষ্যে তাঁহার চিত্তের এরূপ দৃঢ়তা অবলোকন করিয়া, সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইল।—সকলেই মনে মনে তাঁহাকে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিল।

সতী-প্রতিমা পদ্মিনী এবার ছল্‌ছল্‌ চ'খে, কাঁদ-কাঁদ মুখে কহিলেন, —“প্রভু! আজ দাসীকে কি শিক্ষা দিতেছ? এ শিক্ষা ত জীবনে আর কখন পাই নাই!”

প্রতাপ। তাহা জানি। প্রিয়ে, জীবন-মধ্যাহ্নে এ শিক্ষা যে আজ তোমার নূতন হইল, তাহাও বুঝি। কিন্তু ইহাই সার শিক্ষা। যে স্ত্রী, বিপদ্‌কালে স্বামীর ধর্ম্মের সহায় হয়, সেই স্ত্রীই যথার্থ সহধর্ম্মিণী। দেখ, সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই। আমি এখন সেই সত্যে আবদ্ধ। অতএব তুমি স্বামীকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিয়া, যথার্থ সহধর্ম্মিণীর কাজ কর।

পদ্মিনী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, একটি নিশ্বাস ফেলিয়া গদগদকণ্ঠে কহিলেন,—“স্বামিন! ক্ষমা কর,—দাসী তোমার উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণে অক্ষম হইল! তবে তুমি আমার আরাধ্য-দেবতা, প্রাণের ঈশ্বর। তোমার বাড়া মহাগুরু আমার আর কেহ নাই। তুমি নরকে পড়িতে বলিলেও আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। অতএব তোমার বাক্য-পালনে আমি প্রস্তুত হইলাম!”

সভার মাঝে হরিধ্বনি পড়িয়া গেল।

এবার প্রতাপ আনন্দ-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিলেন,—

“সতি, তুমিই সার বুঝিয়াছ। স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা,—স্বামীই

ঈশ্বর! স্বামী ছাড়া সতীর আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। অতএব, তুমি সেই স্বামিবাক্য পালন করিয়া, পরলোকে অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিলে। আর ইহাও স্থির বিশ্বাস রাখিও,—ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করায়, তোমার কোন পাপ স্পর্শিল না। বরং অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় তোমার সতীধর্ম্ম আরও বিশুদ্ধ হইল। লোকসমাজে ইহা কলঙ্কের কথা বটে,—কিন্তু যিনি মানববুদ্ধির অগম্য, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তর্য্যামী,—সেই লোকেশ্বরই তোমার এই কার্য্যের বিচার করিবেন।"

পদ্মিনী নীরবে, স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া, পুনরায় একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপ পুনরায় কহিলেন,—"দেখ, মনের অগোচর কিছুই নাই। তুমি যদি অন্তরের অন্তরে আমাকে ধ্যান করিয়া, আমাতে ডুবিয়া, আমার প্রেমে মজিয়া, দৈব-দুর্ঘটনায়, অন্যের পাপদৃষ্টির লক্ষ্য হও, তাহাতেও তোমার পাপ স্পর্শিবে না। কারণ, আমাদের এই দেহ স্থূল মাংসপিণ্ড মাত্র। মন খাঁটী রাখিয়া, প্রেমাস্পদের প্রতি জীবনের যথা-সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, ঘটনাধীনে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হইলেও, সতীর সতীত্ব নষ্ট হয় না। কারণ, স্বামীর সহিত অন্তরে অন্তরে—আত্মায় আত্মায় যে রমণ, তাহাই প্রকৃত রমণ;—তাহাই সতী-নারীর ধর্ম্ম। নচেৎ, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ জন্য যে রমণ,—তাহা পশুধর্ম্ম মাত্র। পাশববল ও হীনকৌশল অবস্থাবিশেষে দেহের উপর আধিপত্য করিতে পারে বটে, কিন্তু অনাবিল বিশুদ্ধ আত্মার উপর তাহার কিছুমাত্রও অধিকার নাই। অতএব সতি! আবার বলি,—ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, স্বামীর ধর্ম্মের সহায় হও,——তোমার ধর্ম্মাধর্ম্মের ভার আমার উপর।"

এবার সেই মহামহিমময়ী, রাজরাজেশ্বরী, সতী-লক্ষ্মী পদ্মিনী, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া,—মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিভাব না রাখিয়া, স্বামিবাক্য

পালনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আর এ দিকে অমনি, ধর্ম্মভয়ে কম্পিত-কলেবর সেই ব্রাহ্মণ, "মা মা" রবে, সেই সিংহাসনতলে আছাড়িয়া পড়িল।

বিস্ময়, ভক্তি, আশঙ্কা, উদ্বেগ,—সভাস্থ সকলের হৃদয়ে যুগপৎ বিরাজ করিতে লাগিল।

প্রতাপ সিংহাসন হইতে উঠিয়া, স্বহস্তে সেই ব্রাহ্মণকে ভূমি হইতে তুলিয়া, ধীরগম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"ব্রাহ্মণ! আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী,—সতীশিরোমণি,—যশোহরের রাজ-রাজেশ্বরী,—আপনার প্রার্থনা পূরণেচ্ছায়, এই আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া;—নিজগুণে গ্রহণ করিয়া, আমাকে সত্য হইতে মুক্ত করুন।"

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কহিল,—"বাবা! আমায় ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, আপন চিত্তের লঘুতাবশতঃ, তোমার হৃদয়ের পরীক্ষা লইতে গিয়াছিলাম। আমি জানিতাম না যে, সমুদ্রই বাড়বাগ্নি ধারণ করিতে পারে,—হিমালয় আকাশের বজ্র বুক পাতিয়া লইতে সমর্থ হয়,—সদাশিব কালকূট পানেও অমর হইয়া থাকেন! বাবা! আজ আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইল;—তুমিই আমার চৈতন্য করিয়া দিলে! বুঝিলাম, আমি শশক হইয়া সিংহের বল পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার শাস্তি আমি আপনিই ভোগ করিয়াছি।"

অতঃপর সেই অনুতপ্ত ব্রাহ্মণ, পদ্মিনীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"মা, সতী-কুল-লক্ষ্মি! তুমিও অবোধ সন্তানকে ক্ষমা কর। তোমার ঐ তেজোদ্দীপ্ত মুখপানে চাহিতেও আর আমার সাহস হয় না। জননি! সন্তানকে অভয় দাও। সীতা সাবিত্রীর মত তোমার যশঃ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হউক। মা! ব্রাহ্মণের এ আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবে না!"

সভাস্থ সকলে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ প্রতাপের পানে চাহিয়া আবার কহিলেন,—"মহারাজ! আমার আর কোন প্রার্থনা নাই,—আমি চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, এই অতুল্য সত্যনিষ্ঠায় ও অবিচলিত ধর্ম্মবলে, তুমি চিরদিন রাজরাজেশ্বর হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে প্রজাপালন করিতে থাক।"

অতঃপর সভাস্থ সকলের পানে চাহিয়া,—পরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া, ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে।
প্রতাপ-আদিত্য দাতা অবনীমণ্ডলে ॥"

ব্রাহ্মণ আর ক্ষণেক না দাঁড়াইয়া, তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, দ্রুত-পদে সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন। প্রতাপ হাঁ হাঁ করিয়া, ব্রাহ্মণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেও, ভাবোন্মত্ত ব্রাহ্মণের কর্ণে সে কথা পঁহুছিল না,—তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া গেলেন।

প্রতাপ একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, সভাস্থ সমবেত ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এখন কি করা কর্ত্তব্য? কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমার সকল দিক্ রক্ষা হয়? দেখুন, দত্তবস্তুর পুনর্গ্রহণে মহাপাতক হইয়া থাকে,—ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। এমত অবস্থায়, মহিষীকে যখন আমি একবার দান করিয়াছি, তখন তাঁহার প্রতি আমার আর কোন অধিকার নাই। অথচ, ব্রাহ্মণও তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিয়া গেলেন। সুতরাং এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য,—আপনারা সকলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক, আমাকে তাহার সদুত্তর দিন। শাস্ত্রাদেশ যতই কঠোর হউক,—আমি অম্লানবদনে তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি, জানিবেন।"

নানা দিগ্দেশ হইতে আহূত, সেই বহুশাস্ত্রাধ্যায়ী, বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতবর্গ, তখন পরস্পর তুমুল বিচার-ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দিলেন। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত প্রকার শাস্ত্রীয় মত থাকিতে পারে,—তাঁহারা একে একে তাহার আলোচনা করিলেন। বহুক্ষণ পরে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ মীমাংসিত ও স্থিরীকৃত হইল যে, মহিষী-পরিমিত একখানি স্বর্ণ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, সেই প্রতিমা সেই ব্রাহ্মণকে দিয়া, রাজা আপন স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন;—তাহাতে শাস্ত্রে বা লোকাচারে কোন দোষ স্পর্শিবে না।

প্রতাপাদিত্য অগত্যা তাহাই করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু মহিষীকে কহিলেন,—"রাজ্ঞি! যে অবধি না আমি সে ব্রাহ্মণকে এই স্বর্ণ-প্রতিমা দান করিতে পারি, সে অবধি তুমি———"

পদ্মিনী যেন স্বামীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন,—"মহারাজ! দাসী আপনার মনের ভাব বুঝিয়াছে,—সে অবধি আমি দেবশালায় দেব-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আপনার দর্শন-সুখে বঞ্চিত থাকিব—রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকারও আমার থাকিবে না।"

সভার মাঝে জয় জয় ধ্বনি পড়িয়া গেল।

বলা বাহুল্য, বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের আজ্ঞায় সহজে ও শীঘ্র এই স্বর্ণ-প্রতিমা নির্ম্মাণে কোন অন্তরায় ঘটে নাই। পরে, শাস্ত্র-বিহিত অনুষ্ঠান অনুসারে, যথাসময়ে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে প্রতিমা দান করিয়া, মহিষী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজ্যাভিষেকের পর প্রতাপ,—সেই দেশ-দেশান্তর হইতে আগত সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত, রাজনীতি-বিষয়ে নানা কথার আলোচনা করিলেন। বুঝিলেন, দেশের আপামর-সাধারণ তাঁহার সহিত যোগ দিতে উৎসুক আছে। এরূপ সার্ব্বজনীন সহানুভূতি পাইয়া তিনি অপার আনন্দ লাভ করিলেন। সেই দিন হইতেই প্রকাশ্যরূপে তিনি

সম্রাট্ আকবরের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিলেন। সেই দিন হইতে বঙ্গদেশ স্বাধীন হইল। সেই দিন হইতে প্রতাপাদিত্যের নামে মুদ্রাদিরও প্রচলন হইল।

বাঙ্গালী সেই শুভদিনে জাগ্রতেও সুখস্বপ্ন দেখিয়া কৃতার্থ হইল!

বলা বাহুল্য, সম্রাট্ আকবরও নিশ্চিন্ত রহিলেন না,—প্রতাপের দমন জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপের রাজ্যাভিষেক সমাপ্ত হইল। প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, —সেই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনজনের এক হৃদয়, এক প্রাণ, এক ইচ্ছা ;—একই মহাব্রতে তিনজনে দীক্ষিত। আজি কি শুভদিন! সেই মহাযজ্ঞের আয়োজনে, তিনজনই এক হৃদয় লইয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে নানা অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিন জনেরই একই প্রতিজ্ঞা,—জীবন আহুতি দিয়াও এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমার নির্ম্মল জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত রাত্রি। সূর্য্যকান্ত বড় প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রকৃতির হাস্যময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। চন্দ্রকর-বিভাসিত যমুনার জল নাচিয়া নাচিয়া দুলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে, জ্যোৎস্না-ধারায় জগৎ প্লাবিত হইতেছে—বড় মধুর দৃশ্য! জগতের কোলাহল পশ্চাতে রাখিয়া, বিরামদায়িনী যমুনাতীরে বসিয়া, সূর্য্যকান্ত প্রকৃতির এই অপরূপ রূপমাধুরী দেখিতে দেখিতে পুলকে পূর্ণ হইতেছিলেন। সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্তি দূর করিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে তিনি এখানে আসিতেন। আজিও আসিয়াছেন।

প্রতাপের রাজ্যাভিষেক, জননী জন্মভূমির উদ্ধার সাধন, মোগলের অত্যাচার নিবারণ,—এই সকল চিন্তায় বীরের প্রাণ পূর্ণ ছিল ;—তার উপর প্রকৃতির এই রূপ-মাধুরী,—উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল।

সূর্য্যকান্ত একাকী যমুনাতীরে বসিয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর মধুর শোভা দেখিতেছিলেন। সহসা তাঁহার সম্মুখে কাহার ছায়া পড়িল।

চাহিয়া দেখিলেন,—পরম লাবণ্যবতী এক যুবতী তাঁহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। কে যেন সহসা তাঁহার স্মৃতির মুখাবরণ খুলিয়া দিল। তিনি ভাল করিয়া দেখিলেন;—চিনিতে পারিলেন,—ফুলজানি।

সূর্য্যকান্ত বড়ই বিস্মিত হইলেন। আগ্রহ সহকারে—আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্যই সেই ফুলজানি?"

ফুলজানি,—মুখখানি তেমনি মলিন, আঁখি দুটি তেমনি করুণাপূর্ণ, কণ্ঠস্বরে তেমনি বিষাদ সুর,—ফুলজানি মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"আমি এতদিন পরে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

সূর্য্যকান্তের মনের মধ্যে কি একটা ভাবান্তর হইল।

চারিদিকে জ্যোৎস্নার আলো,—তীরশোভিবনরাজি মৃদু বায়ু-হিল্লোলে ঈষৎ কাঁপিতেছে, যমুনার কালো জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা ভাসিতেছে, পূর্ণচন্দ্র শতভাগে বিভক্ত হইয়া জলতলে শোভা পাইতেছে,—সব সুন্দর! সেই সৌন্দর্য্যের মাঝে, ফুলজানির সেই মধুর মনোহর মূর্ত্তি,—অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া সূর্য্যকান্তের সম্মুখে উপস্থিত। সূর্য্যকান্ত কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—"ফুলজানি! আগ্রায় তোরাবের গৃহে তোমাকে দেখিয়াছিলাম,—সে আজ কতদিন!—তারপর এই আকস্মিক সাক্ষাৎ।—তুমি কি তোরাবের গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ?"

ফুলজানি কোন উত্তর করিল না। যমুনার কালো জলে ক্ষুদ্র তরঙ্গ ভাসিতেছিল,—তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোৎস্না-ধারা কি মধুর লীলা করিতেছিল,—ফুলজানি তাহাই দেখিতে লাগিল।

সূর্য্যকান্ত।—ফুলজানি! তোরাব আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়া, হঠাৎ যে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহার কোন

সংবাদ পাই নাই। সহসা এইরূপ গৃহত্যাগের কারণ কি, এবং তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহা জানিবার জন্য আমি বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই। তুমিও বলিয়াছিলে, আমার কি বিপদ। আমি তখন কিছু বুঝি নাই। এক একবার আমার মনে হইত, তোরাব হয়ত তোমাকে হত্যা করিয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। তুমি আমার শরণার্থিনী হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার বিপদ কি, তাহা জানিবার অবসরও আমার হয় নাই। অনেক দিন তোমার কথা ভাবিয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছিলে,—"হিন্দুর সহিত মোগলের আবার সম্পর্ক কি?"—তবে কি তুমি হিন্দু? যদি হিন্দু, তবে মোগলের গৃহে কেন? আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি? তুমি সেই আগ্রা হইতে, এখানে কেমন করিয়া আসিলে? যদি আমার নিকট কিছু গোপন করিতে তোমার আপত্তি না থাকে, তবে সকল কথা খুলিয়া বলিলে আমি সুখী হইব।

সব কথা বলিবার জন্যই ত ফুলজানির প্রাণের ভিতর একটুকুও শান্তি ছিল না। সব কথা বলিবার জন্যই ত দুঃখিনী সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া, সেই আগ্রা হইতে এই এত দূরে আসিয়াছে। ফুলজানি একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া, একবার আকাশ পানে চাহিল;—জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত সেই বিষাদ-সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব শোভা বিকশিত হইল। সূর্য্যকান্ত মুগ্ধনেত্রে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। দুঃখিনী কি মনে মনে কোন অদৃশ্য দেবতার চরণে তাহার মর্ম্মব্যথা জানাইল?

তার পর ধীরে ধীরে, কোকিলের প্রথম ঝঙ্কারের ন্যায়, ফুলজানি মধুর করুণ স্বরে সকল কথা বলিতে লাগিল।

ফুলজানি বলিল,—"আমার পিতা আগ্রায় থাকিতেন। একদিন আমার জননী শুনিলেন পিতাকে কোন্ দুর্ব্বৃত্ত মোগল হত্যা করিয়াছে।

কেহ বলিল, তাহা মিথ্যা। মা আমার চিন্তিত হইয়া, একদিন রাত্রি-কালে, এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত আমাকে লইয়া, আগ্রাযাত্রা করেন। এই যশোহর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। জলপথ দিয়া গিয়াছিলেন। পথে দস্যুভয় ছিল, আমরা খুব সতর্কতার সহিত যাইতে লাগিলাম। কিন্তু দস্যুর হাত এড়াইতে পারিলাম না। আমি তখন আট বৎসরের বালিকা মাত্র। ঠিক মনে পড়ে না, দস্যু কোন্ স্থানে আমাদিগকে ধরিয়াছিল। দস্যুদল আমাদের দ্রব্য-সামগ্রী ও অর্থ—অতি সামান্যও যাহা ছিল,—সমস্ত কাড়িয়া লইল, এবং নৌকায় তুলিয়া কোন্ দেশে আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া আসিল।

"যে, অর্থ দিয়া আমাদিগকে কিনিয়াছিল, সে মহাপাপিষ্ঠ, মহাপিশাচ! তাহার অত্যাচারে মা-আমার সর্ব্বদাই কাঁদিতেন। পরে এক শিক্ষিত, দয়ার্দ্রচিত্ত মোগল, আমাদের উদ্ধার করেন। তিনিই তোরাব আলি।

"তখন কেহ বুঝে নাই, তোরাবের মনে কি ছিল। মনে যাহাই থাক্, আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া, আমরা তোরাবকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম। কিছুদিন আমাদের বেশ নিরাপদে কাটিল। হায়, তার পর শুনিলাম, তোরাব আমায় বিবাহ করিতে চায়!"——

ফুলজানির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সে সেই সজলনয়নে, আকাশপানে তাকাইয়া বলিল,—"হা ঈশ্বর! আমার কপালে কি মৃত্যু নাই?"

সূর্য্যকান্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"ফুলজানি! তোমরা তোরাবের গৃহে কতদিন ছিলে?"

ফুলজানি। আট বৎসরের কিছু অধিক হইবে। তারপর যাহা বলিতেছিলাম;—তোরাব আলি শিক্ষিত ও বিদ্বান্ বলিয়া সর্ব্বত্রই সুপরি-চিত, কিন্তু তাহার ন্যায় পিশাচ-চরিত্রের মনুষ্য ইহলোকে আর আছে কি

না, জানি না। লোকে তাহার আপাতমধুর বাক্যে ভুলিয়া যাইত। কিন্তু অন্তরের অন্তরে তেমন মহাপাপী বুঝি আর নাই! বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া অনেক কথা হইয়াছিল, আমার মাতা কিছুতেই রাজি হইলেন না। আগ্রায় আসিয়া পিতার হত্যাকাণ্ড সত্য বলিয়া জানিলাম। পিতার শোকে মাতা শোকাকুলা, তার উপর আবার আমার চিন্তা,—নানা কারণে তিনি শীঘ্রই শয্যাশায়িনী হইলেন।

"এই সময়ে তোরাব আলির অত্যাচার প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমরা এতদিন ঈশ্বরের অনুগ্রহে হিন্দুর আচারে ছিলাম, কিন্তু তোরাব আমাকে পাইবার জন্য, আমাদিগকে তাহার অন্ন খাওয়াইবার প্রয়াস পাইল! অনাথা, অসহায়া, শয্যাশায়িনী মাতার চক্ষে জলধারা বহিল; তিনি অন্তিমশয়নে মর্ম্মব্যথায় বলিলেন,—'হরি! অনাথার জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর!'—হা ঈশ্বর! দুঃখিনীর কি কেহ নাই?"

ফুলজানির বিস্ফারিত চক্ষে জলধারা ছুটিল। নির্ম্মল পূর্ণিমা রজনী; নির্ম্মল সুনীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত; নির্ম্মল যমুনাবক্ষে চন্দ্রকরোজ্জ্বল লহরীমালা ভাসিতেছে; নির্ম্মল যমুনাসৈকতে শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি নিদ্রালসে এলাইয়া পড়িয়াছে; নির্ম্মল কৌমুদীস্নাত বৃক্ষবল্লরী নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে!—আর কোথাও কিছু নাই! সব সুন্দর—সব শোভাময়! ফুলজানির চক্ষের জল ধারাও কি সুন্দর!

বীর সূর্য্যকান্তের হৃদয়-দুর্গে কাহার একটুকু তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পঁহুছিল! সেইটুকু দীর্ঘশ্বাসে, তাঁহার হৃদয়ের ভিতর করুণার উৎস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইল।

সূর্য্যকান্ত। আজি হঠাৎ একদিনেই তোমার ইতিহাসের সমস্তই শুনিতেছি। এই তোরাব আলির উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। কয়মাস কাল মাত্র আমি ইহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, ঐ

সময়ের মধ্যে দুই দশ দিনের অধিক তোমায় দেখি নাই। সে সময়ে কোন রকমে তোমার পরিচয় পাইলে, বোধ হয় তোমার দুঃখের কিছু প্রতিকার করিতে পারিতাম।

ফুল। আমার দুঃখের শেষ হয় নাই, বরং আরম্ভই হইয়াছে। দয়া হইলে এখনও তাহার প্রতিকার করিতে পারেন।

সূর্য্যকান্ত। আমি আগ্রায়ও অনেকদিন ভাবিয়াছি, এবং আগ্রা হইতে আসিয়াও তোমার কথা অনেকদিন স্মরণ করিয়াছি। আজিও সন্ধ্যার পূর্ব্বে মোগলের অত্যাচার বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি। সম্রাট্ আকবরের অনেক গুণ আছে স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারিগণ যে, কতদূর নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হয়। তোমার ন্যায় অনেক দুঃখিনীর কথা, আমরা শুনিয়াছি। মোগলের কথা প্রসঙ্গে, অনেকদিন পরে আজ তোমার কথাও মনে উঠিয়াছিল। কিন্তু সহসা তোমায় এখানে এমন অবস্থায় দেখিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

ফুল। সেই কথাই বলিতেছি :—তোরাব আলির অত্যাচার, ক্রমে সীমা অতিক্রম করিল। মা আমায় বলিলেন,—"ফুল! বোধ হইতেছে, শীঘ্র আমার মৃত্যু হইবে না। অথচ এই দুর্দ্দান্ত মোগলের সহিত বিবাদও সম্ভবপর নহে। আমাদের কে আছে? মা, তোমার জন্যই আমার যত ভাবনা! আমি হীনবংশে জন্মি নাই, নীচ প্রবৃত্তিও একদিনের জন্য মনে স্থান দিই নাই। ইহজীবনে যাঁহাকে হৃদয়ের দেবতারূপে পাইয়াছিলাম, —তিনি অতি মহাত্মা ও উন্নতমনা ছিলেন। কুলীন কায়স্থসমাজে তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল। কিন্তু হায়, সে সব এখন আকাশ-কুসুম। মোগলের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, বাস্তুভিটা ছাড়িয়া, আমরা যশোহরে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। আত্মপরিচয় গোপন করিয়া, অতিকষ্টে কায়ক্লেশে দিন কাটাইতে ছিলাম। তথাপি মনের ভিতর বংশগৌরব

চিরজাগরূক ছিল। নহিলে তোমায় তোরাব আলিকে দিতে পারিতাম। হায় কত হিন্দু আজ আকবরের কৌশলে, হীন প্রলোভনে, কন্যা ও ভগিনীকে মোগলের হস্তে সমর্পণ করিতেছে! কিন্তু যে অগ্নিকণা এ প্রাণের মধ্যে এতদিন ছিল, স্বামীর মৃত্যুতে তাহা দ্বিগুণ জ্বলিয়াছে। তার পর এই পাপিষ্ঠ মোগলের অত্যাচারে, সেই বংশাভিমান আজ শতগুণে ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। মা আমার! বরং আত্মঘাতিনী হইয়াও সকল জ্বালা জুড়াইও, তথাপি হিন্দুর পবিত্র নাম, বংশের গৌরব চিরবিলুপ্ত করিয়া, মোগলের বাঁদী হইও না!"——হায়! কে জানিত, মা আমায় শেষ উপদেশ দিলেন! পরদিনে দেখি, তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! হায় মা, দুঃখিনী কন্যাকে কাহার কাছে রাখিয়া গেলে?"

একটুকু কাল মেঘ সহসা পূর্ণচন্দ্রের মুখে পড়িল। চারিদিক্ আঁধার হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যকান্তের উজ্জ্বল নয়ন-তারা কি কিছু অশ্রুসিক্ত হইল? সৌভাগ্য-সূচিত সেই উন্নত ললাট কি কিছু কুঞ্চিত হইল? না,—ঐ ত আবার মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্র তেমনি সুধা-কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে;—ঐ চন্দ্রালোকে দেখ দেখি, সূর্য্যকান্ত তেমনি স্থির, তেমনি অবিচলিত। তবে অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা দেখিতে পার!

অন্তরে কি হইতেছিল? একদিকে করুণার উৎস উঠিয়া, অন্তর দ্রবীভূত করিতেছিল, অন্যদিকে ক্রোধবহ্নি, ভীষণ জিহ্বা অল্প অল্প বিস্তার করিতেছিল। শেষে করুণারই জয় হইল, বহ্নি কিন্তু তথাপি নিবিল না।

সূর্য্যকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তারপর কি হইল? তোমার নয়নের একবিন্দু অশ্রুপাতে যমুনার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিবে,—যশোহর ভাসিয়া যাইবে!—বল, তারপর কি হইল? বল,—তোরাব আলি কি সত্য সত্যই নরশোণিতলোলুপ, পিশাচপ্রকৃতি মোগলের প্রতিমূর্ত্তি? তুমিই কি মোগল-অত্যাচারে-প্রপীড়িতা দুঃখিনী বঙ্গভূমি?"

ফুলজানি চক্ষু মুছিয়া বলিল,—"বীরবর! শুনিয়াছি, এই দুর্ব্বৃত্তগণ এত অত্যাচার করে যে, তাহা মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। অন্যের কথা যতদূর শুনিয়াছি, সে সবের তুলনায়, আমার এ দুঃখও অতি সামান্য। মাতার মৃত্যুর পর আমি সম্পূর্ণ অসহায়। দিনকতক খুব অত্যাচারের পর তোরাব-আলি কিছু নরম হইল। সে বুঝিল, হিন্দুর মেয়ে মৃত্যুকে বড় তুচ্ছজ্ঞান করে,—যখন ইচ্ছা তখনই মরিতে পারে। সেই জন্য বড় কিছু বলিত না। কিন্তু আমার মনে শান্তি-সুখ কিছুই ছিল না। আমি যে কি কষ্ট সহিয়া থাকিতাম, তাহা ভগবান্‌ই জানেন।

"বাঙ্গালায় যশোহর নগর কোথায়,—কতদূরে, কে জানিত? সেই কি আমার জন্মস্থান? সব কথা জানি না, কিন্তু মাতা বলিয়াছিলেন, সেইখানেই আমার জন্ম হয়। তবে, এই ত আমার সেই প্রিয় জন্মভূমি! পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী নীল আকাশপানে চাহিয়া, যেমন তাহার প্রিয় বনস্থলীর কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হয়, কতবার,—কতবার আমিও তেমনি কল্পনার চক্ষে এই দেশ দেখিতে পাইয়াছি! মনে হইত, সেখানেও কি মোগলের এমনই অত্যাচার আছে? থাকে থাক্,—একবার সে জন্মভূমি দেখিয়া জীবন সার্থক করিব!

"তোরাব আলি আমাকে শিক্ষা দিত। মাতার তাহাতে আপত্তি ছিল না। অল্পদিনে আমি কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম। বাঙ্গালার অবস্থা, বাঙ্গালায় মোগলের আধিপত্য,—বাঙ্গালার অনেক কথা বলিয়া, তোরাব আমাকে বুঝাইত,—এই বাঙ্গালা অতি কদর্য্য স্থান। বাঙ্গালার আব্-হাওয়া অতি মন্দ। সেই জন্য বাঙ্গালী দুর্ব্বল, ভীরুস্বভাব এবং মিথ্যা-বাদী। বাঙ্গালী রমণীরও যেটুকু সাহস এবং মনের তেজ আছে, বাঙ্গালী পুরুষের তাহাও নাই।" আরও কত কথা বলিত। মাতা বুঝাইতেন,—"তোরাবের কথা ঠিক নহে। মোগল এখন রাজা, সুতরাং বাঙ্গালীকে তাহারা এখন যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে যে বীর নাই তাহা নহে,—বাঙ্গালীর একতার অভাবেই বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" তখন আমার মনে হইত,—এমন বীর কি কেহ নাই, যিনি এই একতাবন্ধনে সমগ্র বঙ্গ এক করিয়া; বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক দূর করিতে সমর্থ হন?

"বড় সৌভাগ্য, মহারাজ প্রতাপাদিত্য আজ বাঙ্গালীর সেই মহাকলঙ্ক মোচন করিয়াছেন!"

সূর্য্যকান্তের চক্ষু ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল। এই বালিকা—কে?

এ কি বালিকা, না কোন বীর-রমণী—এমন মধুর উদ্দীপনায় তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছে!

করুণার উৎস ত বহিয়াই ছিল, এখন সেই করুণার উপর একটু কি জমাট বাঁধিল। তাহা কি ভালবাসা,—প্রেম? আ ছি ছি! তা নহে, বীরত্বের সহিত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মিলন-সূচনা!

সূর্য্যকান্ত। তুমি কে, আমি এখনও কিছু বুঝিলাম না। তুমি যেই হও, আজি বাঙ্গালীর এ শুভদিনে, তোমার আবির্ভাব, বাঙ্গালীর মঙ্গলের হইবে। দেবি!—তুমি বালিকা নহ,—আমি তোমাকে বুঝি নাই; তুমি যেই হও, আমি তোমাকে দেবী বলিয়াই জানিব।

ফুলজানি বলিতে লাগিল,—"তোরাবের অত্যাচারের উহাই সীমা নয়। আমাকে যে কত প্রকারে কত অপমান, কত লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন। বিশেষতঃ যে দিন হইতে আপনি তোরাবের শিষ্য হইয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই তোরাব আমার প্রতি অধিকতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। পাপিষ্ঠ, আমার 'ফুল-কুমারী' নাম ঘুচাইয়া, 'ফুলজানি' নামে আমাকে অভিহিত করিল। এবং হিন্দুর বেশ ছাড়াইয়া মোগলের বেশ পরিতে দিল।

সূর্য্যকান্ত। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আগ্রায় তোরাবের গৃহেও, তুমি তোরাবের এই অত্যাচারের কথা, সংক্ষেপে আমায় বলিয়াছিলে; এখনও বলিলে। কিন্তু ইহার আসল কারণটা কি, আমায় বলিবে? সত্যই কি তুমি—

ফুলজানি মুখখানি ভূমিপানে অবনত করিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীর অবশ হইল, চরণ টলিতে লাগিল,—বুঝি সমগ্র পৃথিবীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল। সে কিছুই বলিতে পারিল না।

সূর্য্যকান্ত। যদি বলিতে কোন বাধা থাকে, না হয় বলিয়া কাজ

নাই। কিন্তু আমি তোরাবের শিষ্য হইলে, কেন তিনি তোমার প্রতি অধিকতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন,—ইহারও মূল কারণ সঠিক জানিতে ইচ্ছা থাকিলেও, আপাততঃ সে কৌতূহল দূর করিলাম।

এবার ফুলজানির কথা ফুটিল। অন্তরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া সে মনে মনে বলিল,—

"যে কথা বলিবার জন্য আমার প্রাণ অস্থির,—বুক বিদীর্ণপ্রায়, তাহা কি আর ইনি বুঝেন নাই? তবু বলি,—কেন না বলিব? জীবনের সকল আশা-ভরসা, সকল সাধ-আহ্লাদ ত গিয়াছে,—তবু রমণী-জনমের সকল আশার সার এই পবিত্র বাসনা, আমার বুকের ভিতর দিবানিশি জ্বলিতেছে;—এই শিখা কি আপনা আপনিই ভস্মীভূত হইবে?—'তুমিই আমার প্রাণের দেবতা'—আজি মুক্তকণ্ঠে এ কথা ব্যক্ত করিব।—আমার রমণীজনমের সাধ আজ মিটাইব। হে দেবতা! তুমি এই অবলা-রমণীকে বল দাও!—ইনি কি বিরক্ত হইবেন? ঘৃণায় কি ইনি মুখ ফিরাইবেন? কি জানি, বীরব্রতে যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার কি প্রণয়ের অবসর আছে? সকল আশা ত গিয়াছে,—জীবনের মায়া-মমতাও বড় রাখি নাই;—কেবল এই আশায় প্রাণ রাখিয়াছি,—না হয়, এ আশাও নির্ম্মূল হইবে,—সঙ্গে সঙ্গে এ জীবন-দীপও চিরনির্ব্বাপিত হইবে।—সেও ভাল, তবু একবার বলি। বলি যে, 'হে চিরবাঞ্ছিত! হৃদয়ের অন্তস্থলে তোমার ঐ বীরমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেবতাজ্ঞানে তোমার চরণে প্রেমাঞ্জলি দিয়া, আমি কৃতার্থ হইয়াছি'!"

আনন্দ, ভয়, বিস্ময়, লজ্জা—একে একে নানা ভাবের ছায়া ফুলজানির মুখে খেলিতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত সেই জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত নির্ম্মল নিশায়, সেই অনিন্দ্য সুন্দরীর ম্লানমুখে, এই অপূর্ব্ব ভাবাভিনয় দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলেন। চন্দ্রকরোজ্জ্বল যমুনার প্রতি চাহিয়া দেখ, সেখানেও

এমনি ভাবের অভিনয়! তুই-ই এক সুরে বাঁধা। এই দেখ, চন্দ্রমা যমুনার বক্ষে শোভা পাইতেছে,—পরক্ষণে দেখ, খণ্ড খণ্ড মেঘ আসিয়া চন্দ্রমা ঢাকিয়া ফেলিল, আর সেই সঙ্গে উজ্জ্বল যমুনাবক্ষেও একটা কালো ছায়া পড়িল! এই দেখ, নির্ম্মলসলিলা যমুনা শান্ত, স্থির,— লহরীগুলি নিদ্রালস হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে,—পরক্ষণে দেখ, অল্প বাতাসেই বড় বড় তরঙ্গ উঠিল,—তরঙ্গে সেই নীলাকাশ, চন্দ্র, তারা, বনস্থলী— সকলের ছায়া, যমুনার বক্ষে শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। ফুলজানির অন্তরেও এমনিতর একটা ভাবাভিনয় চলিতেছিল। তাহার সেই নির্ম্মল মুখমণ্ডলে স্পষ্টই সে লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। সূর্য্যকান্ত বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহাই দেখিতেছিলেন।

ফুলজানি বলিল,—"আপনাকে সকল কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছি, আজ সকল কথাই বলিব। এই প্রশান্ত যমুনা,—এই মধুর জ্যোৎস্না রাত্রি,—এই হাস্যময়ী প্রকৃতি,—দেব! আমার মর্ম্মকাতরতা আজ শত-গুণ বাড়িয়াছে। উপরে ঐ উদার অনন্ত আকাশ, নিম্নে এই অনন্তবিস্তৃতা স্রোতস্বতী,—প্রকৃতির এই মুক্ত-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, প্রাণ খুলিয়া সকল কথা বলিয়া, আজ আমি আমার দুর্ব্বহ জীবন-ভার লাঘব করিব। আপনি অপরাধ লইবেন না।"

ফুলজানি তাহার সেই সজল নয়নপদ্ম দু'টি একবার উপরপানে তুলিয়া, পরক্ষণে ধীরে ধীরে তাহা সূর্য্যকান্তের প্রতি ন্যস্ত করিল। সূর্য্যকান্ত সেই ব্যথাপূর্ণ মমতাময় চক্ষু,—সেই নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রমা,—সেই বিষাদে-শোভাময়ী-মূর্ত্তি, অন্তরের অন্তর হইতে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। ফুলজানি একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—

"দেব!—প্রাণ গেলেও যে কথা স্ত্রীলোকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, আমি আজ লজ্জার মাথা খাইয়া, আপনাকে সেই কথাই বলিব। আমি

তোরাবের অভিপ্রায় অনেক দিন বুঝিয়াছিলাম। সর্পের নিকট হইতে মানুষ যেমন দূরে থাকে, নিকটে থাকিলেও, আমি তোরাব আলি হইতে সেইরূপ দূরে ছিলাম। অনেক সময় আমার মনে হইত,—'এ জীবনে কাজ কি? এ নিষ্ফল জীবন লইয়া কি করিব? হিন্দুর কন্যা হইয়া, মোগলের বাঁদী সাজিতে যখন কিছুতেই পারিব না,—তখন মরি না কেন?' মনের যখন এই অবস্থা, তখন আমার অন্তরের দেবতা আমাকে দেখা দিলেন। সেই বীরত্বমণ্ডিত, অপূর্ব্ব রূপ-শ্রী, সেই জ্ঞানগর্ব্বিত উন্নত ললাট, সেই বিশাল নয়ন যুগল,—এই দুঃখিনীর অন্তরে, কি এক তরঙ্গ তুলিল! আমার আর মরা হইল না, আবার বাঁচিতে সাধ যাইল,—জীবন নিষ্ফলবোধ করিলাম না! সেই অযাচিত সুখের সঙ্গে যে দুঃখ আসিল, তাহা যথেষ্ট হইলেও ভ্রূক্ষেপ করিলাম না! কে জানিত,—কে-ই বা কখন জানিতে পারিয়া থাকে যে, মোগলের গৃহে বসিয়া, মোগলের সকল অত্যাচার সহিয়াও,—এক অসহায়া অবলা, নির্ব্বিকারভাবে তাহার অন্তরের অন্তরে এক হিন্দুবীরকে পূজা করিতেছে! আপনি বীর, আপনি জানেন,—আপনাকে কেনই বা বলিতে হইবে যে,—হিন্দুরমণী চিরদিন বীরপূজা করিয়াছেন;—আমিও সেই বীরপূজা করিয়া ধন্য হইয়াছি!"

সূর্য্যকান্ত সমস্তই বুঝিলেন। তিনি ফুলজানির প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিলেন। দেখিলেন,—যতদূর দেখা যায়, ততদূর দেখিলেন, সরলা ফুলজানি সত্য সত্যই আজ তাহার হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া, অকপটে—নির্ব্বিকারচিত্তে, সকল কথাই ব্যক্ত করিতেছে!

সূর্য্যকান্ত স্তম্ভিত হইলেন। অথচ তাঁহার হৃদয়ে এতটুকুও তরঙ্গ উঠিল না। বলিয়াছি ত, সেই অজেয় হৃদয়-দুর্গে মদনের ফুল-শর সহসা কিছু করিতে পারে না। অবিচলিতভাবে সূর্য্যকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তারপর কি হইল ? তোরাব তোমাকে লইয়া কোথায় গেলেন ? এবং তারপর, কেমন করিয়াই বা তুমি এখানে আসিলে ?"

ফুলজানি। আপনাকে বিদায় দিয়া, সে দিন তোরাব আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার ও অপমান করিল। তারপর, সেই রাত্রেই আমাকে সঙ্গে লইয়া আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিল। আমি অনেক কাঁদিলাম, কিছুতেই তাহার মন গলিল না। সে আমাকে লইয়া দিল্লীতে গেল। দিল্লীতে আমরা অনেকদিন ছিলাম। তারপর যখন তোরাব শুনিল, আপনারা আগ্রা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিতেছেন, তখন পুনরায় আমাকে লইয়া আগ্রায় আসিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে, তোরাব বলিত,—'দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম।' তদবধি হিন্দুর প্রতি তোরাবের বিদ্বেষবহ্নি আরও অধিক মাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল। উঠিতে বসিতে সর্ব্বদাই সে আমার সম্মুখে হিন্দুর নিন্দা ও কুৎসা করিতে লাগিল। হিন্দুর নিন্দা,—হিন্দুর কুৎসা,আমার অন্তরে যে কিরূপ আঘাত করিত, তাহা বুঝাইতে পারি না। কিন্তু আমি কি করিতে পারি ? নীরবে সেই সকল শুনিতাম,—নীরবে তাহা সহ্য করিতাম,—আর নীরবে ভগবানের নিকট কাতর-হৃদয়ে জানাইতাম,—'হায় প্রভু ! হিন্দুর এ দুর্দ্দিন কি ঘুচিবে না ?'

সূর্য্যকান্ত। ফুলজানি, তোমার সে প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই। হিন্দুর সৌভাগ্যের সূচনা হইয়াছে। আজ বাঙ্গালী-বীর, বাঙ্গালার সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছেন। তুমি বাঙ্গালীর গৃহে জন্মিয়াও যে এমন বীরহৃদয় লাভ করিয়াছ, ইহা দেশের সৌভাগ্য। মা-ভবানীর চরণে প্রার্থনা কর, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাই যেন দেশকে তোমার মত ভালবাসিতে শিখে। নারীকুলে তুমি ধন্যা !—তারপর ?

ফুলজানি। তোরাবের অত্যাচার অসহ্য হইল। একদিন এতদূর হইল যে, হয়—আমার হিন্দু-নাম লোপ পাইত, নয়—আমাকে প্রাণে

মরিতে হইত! সেই লজ্জাকর কুৎসিত কাহিনীর আর উল্লেখ করিব না। দৈবক্রমে সেইদিন এক বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ-কন্যার সাক্ষাৎ পাই। তিনি বহু তীর্থ করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। তাঁহারই চরণে শরণ লইলাম। আমি পুরুষবেশে তোরাবের গৃহ হইতে কৌশলে পলাইয়া আসিলাম। অবশেষে অনেক কষ্টে সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার সঙ্গে এখানে আসিয়াছি। এখন আমি তাঁহার গৃহেই আছি। তোরাব অবশ্যই অনুসন্ধান করিবে, এবং বুঝিবে, আমি এইখানেই আসিয়াছি। তখন আপনার কর্ত্তব্য আপনি করিবেন। এখন আমি আপনারই শরণাপন্না। যে ক্ষীণলতিকা আপনার চরণে আশ্রয় লইয়াছে, ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাকে রাখিতে পারেন,—ইচ্ছা করিলে তাহাকে চরণচ্যুত করিয়া পদদলিত করিতেও পারেন!

দূরে কে, এক সঙ্কেতসূচক বাঁশী বাজাইল। সূর্য্যকান্ত সেই সঙ্কেত রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি দূরে থাকিতেন, কাহারও বিশেষ কোন আবশ্যক হইলে, সেই বাঁশী বাজিত,—আর সূর্য্যকান্ত সেই সঙ্কেত বুঝিয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন।

কে বাঁশী বাজাইল। সূর্য্যকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—

"আর কোন কথা কহিবার বা শুনিবার অবসর আমার নাই,—এখনই আমাকে যাইতে হইবে। তোমার সহিত আর আমার দেখা হইবে কিনা জানি না। প্রয়োজন হয়, দেখা করিও। এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর,—আবশ্যক হইলে সেনানিবাসের যে কাহাকেও ইহা দেখাইও,—সেই তোমাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে। তোরাব কি অন্য কোন মোগল এখানে তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি নির্ব্বিঘ্নে সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার বাটীতে থাকো। তোমার থাকিবার সকল বন্দোবস্ত আমি করিয়া দিব। তোমাতেই, আমি মোগল-অত্যাচারে-প্রপীড়িতা দুঃখিনী বঙ্গভূমির প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছি,—এখনও তাহাই দেখিব। স্বদেশের চির-উদ্ধারের

জন্য প্রতাপ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন;—আমাদেরও যেটুকু সামর্থ্য, তাহাও স্বদেশ-সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি। এখন আর আমার অন্য কোনও কাজে অধিকার নাই। মন প্রাণ সকলই ভগবৎ-চরণে সমর্পণ করিয়া নির্ম্মল সুখ পাইবে। যদি আবার কখন দেখা হয়, তোমার ঐ অমূল্য উৎসাহ-বাক্য শুনাইয়া, আমাদের বীরব্রতসাধনের সহায় হইও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।”

সূর্য্যকান্ত ফুলজানির নিকট হইতে সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার পরিচয়াদি লইয়া চলিয়া গেলেন।

ফুলজানি যমুনাতীরে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তখন জ্যোৎস্নালোক একটু একটু করিয়া নিবিয়া আসিতেছিল,—যমুনার শ্বেতসৈকতে ম্লানছায়া পড়িতেছিল।

যমুনা-তীরে বসিয়া, সেই অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী অনেক কথাই ভাবিল। সূর্য্যকান্ত তাহার উৎসাহ-বাক্যই শুনিতে চান, তবে কি প্রণয়-কাহিনী শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়াছেন? তবু ফুলজানি ভাবিল,—“আর কিছু না হউক,—অন্তরের সকল কথা ব্যক্ত করিয়া আজ আমি কৃতার্থ হইয়াছি।”

ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাসে সাগরে মিশিতে চাহিল,—সাগর কি সেই ক্ষীণহৃদয়া স্রোতস্বতীকে হৃদয়ে স্থান দিবে না? রমণীর এ বীর-পূজা কি নিষ্ফল হইবে? এ পূজার কি কোন পুরস্কার নাই? তবে ফুলজানি! ঐ স্বচ্ছ যমুনা-তলে, ঐ নৈশ-আকাশের শোভা দেখিতে দেখিতে, তুমি ডুবিয়া মর না কেন?

ঐ দেখ! চাঁদ হাসিতেছে,—চকোর চকোরী চাঁদের সুধা পান করিতেছে,—যমুনার জল ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে,—নির্জ্জন বনস্থলী গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে;———ঐ শুন! অতি দূরে কে কাঁদিতেছে,—

স্নেহকণ্ঠে কে গলা ধরিয়া কাঁদিতে ডাকিতেছে ;—আকাশে কে মধুরস্বরে বাঁশী বাজাইতেছে ;—বাঁশী যেন বলিতেছে,—'আয় আয়,—আমার কাছে আয়, [illegible] কোলে আয়!' এই সুন্দর সময়, সুন্দর স্থান, সুন্দর [illegible]—ফুলজানি তুমি মরিবে কি ?

না।

ফুলজানি প্রেম-পাগলিনী নহে। প্রেম-শিখা নির্ব্বাপিত হউক, তবু ফুলজানি বাঁচিবে! তাহার অন্তরে স্বদেশ-ভক্তি জাগিতেছিল,—স্বদেশের শত্রুনাশে তাহার জীয়ন্ত উৎসাহ!—প্রেম-শিখায় সে উৎসাহ ভস্মীভূত হইবে না।

ফুলজানি রমণী-রত্ন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

ফুলজানি, সূর্য্যকান্তকে সকল কথা বলিয়া, মন-ভার অনেকটা লাঘব করিল। কিন্তু এক ভাবনা গিয়া আর এক ভাবনা তাহার মনে জাগিল। ফুলজানি ভাবিতে লাগিল,——

“আমার বুকের ভিতর এই যে আগুন দিবারাত্রি জ্বলিতেছিল, আজি তাহা নির্ব্বাপিত হইল! পুরুষের নিকট কোন রমণী কি এমন নির্লজ্জা হইয়া প্রণয়-কাহিনী ব্যক্ত করে?—তা জানি না। কিন্তু আমার যে প্রাণ বাহির হইতেছিল। কতদিন কত সন্ধানের পর তবে আজি দেখা মিলিল! আজ যদি দেখা না পাইতাম,—আজ যদি মনের ব্যথা না জানাইতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত, যমুনার ঐ অতলগর্ভে এ দুর্ব্বহ-জীবন পরিত্যক্ত হইত!—কিন্তু তিনি কি মনে করিলেন? দুরাকাঙ্ক্ষ-পরায়ণা, দুষ্টা রমণী ভাবিয়া কি তিনি বিরক্ত হইলেন?—“আর দেখা হইবে কি না জানি না”—একথা কেন বলিলেন? তবে কি সত্য সত্যই তিনি বিরক্ত হইয়াছেন? যদি তাহাই হয়?—না, না, অমন হইতেই পারে না। তিনি বীর,—স্বদেশের হিতকামনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন,—এখন কি রূপসীর রূপমোহে তিনি আত্মহারা হইতে পারেন?—রূপসী! আমি কি রূপসী? কে জানে, আমি কেমন? তোরাব বলিত, আমার রূপের শিখায় তাহার সর্ব্বস্ব জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়াছে! এ কথা কি সত্য? এতই কি আমার রূপ? যদি বিধাতা এতই রূপ দিয়াছেন, তবে কি ইহা নিষ্ফল হইবে?”

মাথার উপর একটা নিশাচর পক্ষী বড় বিকট চীৎকার করিয়া

স্নেহকণ্ঠে কে গলা ধরার শব্দে প্রকৃতির মধুর তন্দ্রাটুকু যেন ভাঙ্গিয়া গেল! বাঁশী বাজাইতেছে উঠিল।

আয়, কারর্ঘ্যা আবার ভাবিতে লাগিল,—"আ ছি ছি! আমি এ কি সংপুরুষ? দেশ ব্যাপিয়া মোগলের অত্যাচার,—জননী-জন্মভূমি বিষাদময়ী,—স্বদেশবাসী শত অভাবগ্রস্ত,—নরনারী দুঃখে ও মনাগুনে দগ্ধ,—সে চিন্তা দূরে রাখিয়া, আমি কিনা প্রেম-উপাসনা করিতেছি? হা ধিক্ রমণীজনমে! যে পুরুষসিংহ জীবন-যৌবন স্বদেশ-হিত-ব্রতে উৎসর্গ করিয়া, মানব-জন্ম সার্থক করিয়াছেন,—আমি পাপীয়সী,—রূপের ফাঁদ পাতিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে যাইতেছি! দূর হউক! এ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া যমুনায় ভাসাইয়া দিব,—জীবনের সকল সাধ জন্মের মত ঘুচাইব, তথাপি আর এ পাপ বাসনা মনে স্থান দিব না।"

ফুলজানি আবার ভাবিল,—"মহারাজ প্রতাপাদিত্য যে উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন,—এই ক্ষুদ্র রমণী-হৃদয়েও কি সে আশা নাই? মহাবীর শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত তাঁহার যে মহা-অনুষ্ঠানের সহায়, এই ক্ষুদ্র রমণীও কি তাহার কিছুই করিতে পারে না?

"সাধ হয়, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, প্রাণ ভরিয়া স্বদেশবাসীকে আহ্বান করি,—"আত্ম-বিরোধ ভুলিয়া গিয়া, এস ভাই এস, আজ সকলে সেই দেশের শত্রু,—হিন্দুর শত্রু,—দেবতার শত্রু,—মোগলকে দেশ হইতে দূরীভূত করি!" কেন, ইহা কি অসম্ভব? যখন পুরুষবেশে আগ্রা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম,—কে আমায় চিনিতে পারিয়াছিল? হায়, রমণী না হইয়া যদি পুরুষ হইতাম! তাহা হইলে এই মহাযজ্ঞে, এ জীবন আহুতি দিয়া আজ কৃতকৃতার্থ ও ধন্য হইতে পারিতাম।"

মাথার উপর আবার সেই নিশাচর পক্ষী চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে ফুলজানির সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল।

ফুলজানি আবার কি ভাবিল। তন্ময়ী হইয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। হৃদয়ে বল আসিল। মনে শক্তির সঞ্চার হইল। সুন্দরী উত্তেজিত-হৃদয়ে আপন মনে বলিলেন,—"হাঁ, তাহাই হইবে। আমি রমণী হইলেও, এখন আর বালিকা নহি। কেন, এ হৃদয়ে কি সত্য সত্যই কিছুমাত্র উদ্রেক জন্মে নাই? এ দেহে কি এতটুকুও বল নাই? শুনিয়াছি, রাবণবিজয়কালে শ্রীরামচন্দ্রকে ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়ালও সাহায্য করিয়াছিল! আর আমি চেষ্টা করিলে, কি দেশের একটি শত্রুও বিনাশ করিতে পারিব না? প্রেম, প্রেম! কেন, রমণী-জন্ম কি কেবলই পুরুষের দাসী হইবে বলিয়া? আজ হইতে আমার প্রেম-ব্রত,—জননী-জন্মভূমিকে লইয়া! লহ মা,—এ দুঃখিনী কন্যার প্রেম-অর্ঘ্য তুমিই গ্রহণ কর! আর তুমি সূর্য্যকান্ত!———"

ফুলজানি একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,"না,—মনুষ্যজীবন বড়ই পরাধীন! এই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মনে দুই ভাবের উদয় হইল! কিন্তু তথাপি এ চিন্তা আমাকে কিছুকাল ভুলিয়া থাকিতে হইবে। অগ্রে তাঁহার মহাব্রতের সহায় হই?—ব্রত উদ্‌যাপিত হউক? তারপর? প্রভু, তুমিই এ হৃদয়ের অধীশ্বর! তুমি চাও আর না চাও, সে তোমার ইচ্ছা;—আমি কিন্তু জীবনে-মরণে তোমারি রহিলাম! প্রাণেশ্বর! আজ হইতে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রমণী, তোমার জীবন-যজ্ঞে, আত্মপ্রাণ আহুতি দিতে সঙ্কল্প করিল। বুঝিলাম, এই মহাকার্য্য সাধনে, যদি এক পদও অগ্রসর হইতে পারি, তবেই আমি তোমার উপযুক্ত। নহিলে, ক্ষুদ্র হরিণী হইয়া সিংহের পার্শ্বে বসিবার সাধ আমার বিড়ম্বনা মাত্র।"

ভাবিতে ভাবিতে ফুলজানির হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। ফুল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—সূর্য্যকান্তের সহিত আর একবারমাত্র দেখা করিয়াই বিদায় লইবে।

ফুলজানি গৃহে ফিরিলে, তাহার সেই আশ্রয়দায়িনী ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ফুল, এত রাত্রি কোথায় ছিলে মা ?"

ফুলজানি। আপনি ত জানেন, সূর্য্যকান্তের সহিত সাক্ষাতের জন্য ফিরিতেছি।

ব্রাহ্মণী। দেখা কি মিলিল না ?

ফুল। আজ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি,—সেই জন্যই এত রাত্রি হইল।

ব্রাহ্মণী। তিনি কি বলিলেন ?

ফুল। তিনি আপনার আশ্রয়েই আমাকে থাকিতে বলিয়াছেন,—আমার সকল ভার তিনি লইয়াছেন।

ফুলজানি সে রাত্রি বিনিদ্র নয়নে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তা এতটা বাড়াবাড়ি, বৃদ্ধ রাজা বসন্ত রায়ের ধাতে সহিল না। তিনি বলেন, "রাজ্যের প্রসর বৃদ্ধি করিবে—কর; নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবে--রাখ; তা বলিয়া ভারত-সম্রাট আকবরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কিছুতেই শোভা পায় না! বিশেষ, হিঁদুর ছেলে ভাগ্যমন্ত হইয়াছ,—দশ জনকে প্রতিপালন কর; সামাজিকতায় ও লৌকিকতায় সকলকে আপ্যায়িত কর; শিষ্টাচারে ও পরোপকারে দিন কাটাও; সকলকে লইয়া মিলিয়া-মিশিয়া থাকিয়া, ভগবানের নাম-গান করিয়া, শান্তিলাভ করিতে থাকো;—তা নয়,—কেবলই যুদ্ধবিগ্রহের পরামর্শ আঁটা,—দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবার মতলব,—আর গোলা-গুলি-বন্দুকের দুম্-দাম শব্দ! দিন-রাত কি, এ আর ভাল লাগে? শেষ কিনা, বাদসার সঙ্গে টক্কর দিয়া, আপন নামে মুদ্রা চালাইয়া, রাজদ্রোহী হইবার সাধ! কাজ কি এমন স্বাধীন হইয়া? নররক্তে বসুন্ধরা প্লাবিত করিয়া, কোন্ ইষ্টসিদ্ধি হইবে? রাজ্যলাভ? কার রাজ্য,—কে শাসন করিবে? চিরদিন কেহ এখানে থাকিতে আসি নাই! মানুষ আপন আপন অধিকার সাভ্যস্ত করিতে গিয়া, কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরে,—আর ভগবান্ অলক্ষ্যে থাকিয়া, তাহা দেখিয়া হাসিতে থাকেন! এই ত পরিণাম—এই ত লাভ! হায় রে! সকলই ক্ষণভঙ্গুর,—সকলই ভোজবাজী,—সকলই মায়া!"

এইরূপ অনুযোগ, এইরূপ যুক্তি, এবং সময়ে সময়ে কতকটা বিঘ্ন উৎপাদন করিবারও চেষ্টা,—সেই উদ্যমশীল, কর্ম্মবীর প্রতাপাদিত্যকে

বড়ই বিরক্ত করিয়া তুলিল। শেষ বসন্তরায় একদিন স্পষ্টই বলিলেন,—"প্রতাপ, আমি তোমার এ রাজদ্রোহিতার মধ্যে নহি।" শুধু বলিয়া খালাস নহে,—পুত্রগণের পরামর্শে, এ সময় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের কতকটা বিরুদ্ধাচরণ করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ প্রজাগণকে, প্রতাপের নামীয় মুদ্রার ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এবং সম্রাটের নিকট আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণেরও কতকটা চেষ্টা পাইলেন।

অতুল ক্ষমতাশালী প্রতাপ, পিতৃব্যের এ ব্যবহার নীরবে সহিলেন।

তারপর আর এক ঘটনা ঘটিল। পরলোকগত বিক্রমাদিত্য ইতিপূর্ব্বে বসন্ত রায়ের অংশে যে জমিদারী চিহ্নিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চাকসিরি পরগণাও ছিল। এই চাকসিরি—পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত আধুনিক বরিশাল-বাখরগঞ্জের মধ্যে। প্রতাপের এখন সেই চাকসিরি পরগণার বিশেষ আবশ্যক হইল। কারণ, এই পরগণা হস্তগত হইলে, তিনি দুর্দ্দান্ত মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে অনায়াসে দমন করিতে পারেন। অন্যথায়, তাঁহার রাজ্যের বড়ই বিশৃঙ্খলা ও শান্তিভঙ্গ হইতে চলিয়াছে। প্রতাপ সেই পরগণার চারিগুণ জমিদারী দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, বিনীতভাবে পিতৃব্যকে জানাইলেন,—"দয়া করিয়া আমাকে এই পরগণাটি ছাড়িয়া দিন। দেখুন, আমি যে মহাব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহাতে প্রজাগণের দুঃখ ও দুর্দ্দশা দেখিলে, আমার বক্ষে শেলবিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ, ঐ পরগণা লইয়া, আপনি নিজেও সেই দুর্দ্দান্তগণকে দমন করিতে পারিতেছেন না।" এ কথায় বসন্ত রায়ের মন গলিল, তিনি প্রতাপের প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ পিতার এই কার্য্যে বিশেষ বাদী হইল। একজন প্রবল জ্ঞাতির যাহাতে বিশেষ উপকার হয়, তাহারা সকলে একজোট হইয়া, প্রাণ থাকিতে

তাহা পিতাকে করিতে দিবে না বলিল। অগত্যা বসন্ত রায়কেও শেষে পুত্রগণের মতে মত দিতে হইল। প্রতাপ নিরাশ হইলেন।

তখনও প্রতাপের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না,—তিনি এক উপায় ঠাওরাইলেন। পূর্ব্ববঙ্গে আপনার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য,—মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি চন্দ্রদ্বীপের তরুণ-বয়স্ক রাজা রামচন্দ্রের সহিত, কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ দিলেন। বসন্ত রায়ের পুত্রগণ দেখিল, প্রতাপ প্রকারান্তরে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়াছে। তখন তাহারা রীতিমত জ্ঞাতিশত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিল। প্রতাপ তাহাও হাসিয়া উড়াইলেন। মনকে প্রবোধ দিলেন,—"আহা, যাহাদের আর কোন সম্বল নাই,—তাহারা অন্যের হিংসা করিয়া সুখী হয়—হউক।"

বসন্তরায়ের পুত্রগণ ক্রমেই পিতার কাণ ফুস্‌লাইতে আরম্ভ করিল। নিরীহপ্রকৃতি, সরল বসন্তরায়, যে যা বলে, তাই বিশ্বাস করেন। পুত্রগণ তাঁহাকে ক্রমেই বুঝাইল,—"প্রতাপ যেরূপ নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, তাহাতে সে সকলই করিতে পারে। আমাদের এখন সর্ব্বদাই আশঙ্কা,—পাছে আপনাকে, ও, কোন্ দিন কি করিয়া বসে। দেখুন, প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল একে একে সকলই ফলিয়া আসিতেছে। এত বড় প্রবল প্রতাপান্বিত হওয়াও যদি উহার সম্ভব হয়, তবে একদিন যে উহাতে 'পিতৃদ্রোহিতা' মহাপাতক স্পর্শিবে না,—কে বলিতে পারে? বিশেষ, যতদিন জেঠা মহাশয় ছিলেন, সত্য কথা বলিতে কি, আমরা এজন্য বড় ভাবি নাই; কিন্তু এখন আপনাকে লইয়া আমরা বিষম দুর্ভাবনায় পড়িয়াছি। প্রতাপের কোষ্ঠীতে, "পিতৃস্থানে রক্তপাত" স্পষ্ট লেখা আছে। 'পিতৃ-স্থান' বলিতে, কেবলই পিতাকে বুঝায় না,——পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ —ইহাঁরা সকলেই পিতৃস্থানীয়। অতএব, এখন আমাদের কি করা

কর্ত্তব্য, আপনিই উপদেশ দিন। আর নয় চলুন, আমরা দিন থাকিতে বাদসাহের শরণাপন্ন হই, এবং প্রতাপের সমস্ত রাজনীতিজাল ছিন্ন করিয়া ফেলি।"

নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি, ইন্ধন পাইয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, বসন্ত রায়, প্রতাপের এই কোষ্ঠীর ফলাফলের কথা, একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন, প্রতাপসম্বন্ধে ভাবিবার, তাঁহার যথেষ্ট হেতু আছে। বৃদ্ধের আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত হইল,—যেহেতু প্রতাপের পিতৃস্থানীয়ের মধ্যে তিনি এখন একক।—অন্তরে মধুসূদন নাম জপ করিতে করিতে বৃদ্ধ কাঁপিতে লাগিলেন।

পুত্রগণকে মুখে আর তিনি কিছু বলিলেন না; কিন্তু এখন হইতে তিনি প্রতাপকে মূর্ত্তিমান্ যমের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে বসন্তরায়ের পুত্রগণ, তলে তলে, প্রতাপের সহিত রীতিমত বাদ সাধিতে লাগিল। প্রতাপের নব-জামাতা রামচন্দ্র শ্বশুরালয়ে আসিলে, ইহারা তাহাকে নানা প্রকারে শ্বশুরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এবং প্রতাপ যে অতি স্বার্থপর ও নীচাশয়,—রামচন্দ্রের রাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্যই যে প্রতাপ তাহাকে কন্যাদান করিয়াছে,—এবং আবশ্যক হইলে যে, প্রতাপ রামচন্দ্রের প্রাণনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না,—এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া, তাহারা সেই তরুণবয়স্ক অব্যবস্থচিত্ত জামাতার মন ভাঙ্গাইতে প্রবৃত্ত হইল।

রামচন্দ্রের সহিত বহু লোক যশোহরে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে, দারুণ অসভ্য তাঁহার একজন ভাঁড়ও ছিল। জামাতার সহিত শ্বশুরের বিধিমতে মনোবিবাদ ঘটাইবার জন্য, বসন্ত রায়ের পুত্রগণ এক অতি ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা কৌশল করিয়া, সেই ভাঁড়কে স্ত্রীবেশ পরাইয়া প্রতাপের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিল। যথাসময়ে প্রতাপের কাণে

একথাও উঠিল। রাগের যথেষ্ট কারণ হইলেও, তখনও তিনি ক্ষমা করিলেন।

কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধিতা চরম মাত্রায় না উঠিলে, প্রায়ই নিবৃত্ত হয় না। হায়! এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। বসন্ত রায়ের পুত্রগণ যখন দেখিল, প্রতাপ কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না, তখন তাহারা প্রকাশ্যতঃ রামচন্দ্রকে হাত করিবার চেষ্টা পাইল। বালকবুদ্ধি রামচন্দ্রও সয়তানের ষড়যন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া, শ্বশুরের বিরুদ্ধাচরণে সম্মত হইলেন। তিনি প্রতাপের সহিত আত্মীয়তা ছিন্ন করিয়া,—স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছামতে রাজ্য পরিচালনের সঙ্কল্প করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে, শ্বশুরালয়ে বসিয়াই, অতি কড়া-কড়া কথায়, শ্বশুরের মুখের উপর তিনি এ কথা বলিলেন।—অধিকন্তু তৎক্ষণাৎ আপন লোকজন সমভিব্যাহারে, বসন্তরায়ের বাটীতে গিয়া উঠিলেন।

এখন, এই সেই কার্য্যটিতে, প্রতাপের হৃদয়ে দারুণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন,—"সহিষ্ণুতার সীমা আছে!—না, আর না,—খুল্লতাতকে এবং তাঁহার পুত্রগণকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। আমা অপেক্ষাও তাঁহারা রামচন্দ্রের হিতৈষী হইলেন?"

প্রতাপের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

আপাততঃ মনের এ ভাব গোপন করিয়া, সর্ব্বাগ্রে তিনি সেই অবমাননাকারী জামাতাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য, অতি দৃঢ়তার সহিত কঠোর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি আজিই রামচন্দ্রের ছিন্ন-মুণ্ড দেখিতে চাই!"

(বিন্দুর সেই মাসী এখন কোথায়?)

অমাত্যগণের মুখ শুকাইল,—প্রতাপের মুখের দিকে চাহিবার সাহসও কাহারও হইল না।

বিদ্যুদ্গতিতে এ সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। কুমার উদয়াদিত্য যোড়-হাতে, ছল ছল চক্ষে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"বালিকা বিন্দুর মুখ চাহিয়া এ যাত্রা রামচন্দ্রকে ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।"

প্রতাপ অতি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন। মুখ তুলিয়া পিতার সহিত পুনরায় কথা কহিবার সামর্থ্য কুমারের হইল না, ক্ষুণ্নমনে তিনি চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন,—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সহজে লঙ্ঘন হইবার নহে।

যাহা হউক, শেষ উদয়াদিত্য ও বসন্তরায় প্রভৃতির সাহায্যে, সেইদিন রজনীযোগেই, বহু দাঁড়ীর নৌকায় করিয়া, রামচন্দ্র যশোহর হইতে পলাইয়া, প্রাণে রক্ষা পান।

এখন হইতে প্রতাপের মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল,—"আমার খুল্লতাতই যত অনর্থের মূল। অনিবার্য্য জ্ঞাতিহিংসার হাত, তিনিও এড়াইতে পারেন নাই! এই জন্যই তিনি আমার উন্নতিতে এত কাতর। তাঁহার পুত্রগণও যে, তাঁহা অপেক্ষা অধিক হিংস্রক ও খল হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি! কি আশ্চর্য্য! সেই জরাজীর্ণ অশীতিপর বৃদ্ধ,—বাহিরে সদাই ঈশ্বরের নাম লইয়া, ধর্ম্মের এমন মধুমাখা কথা বলিয়া, অন্তরে এরূপ ভীষণ হলাহল পোষণ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে! অথবা মনুষ্য-প্রকৃতি চিরদিনই এইরূপ দুর্জ্জেয় ও গভীর রহস্যময়! পুত্রগণের সহিত এত রকমেও বাদ সাধিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না! শেষ কিনা, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি ধর্ম্মরাজ্যের একটা দিক্ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি,—খুল্লতাত আমার সেই জামাতাকে পর্য্যন্ত পর করিয়া দিলেন! উঃ! এই প্রাণঘাতী জ্বালা অপেক্ষা সর্পদংশন কি অধিক ক্লেশকর?"

এদিকে প্রতাপের মনে এই ভাব,—আর ওদিকে বসন্তরায়ের মনেও সদাই জাগিতেছে,—প্রতাপ কখন্ তাঁর রক্তদর্শনে লোলুপ হয়! এইরূপ,

পরস্পর পরস্পরকে বিষম সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অন্তরে, কেহ কাহাকে একটুকুও আস্থা করিতে পারিলেন না। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এই অনাস্থা,—এই সন্দেহ, একদিন যে মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিল, তাহা স্মরণ করিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হইলেও, কর্ত্তব্যের দায়ে, তাহা এই খানে লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

লোক-প্রিয় বসন্ত রায় প্রতিবর্ষেই মহা সমারোহে পিতার বার্ষিক-শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। প্রতাপের সহিত মনোমালিন্য ঘটিবার পর-বৎসরেও, তিনি যথারীতি পিতৃ-শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। মনে মনে যথেষ্ট বিরোধ বা ভয় থাকিলেও, লৌকিকতার খাতিরে, সামাজিক শিষ্টাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, এবারও তিনি প্রতাপাদিত্যকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতাপও, জ্ঞাতি-বিরোধিতার জন্য, অভিমানে স্ফীত না হইয়া, সাদরে ও সসম্ভ্রমে পিতৃব্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

যথাসময়ে তিনি অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, পিতৃব্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজ-পরিচ্ছদেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। পদ্মিনী ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে, প্রতাপ উত্তর দিয়াছিলেন,—"জ্ঞাতির বাটীতে হীনবেশে যাইতে নাই।"

কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণ ছিল,—প্রতাপ স্ত্রীকে তাহা ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। প্রতাপ মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন,—"কি জানি, পিতৃব্য ও তদীয় পুত্রগণের মনে কি আছে! হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, লোকে না পারে, এমন কাজই নাই। কি জানি, যদি আমাকে নিরস্ত্র দেখিয়া, সুযোগ বুঝিয়া তাহারা আমার প্রাণহননে উদ্যত হয়? অতএব আত্মরক্ষার জন্য, সঙ্গে একখানি তরবারি লওয়া কর্ত্তব্য। রাজ-বেশে গেলে আমার সকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে।"

এদিকে কিন্তু, বিধির বিধানে, ঘটনা ঘটিল অন্যরূপ। হায়, মানুষ ভাবে এক,—ভগবান্ করেন আর!

পিতৃব্য-গৃহে উপনীত হইলে, প্রতাপ যথেষ্ট সম্ভ্রম ও শিষ্টাচারের সহিত অভ্যর্থিত হইলেন। স্বয়ং বসন্তরায়, পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আদর-আপ্যায়িত করিলেন।

কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই সেই সদানন্দ বৃদ্ধের মুখকমল শুকাইয়া গেল, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, এবং অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ কে যেন আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিল,—"মন্দভাগ্য! আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিলে কেন? প্রতাপকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে কেন? দেখিতেছ না,—উহার কটিতটস্থ ঐ তীক্ষ্ণ তরবারি, তোমার রক্তদর্শনে লোলুপ হইয়া, কোষমধ্যে থাকিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিতেছে?"

যেমনি মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হওয়া, অমনি বৃদ্ধ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, প্রাণভয়ে বিকলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"কে আছ, শীঘ্র আমার 'গঙ্গাজল' লইয়া আইস!"

হায়! বৃদ্ধের অন্তিম আশা—"এই অস্ত্রে, তবুও যতক্ষণ আপনাকে রক্ষা করিতে পারি!"

ইহার ফলে ঘটনা ঘটিল কিন্তু অন্যরূপ।—পিতৃব্যের হঠাৎ এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া, প্রতাপও মনে মনে বিস্মিত হইলেন। কারণ তিনি জানিতেন, এই 'গঙ্গাজল' নামক অস্ত্র, পিতৃব্যের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। প্রতাপের মনেও 'কু' জাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমাকে দেখিয়া, পিতৃব্য সহসা সেই মহাস্ত্র আনয়নের আদেশ করেন কেন?"

বিস্মিত প্রতাপ আপনা আপনি কহিলেন,—"আমি এ কোথায় আসিলাম?"

পরে মনে মনে বলিলেন, "না, যখন মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আত্মরক্ষার্থ—ইহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।"

লিখিতে যত সময় গেল, ইহার সহস্রাধিক অংশেরও কম সময়ের মধ্যে

উভয়ের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল। তখন, চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে, মহাবল প্রতাপ, কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া, মূর্ত্তিমান্ যমের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই ভীষণ দৃশ্যে,—সেই সদাই প্রাণভয়ে ভীত,—প্রতাপ-ভয়ে-সশঙ্কিত বৃদ্ধ বসন্ত রায় আরও উচ্চৈঃস্বরে, আরও ভয়-ব্যাকুলিত কম্পিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"ওরে কে আছিস্ রে—শীঘ্র আয়,—শীঘ্র আমার গঙ্গাজল লইয়া আয়।"

বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ রায় অদূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া, মহা সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া, সেই শাণিত গঙ্গাজল অস্ত্র লইয়া, পিতার সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু প্রতাপের সেই ভীম-ভৈরব-রুদ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া, ভয়ে সে আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না,—প্রতাপের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, বজ্রবেগে সেইখান হইতেই সে, সেই মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিল!

কিন্তু,—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে!"—গোবিন্দের সে লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। মর্ম্মর-নির্ম্মিত গৃহতলে পড়িয়া, ঝম্ ঝম্ রবে সেই মহাস্ত্র বাজিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে সেই অস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া, ক্রোধ-প্রজ্বলিত প্রতাপ, এক লম্ফে, সিংহবিক্রমে, হুঙ্কারধ্বনি করিয়া, গোবিন্দরায়কে আক্রমণ করিলেন, এবং সেই অস্ত্রেই চক্ষের নিমেষে তাহাকে শমনসদনে পাঠাইলেন।

রক্ত-গঙ্গা বহিতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই নিদারুণ সংবাদে, বসন্তরায়ের অন্যান্য পুত্রগণ এবং তাঁহার পক্ষীয় লোকগণ, অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া, ত্বরিতগতিতে প্রতাপকে আক্রমণ করিতে আসিল।

বৃদ্ধ বসন্তরায়ের এ সময়কার অবস্থা বর্ণনাতীত। তিনি তখন একরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, উন্মত্তভাবে কেবলই চীৎকার করিতেছেন,—"ওরে, আমার গঙ্গাজল দে,—গঙ্গাজল দে!"

প্রতাপেরও তখন ধৈর্য্যরহিত অবস্থা। গোবিন্দের প্রাণসংহার করিয়া, সেই রক্তাক্ত অস্ত্রেই, তিনি জ্ঞাতিকুল নির্ম্মূল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। খুল্লতাতকে, তখনও "গঙ্গাজল দে—গঙ্গাজল দে" বলিতে শুনিয়া, প্রতাপ বিকৃতকণ্ঠে, ভীষণস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, আমার অসি অনেকক্ষণ আমি কোষবদ্ধ করিয়াছি,—এখন তোমার অস্ত্রে তোমাকে নিপাত করিয়া, তোমার বংশাবলীর অস্তিত্ব ঘুচাইয়া, আমার আপন পথ নিষ্কণ্টক করি! উঃ! কি গভীর ষড়যন্ত্র! কি বিষম বিশ্বাসঘাতকতা!—খুল্লতাত মহাশয়! অনেক সহিয়াছি,—আর না।"

প্রতাপের সেই বজ্রকঠিন-হস্ত-ধৃত, সেই শাণিত অস্ত্রের পূর্ণবেগ, স্থির হইবার পূর্ব্বেই, সেই শান্তিপ্রিয় সদানন্দ বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

চারিদিকে আবার 'হায় হায়' রব পড়িয়া গেল। সেই 'হায় হায়' রবের সঙ্গে সঙ্গেই, বসন্তরায়ের পুত্রগণ সশস্ত্রে প্রতাপকে বেষ্টন করিল। কিন্তু মত্ত মাতঙ্গকে, ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছে বাঁধিতে চেষ্টা পাওয়া, বিড়ম্বনামাত্র। ইহার ফলে হইল এই যে, প্রতাপ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই, সমগ্র জ্ঞাতিভ্রাতার প্রাণসংহার করিলেন।

বসন্ত রায়ের লোকগণ এ দৃশ্য দেখিয়া, প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। প্রতাপও নিরস্ত হইলেন।

এই প্রাণান্তকর সময়ে,—এই বিষম প্রলয়কালে, বসন্ত রায়ের দুর্ভাগ্যবতী পত্নী, কোলের ছেলে রাঘবকে লইয়া, অদূরস্থ কচুবনে লুক্কায়িত হন এবং তাহার প্রাণরক্ষা করেন। সেইজন্য এই বালক, কালে "কচু রায়" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

বসন্ত রায়ের সেই শ্মশান-পুরীতে বাস করিবার আর কেহ রহিল না। তাঁহার বিধবা পত্নী, স্বামীর সহমৃতা হইয়া, সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইলেন। বালক রাঘব প্রতাপের তত্ত্বাবধানে রহিল।

কালের অভিসম্পাৎ ফলিল,—প্রতাপের কোষ্ঠীর ফলাফল অতিমাত্রায় সার্থক হইল। লোকে দেখিয়া শুনিয়া, অবাক্ হইয়া, প্রতাপের পানে চাহিয়া রহিল।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড—সন্ধ্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ এখন সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইল। বঙ্গের স্থানে স্থানে মোগল-বাদসাহের যে সকল প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহারা প্রথম হইতেই প্রতাপের এই অভ্যুত্থান নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল বাঙ্গালীর বাহু যে, এত শক্তি ধারণ করিতে পারে,—শ্রমকাতর, অধ্যবসায়হীন, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর ক্ষীণ-হৃদয়ে যে, এত উচ্চ আশা ও উদ্দাম ভাব থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। যখন সুদূর গগনপ্রান্তে একখণ্ড মাত্র কালো মেঘ উঠিয়াছিল, তখন কে বুঝিয়াছিল যে, ঐ মেঘখণ্ড ক্রমে ক্রমে সমগ্র আকাশ ছাইয়া ফেলিবে এবং প্রবল ধারাপাতে মেদিনী ভাসাইবে! প্রতাপের এই বিপুল প্রতাপ এবং আত্মরক্ষার বিপুল আয়োজন দেখিয়া, মোগল রাজ-প্রতিনিধিগণ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে বসন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডের পর হইতে, কতকগুলি ব্যক্তি প্রতাপের প্রতি বড় বক্র হইল। দুইদিক না দেখিয়া, সবিশেষ বিচার না করিয়া, তাহারা প্রতাপকেই দোষী সাব্যস্ত করিতে লাগিল। বিশেষ, প্রতাপের এত বৃদ্ধি, তাহাদের ভাল লাগিল না। তীক্ষ্ণদর্শী প্রতাপ, লোকের এই মনোভাব সহজেই বুঝিতে পারিলেন। স্বজাতির চিত্তের এই লঘুতা দেখিয়া, তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

হায়, বাঙ্গালী-জীবন! হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা,—এই লইয়াই তুমি ভারতে আসিয়া থাকো! তুমি আজিও যা, সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও ছিলে তাই! আর পরেই বা যে কি হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন!

প্রতাপ পিতৃব্য-হত্যাকারী,—তা জানি; দোষও যে, ইহাতে তাঁহার কিছু হইয়াছিল, তাহাও মানি; কিন্তু আর-আর গুণের আলোচনা করিয়া,—যে, বিপুল সাহসে, অদম্য উৎসাহে, সাগরগর্ত্ত হইতে বিলুপ্ত রত্ন-উদ্ধারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল,—কৈ, আমরা ত সেই কর্ম্মবীর মহাপুরুষকে পূজা করিতে শিখিলাম না?

প্রতাপের গুরু তর্কপঞ্চাননের পরামর্শে স্থির হইল, কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর দেশ-বিদেশে প্রেরিত হউক। তাঁহারা নগরে নগরে ফিরিয়া সকলকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। তার পর, কাল পূর্ণ হইলে মোগলরাজ্য ধ্বংস করা যাইবে। বাগ্মীবর শঙ্কর এই অনুচরদলের নেতা হইলেন। তিনি কয়েকজন উৎসাহশীল, কার্য্যক্ষম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নানা উপদেশ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন নগরে পাঠাইলেন, এবং নিজেও এক দিকে বহির্গত হইলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে সূর্য্যকান্তের এক ভৃত্য আসিয়া, সূর্য্যকান্তকে এক অঙ্গুরীয় দেখাইয়া বলিল,—"আপনি যাঁহাকে ইহা দিয়াছিলেন, তিনি আপনার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই অঙ্গুরীয় আপনারই লইবার কথা আছে। যমুনা-তীরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

সূর্য্যকান্ত। তুমি তাঁহাকে কোথায় দেখিলে?

ভৃত্য। পথেই দেখিয়াছিলাম; কিন্তু সেখানে তিনি দাঁড়ান নাই।

সূর্য্যকান্ত বুঝিলেন, ফুলজানি তাঁহার সাক্ষাৎ-প্রার্থিনী হইয়াছে। তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল।

এদিকে ফুলজানি যমুনাতীরে দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল।

যমুনার জল তখন বড় শান্ত ও স্থির। তাহার বক্ষে তখন একটি মৃদুহিল্লোলও ছিল না। সেই স্থির জলের উপর জ্যোৎস্নাপরিপ্লুত নীল আকাশের ছায়া প্রতিভাত হইয়াছিল। যমুনাসৈকতে মধুর জ্যোৎস্না-ধারা চারিদিক মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। তীর-শোভী বৃক্ষবল্লরী নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছিল। ফুলজানি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পথপানে চাহিয়া রহিল, সূর্য্যকান্ত তথাপি আসিলেন না।—"তবে কি তিনি সংবাদ পান নাই?"—এই ভাবনার সহিত, ফুলজানির কোমল বুকটি ঈষৎ কম্পিত হইল।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফুল ভাবিতে লাগিল,—

"যদি তিনি সংবাদ না পাইয়া থাকেন? কিংবা সংবাদ পাইয়াও যদি না আসিতে চান?—কেনই বা আসিবেন? কে আমি? তাঁহার চরণের কণ্টক-স্বরূপ,—কে আমি? আমার জন্য তিনি যাহা করিয়া-ছেন, তাহাই যথেষ্ট। তবু মন বুঝে না। এই সেই যমুনাসৈকত, এই সেই মধু-যামিনী; এমনই মধুর জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, এই স্থানেই, সেই দেখিয়াছিলাম,—হায়, সে আজ কতদিন! সাধ করিয়াই ত দেখা করি নাই! আমার বল কতটুকু!—আমি এই ক্ষীণপ্রাণ লইয়া জননী-জন্মভূমির কথা ভাবি,—ভাবিতে ভাবিতে সব ভুলিয়া যাই! কিন্তু পরক্ষণেই আবার এই ক্ষীণ-স্রোতা নদীতে যখন প্রেম-বন্যা বহিয়া যায়,—তখন মনে হয়, সব যাক্,—সূর্য্যকান্তকে একবার মুক্তকণ্ঠে বলি,—"প্রাণেশ্বর! তুমি আমার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হও,—আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার রূপসুধা পান করি!"—কৈ, মা জন্মভূমি! সমস্ত প্রাণ ত তোমায় দিতে পারি নাই! তাই দূরে দূরে থাকি,—প্রাণ ফাটিয়া যায়, তবু দেখি না;—পাছে আমা হইতে তোমার পুত্ররত্নের কোনরূপ

লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে! তিনি মহাপুরুষ, এই মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন,—আমি কে যে, তাঁহার চরণে স্থান পাইব? কিন্তু মা, আজি ত শেষ দিন! আজি ত বিদায় লইয়া যাইব!—কোথায় যাইব? এই যশোহর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইতেও আমার সাধ যায় না!—না, তবু যাইব। এই মহাব্রত আমিও গ্রহণ করিয়াছি। বাহুতে বল নাই থাক্, হৃদয়ে সাহস আছে। এই সাহসে, দেখি মা, কি করিতে পারি! যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা করিব। তবেই আমি তাঁহার যোগ্যা! মাগো! আমার আশা কি পূরিবে না?"—

সহসা সেই নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, মাথার উপরে এক নিশাচর পক্ষী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফুলজানি শিহরিল।

তখন যুক্তকরে, সেই বিষাদিনী আকাশপানে তাকাইল। পরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে তাহার সেই ম্লান মুখমণ্ডল, সজল নয়নযুগল,—অতি দূর হইতেও দেখা যাইতেছিল। সে তাহার মর্ম্মকাতরতায়, কত কি আকুল উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেছিল,—যমুনা নীরবে তাহা শুনিতে লাগিল।

সেই সময় সূর্য্যকান্ত দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে,—বিস্ময়, স্নেহ ও করুণায়, তিনি দ্রবীভূত হইলেন। সেই মূর্ত্তিমতী করুণাকে দেখিয়া, বীরের বীর-হৃদয় ক্ষণ কালের জন্য গলিয়া গেল। কিন্তু তথাপি তাঁহার সেই ধ্রুবলক্ষ্যের এতটুকুও ব্যতিক্রম হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ফুলজানি যখন দেখিল, সূর্য্যকান্ত তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অবনতমুখী হইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল,—

"আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি আপনার দর্শনের অভিলাষিণী হইয়া, বোধ করি আপনার বিরক্তির কারণ হইলাম।"

সূর্য্যকান্ত এখনও যেন, চক্ষে সেই মূর্ত্তিমতী করুণা দেখিতেছিলেন। তিনি নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ফুলজানি পুনরায় এই কথা বলিলে, সূর্য্যকান্ত একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া, কি বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু সে ভাব সাম্‌লাইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছ?"

ফুলজানি। আমি শীঘ্রই যশোহর ত্যাগ করিয়া যাইব, সেই কথা বলিবার জন্যই আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছি।

সূর্য্যকান্ত। তুমি কোথায় যাইবে—কেন যাইবে?

ফুলজানি প্রথমে সে কথার উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে বলিল,—"আমি এপর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া, আপনাদের মহৎ অভিপ্রায় সমস্তই অবগত হইয়াছি। আমার মনে হয়, হিন্দুর এই সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে।—আপনার অনুগ্রহে এখানে আমি যথেষ্ট সুখে ছিলাম, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আর এক উচ্চ সুখের আশা আমার হৃদয়ে জাগিয়াছে,—তাহারই জন্য আমি যশোহর ত্যাগ করিতেছি।"

সূর্য্যকান্ত। মা-ভবানী তোমার সেই শুভ আশা পূর্ণ করুন।

এবার ফুলজানি সজল নয়নে বলিল,—"আপনার আশীর্ব্বাদ যেন সফল হয়। হয়ত এ জীবনে আপনাকে আর দেখিতে পাইব না,—হয়ত এই শেষ দেখা! কিংবা, খুব পুণ্যবল থাকিলে, হয়ত আবার দেখা হইবে ——কিন্তু সে আশা করিতে এখন আর আমার সাহস হয় না। বীরবর! যে মহাব্রতে আপনারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এই দুঃখিনী রমণীও সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গের রমণী,—যে কখন গৃহ-প্রাঙ্গণের সীমা অতিক্রম করে নাই,—তাহার এ কি দুরাকাঙ্ক্ষা! কিন্তু দেব!——"

ফুলজানি এই অবধি বলিয়া, সজল নয়নে ভূমিপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, মুখ তুলিয়া আবার বলিল,——

"কিন্তু দেব! এই বুকের ভিতর দিবানিশি যে আগুন জ্বলিতেছে, তাহা যদি বুঝাইতে পারিতাম, তবে আপনি জানিতে পারিতেন,—এই ব্রত গ্রহণে আমার কি আনন্দ!"

সূর্য্যকান্ত বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ফুলজানি বলিতে লাগিল,—

"ব্রত উদযাপন করিয়া আমি আবার এখানে ফিরিব। যদি এ দুঃখি-নীকে মনে রাখেন, তবে আপনার দত্ত এই সঙ্কেত-অঙ্গুরী দেখাইয়া, এই যমুনাতীরে, আবার আপনাকে দেখিতে পাইব।—নহিলে এই শেষ!"

আবার সেই কালপক্ষী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল।

সূর্য্যকান্ত। ফুলজানি! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।—তুমি কি যথার্থই আমাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছ?

ফুলজানি। আপনাদের এই উচ্চ সম্মান মোগল যে উপেক্ষা করিবে, তাহা মনে হয় না। অনেকদিন পর আবার হিন্দু-মুসলমানে সমরানল প্রজ্বলিত হইবে।—আপনারা এখন তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন।

সূর্য্যকান্ত। এ কথা সত্য।—কিন্তু তোমার ব্রত কি?

ফুলজানি। বীরবর! আমি অসহায়া অবলা রমণী,—কিন্তু আমার ব্রত অতি কঠোর ও দুঃসাধ্য!

সূর্য্যকান্ত। এমন ব্রত কেন গ্রহণ করিয়াছ?

ফুলজানি মুখখানি অবনত করিল। সেই ডাগর চক্ষু হইতে বড় বড় দুই চারি ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। ফুল বলিল,—

"বীরবর! আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই বলিলাম,—নহিলে এ কথা কেহ শুনিতে পাইত কিনা সন্দেহ।——শুনিয়া, হাসিবেন কিনা জানি না,—আমি অপরিণীতা হইয়াও, পতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি! ভার্য্যা পতির ধর্ম্মের সহায়। আমার যিনি পতি হইবেন, তিনি বীর-ধর্ম্মে দীক্ষিত! তাই আমি আপনা হইতে, স্বেচ্ছায় সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি!"

দুই জনেই নীরব। মাথার উপর সেই সুনীল আকাশ,—পদপ্রান্তে সেই স্থিরযমুনা,—পার্শ্বে সেই নীরব বনস্থলী।

সূর্য্যকান্ত করুণাপূর্ণ স্নেহদৃষ্টিতে ফুলজানির সেই পবিত্র মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"কে এ বালিকা? এ কি ছদ্মবেশিনী কোন দেব-বালা,—আমায় পরীক্ষা করিতেছেন? অগ্রে ব্রত উদ্‌যাপন করি,—তারপর?—অগ্রে ব্রত উদ্‌যাপন করি! হায়! এ স্বর্গের পারিজাত সংসারে কেন? ফুল——"

দূরে কে বাঁশী বাজাইল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই বাঁশীর আহ্বান কি মধুর! উভয়ের দেহ কণ্টকিত হইল! নীরবে উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু নামাইলেন।

সূর্য্যকান্ত। ফুলজানি! যদি জগদীশ্বর দিন দেন, আবার দেখা হইবে। আপাতত বিদায়।

ফুলজানি। বিদায়।—দুঃখিনাকে মনে রাখিবেন?

সূর্য্যকান্ত। দুঃখিনী বঙ্গভূমিরূপে—দেবীমূর্ত্তিতে তুমি এ হৃদয়ে স্থান পাইয়াছ!

ফুলজানির দেহ আবার কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

সূর্য্যকান্ত চিন্তাকুলিত মনে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফুলজানি একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল,—তখন সূর্য্যকান্ত দৃষ্টির অতীত হইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতাপের হস্তে বসন্তরায়, পুত্রগণসহ নিধন প্রাপ্ত হইবার কিছুদিন পরে, বসন্তরায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী পরামর্শ করিল যে, "যেরূপে হউক, প্রতাপের এই নিষ্ঠুর কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে হইবে। আর কিছু না হউক,—প্রতাপকে আর অধিক বাড়িতে দেওয়া হইবে না। অন্ততঃ, প্রভুর অবশিষ্ট একমাত্র পুত্র—বালক রাঘবকে প্রতাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। রাঘবকে কোনরকমে হস্তগত করিতে পারিলে, একদিন-না-একদিন প্রতাপ ইহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিবে।"

বসন্ত রায়ের এই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে রূপরাম বসু অগ্রণী। রূপরাম গিয়া হিজলিকাঁথির প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারী ইশাখাঁ মচ্ছদরীর শরণাপন্ন হইল। বলিল,—

"জাঁহাপনা! আপনাকে ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে। মহারাজ বসন্তরায় আপনার পরম সুহৃৎ ও বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন। সেই মহারাজ বিনাদোষে, একরূপ সবংশে, অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রতাপাদিত্যের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনি যদি ইহার সমুচিত প্রতিফল না দেন, তাহা হইলে আমরা আর কাহার কাছে স্বর্গীয় প্রভুর শক্রদমনের আশা করিব? বিশেষ, মহারাজের সেই অবশিষ্ট একমাত্র পুত্র—বালক রাঘব, নৃশংস প্রতাপাদিত্যের করাল কবলে পতিত;—সেই বালকের পরিণামই বা কি হইবে, তাহাও আপনার ভাবিবার বিষয়।"

রূপরাম এইরূপে বিধিমতে প্রতাপের বিরুদ্ধে ইশাখাঁকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ইশাখাঁ বসন্তরায়ের একজন সুহৃৎ বটেন। বহুকাল হইতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব ছিল। সরলহৃদয় বসন্ত রায়, বন্ধুকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিবার জন্য, এক সময়ে ইশাখাঁর সহিত আপন শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিয়াছিলেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা চলিয়া আসিয়াছে।

প্রভুভক্ত সুচতুর রূপরাম, তাই সময় বুঝিয়া, প্রভু-বন্ধুর শরণাপন্ন হইল, এবং প্রতাপের হস্ত হইতে প্রভু-পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য, অতি নির্ব্বন্ধসহকারে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল।

ধীরবুদ্ধি ইশাখাঁ কোনমতেই রূপরামের মনস্কাম পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইতে পারিলেন না। তিনি ধীরভাবে বলিলেন,—

"দেখ, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ প্রতাপাদিত্যের সহিত সহসা বিরোধ করিতে যাওয়া, কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সুবা-বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত রাজা ও ভূস্বামী এখন তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হন। সুতরাং এখন তাঁহার বল, বুদ্ধি, সহায়, সম্পদ যথেষ্ট। স্বয়ং ভারত-সম্রাটের প্রতিকূলাচরণ করিয়াও, তিনি এখন অকুতোভয়। এমন অবস্থায় তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাওয়া, আর নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনা, সমান কথা।"

হিজলীপতির এ কথায় রূপরাম আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না,—হতাশ নয়নে অমাত্যগণের পানে চাহিয়া রহিল।

বলবন্ত নামে ইশাখাঁর প্রধান সেনাপতি সেখানে উপস্থিত ছিল। বলবন্ত নির্ভীক, অসমসাহসী ও প্রবল পরাক্রান্ত। শত্রুহস্ত হইতে প্রভুর বন্ধু-পুত্রকে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, করযোড়ে—দৃঢ়তা সহকারে বলবন্ত বলিল,—

"জাঁহাপনা, আপনি আদেশ করিলে, এ দাস সেই শত্রু-পুরী হইতে, মহারাজ বসন্তরায়ের পুত্র বালক রাঘবকে অনায়াসে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারে।"

ইশাখাঁ বিস্মিত হইলেন, সভাস্থ আর-আর সকলেও বিস্মিত হইল। বলবন্ত, পুনরায় সদর্পে কহিল,—"হুজুর! যদি গোলামের গোস্তাকি হয়, সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন!"

ইশাখাঁ, বলবন্তের এরূপ নির্ভীকতা ও সাহস দেখিয়া, মনে মনে বলবন্তকে ধন্যবাদ করিলেন। কহিলেন,—"বীর! বুঝিলাম, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই, তুমি কি পরিমাণ সৈন্য লইয়া, প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে প্রস্তুত আছ?—প্রতাপাদিত্যের সৈন্য-সংখ্যা কত, জান ত?"

বলবন্ত যোড়করে, অবনতমস্তকে উত্তর করিল,—"আজ্ঞা না জাঁহাপনা!—দাস সে ধৃষ্টতার কথা মুখে আনিতেও সাহসী নহে। দাসের অভিপ্রায় এই,—আপনি অনুমতি করিলে দাস কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিতে সক্ষম হয়।"

ইশাখাঁ সবিশেষ খুলিয়া বলিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বলবন্ত বলিল, "জাঁহাপনা! প্রতাপাদিত্যের অন্য সহস্র দোষ থাকিলেও, শুনিয়াছি, তিনি বড়ই সত্যবাদী। সত্যরক্ষার জন্য তিনি নাকি সকলই করিয়া থাকেন। তাই আমি মানস করিয়াছি,—'কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে' বলিয়া, আমি নিভৃতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; এবং সেই অবসরে হঠাৎ তাঁহাকে এমনিভাবে আক্রমণ করিব যে, সে সময় তাঁহার জীবনমরণ সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিবে। সেই সুযোগে আমি প্রতাপাদিত্যকে এই ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিব যে, হয়—বালক রাঘবকে বিনা বিঘ্নে আমার

হস্তে অর্পণ করুন,—নয়, এই মুহূর্ত্তেই আমার হস্তে জীবলীলা শেষ করুন।”

ইশাখাঁ বলবন্তের সাহস ও কূট-বুদ্ধির সুদূরগামিতা দেখিয়া, প্রথমতঃ শিহরিলেন। কিন্তু হিজিলীপতির মাথায় নাকি তখন মূর্ত্তিমান্ শনি আশ্রয় লইয়াছে, তাই তিনি পরিণাম-চিন্তায় আর বড় বেশী মনোযোগী হইলেন না ;—কেবল এইমাত্র বলিলেন, “তারপর ?”

এবার বলবন্ত বুক ফুলাইয়া উত্তর করিল,—

“তারপর আর কি জাঁহাপনা !—তারপর এ দাস নির্ব্বিঘ্নে বালক রাঘবকে আনিয়া আপনার হস্তে অর্পণ করিবে।—সত্যবাদী প্রতাপাদিত্যকে অবশ্য এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইব যে, যে পর্য্যন্ত না আমি সম্পূর্ণ নিরাপদে হিজিলী পঁহুছিতে পারি, সে পর্য্যন্ত তিনি আমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।”

রূপরাম এ সময়ে বিধিমতে বলবন্তের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল, এবং মৃত প্রভুর গুণগান করিয়া, প্রভুবন্ধুকে বিশেষরূপে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।—ইশাখাঁ বলবন্তের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে বলবন্ত দ্রুতগামী জলযানে আরোহণ করিয়া যশোহর পঁহুছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিশেষ সমাদরে ও সম্মান সহকারে, খুল্লতাত-বন্ধুর সেনাপতিকে অতিথি করিলেন। যথারীতি শিষ্টাচার ও কুশল প্রশ্নাদির পর দুষ্টবুদ্ধি বলবন্ত কহিল,—

“মহারাজ ! আমি প্রভুর কোন বিশেষ গোপনীয় বিষয়ের পরামর্শ জানিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রে সেই সৎ পরামর্শ দিয়া অধীনের উৎকণ্ঠা দূর করুন।”

কার্য্যকুশল প্রতাপ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিভৃত মন্ত্রণাগারে বলবন্তকে লইয়া গেলেন। বলবন্ত হিজিলীর শাসন-প্রণালীর দুই এক কথা

বলিয়াই, হঠাৎ প্রতাপাদিত্যকে অতি সাংঘাতিকরূপে আক্রমণ করিল। এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে তরবারির অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল,—

"মহারাজ! আমি কৃতঘ্ন হই,—বিশ্বাসঘাতক হই,—মহাপাপী হই,—সে বিচার পরের কথা,—কিন্তু উপস্থিত আপনার জীবন-মরণ আমার হস্তে! বলুন,—ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া সত্যবদ্ধ হউন,—আমি যা চাই তা দিয়া, মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়া, আমাকে ছাড়িয়া দিবেন?—তাহা হইলে আমি আপনার প্রাণবধে নিরস্ত হই;—নচেৎ এখনি আমাকে নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয়!"

বলবন্ত প্রতাপের বক্ষোপরি উপবিষ্ট। এবার এক হস্তে প্রতাপের গলা চাপিয়া, অন্য হস্তে তরবারি খানি রীতিমত বাগাইয়া ধরিল।

প্রতাপ তখন সম্পূর্ণ নিরুপায়। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়, অতি বে-কায়দায়, তিনি শত্রুর করতলগত। প্রতাপ মনে মনে বলবন্তের প্রশংসা করিলেন,—"আমার ঠিক্‌ই শিক্ষা হইয়াছে! কূটরাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া, রাজবুদ্ধি ধরিয়া, আমার এই সহজ জ্ঞানটুকু হইল না যে,—এই লোকটাকে হঠাৎ এতটা বিশ্বাস করিয়া, আত্মরক্ষার কোন উপায় ঠিক না রাখিয়া, ইহাকে আপন মন্ত্রণাগারে আনা উচিত নয়? এ ব্যক্তি মহাপাপী ও ঘোর বিশ্বাসঘাতক হইলেও,—ইহার সাহস, নির্ভীকতা ও কূটবুদ্ধি আমার শিক্ষার বিষয়।"

মহানুভব প্রতাপ বলবন্তের নিকট সত্যবদ্ধ হইলেন। তখন বলবন্ত বলিল,—"মহারাজ! মৃত বসন্তরায়ের পুত্র বালক রাঘবকে আমার হস্তে দিতে হইবে। আর যে পর্য্যন্ত না আমি নিরাপদে হিজলী উপনীত হই, সে পর্য্যন্ত আপনি আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।"

নিরুপায় প্রতাপ, বলবন্তের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলবন্তও তখন তাঁহার বক্ষঃ হইতে উঠিয়া, সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সত্যবদ্ধ প্রতাপ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ রাঘবকে বলবন্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন; এবং বলবন্তকে বিশিষ্টরূপ পুরস্কারাদি দিয়া বিদায় দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু পদদলিত অজগর,—আততায়ীকে দংশন না করিয়া, কোন-ক্রমেই স্থির থাকিতে পারে না। প্রতাপ যথাসময়ে শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতিকে বলবন্তের এই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটাচরণের কথা জ্ঞাপন করিলেন। কহিলেন,—"এখন সেই মহাপাপীর প্রায়শ্চিত্তের কাল উপস্থিত হইয়াছে। এতদিনে দুর্ব্বৃত্ত হিজলী পঁহুছিয়াছে,—আমারও সত্যরক্ষা হইয়াছে,—এইবার পাপিষ্ঠ তাহার পিশাচ-প্রভুর সহিত সমুচিত প্রতিফল ভোগ করুক। বুঝিলাম, সুবা-বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত হয়,—ইহা মা-যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা। তা মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তোমরা সকলে প্রস্তুত হও।—এবার নররক্তে হিজলীকাঁথি প্লাবিত হইবে।"

এদিকে বলবন্ত হিজলী পঁহুছিয়া, রাঘব ওরফে কচু রায়কে ইশাখাঁর হস্তে অর্পণ করিল। ইহাতে বসন্ত রায়ের কর্ম্মচারী রূপরাম প্রভৃতির আনন্দের আর সীমা রহিল না। ইশাখাঁও সেনাপতির এই কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কহিলেন, "বীর! এখন আর আমাদের ক্ষণমাত্র নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রতাপাদিত্য যে, নীরবে এ অপমান সহ্য করিবেন, ইহা অসম্ভব। অতএব, আমাদিগকে এখন হইতেই বিশেষরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইতেছে। তুমি সৈন্যগণকে বিশেষরূপে উত্তেজিত কর,—'প্রাণ থাকিতে বিধর্ম্মী কাফেরের শরণাগত হইব না।' যুদ্ধের আর আর যাহা প্রয়োজন, তাহাও অদ্য হইতে সংগ্রহ করিতে থাকো।"

দুই দলেই যুদ্ধের মহা আয়োজন হইতে লাগিল। হিজলীর দুর্গ সকল অধিকতর পরিমাণে দুর্গম করা হইল। ইশাখাঁ বহুল পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। আর এদিকে মহাবল প্রতাপ,—শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, রডা, রঘু, মদন, সুন্দর প্রভৃতি সেনাপতিকে মাতাইয়া, বিপুল বাহিনী সঙ্গে লইয়া,—গোলা, গুলি, কামান, বন্দুক, তরবারি, তীরধনু প্রভৃতি পোত-মধ্যস্থ করিয়া, অদম্য উৎসাহে শত্রুদমনে বহির্গত হইলেন। যুদ্ধ-গমনকালে তিনি ভক্তিভরে যশোরেশ্বরীকে পূজা করিলেন। ভাবগদগদ-কণ্ঠে কহিলেন, "মাগো! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও।"

অনুকূল বায়ুভরে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে, প্রতাপ সসৈন্যে হিজলীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। জলপথে স্থলপথে—দুই দিক হইতে হিজলী অবরোধ করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া, তিনি সৈন্যগণকে, উপস্থিত দুই দলে বিভক্ত করিলেন। জলপথের অধিনায়ক রহিলেন—দুর্দ্ধর্ষ ফিরিঙ্গি রডা; আর স্থলপথের অধিনায়ক হইলেন,—উৎসাহশীল, রণ-কুশল সূর্য্যকান্ত। সর্ব্বপ্রথম রডা শত্রুপক্ষকে চমকিত করিবার জন্য ভীমনাদে এক তোপ দাগিলেন। চারিদিক কাঁপাইয়া তোপ গর্জ্জিল,—গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুম্। রডা আবার তোপ দাগিলেন; শব্দ হইল,—গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুম্। আবার তোপ, পুনরায় তোপ,—সে ভীষণ গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে হিজলী কাঁপিয়া উঠিল। ইশাখাঁ বুঝিলেন,—শত্রু দ্বারে আসিয়াছে।

নবোদ্যমে—বিপুল উৎসাহে, বলবন্তও সেই শব্দের প্রতিশব্দ করিবার জন্য তোপ দাগিল,—গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুম্। এখন সেই অশ্রান্ত গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ শব্দে হিজলীবাসী ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল। সকলেই মনে মনে মহা প্রমাদ গণিল। কোলের শিশু মায়ের কোলে থাকিয়া, মায়ের বক্ষঃস্থল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিল। গর্ভিণীর গর্ভপাত

হইবার উপক্রম হইল। ধূমে ধূমে চারিদিক্ ধূমাকার হইয়া উঠিল। আকাশ ও ভূমি সহজে চিনিবার যো রহিল না।

এদিকে সূর্য্যকান্ত স্থলপথ দিয়া সিংহবিক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত সেনা তাঁহার সহিত যোগ দিল। বিপক্ষপক্ষও মরণ-ভয় তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বলবন্তের অধীনে আরও কয়েক জন সেনানায়ক ছিল। তাহারা সুবিধামত— কখন জলপথে, কখন স্থলপথে প্রতাপসৈন্যের গতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু প্রতিপদেই তাহারা পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। ইশাখাঁ বুঝিলেন, গতিক ভাল নহে,—তিনি আপন গ্রহ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছেন।

কিন্তু ভাবিবার আর অবসর নাই। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্ঝনি, বন্দুক ও কামানের ভীষণ গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে কর্ণ বধির প্রায় হইয়া উঠিল। ধূমে ও ধূলিতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল।

একাদিক্রমে এইরূপে কয়েক দিবসব্যাপী মহা সংগ্রাম চলিল। নর-রক্তে বসুন্ধরা প্লাবিত হইল। ইশাখাঁর প্রায় সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল। শেষ দিন ইশাখাঁ স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বলবন্তও এদিন অমিততেজে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে প্রতাপ-পক্ষ হইতে এক ভীষণ গোলা আসিয়া ইশাখাঁর বক্ষে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইলেন।

হিজলীপতির পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সহিত বলবন্তেরও সকল আশা-ভরসা ফুরাইল। এবার মহাবল প্রতাপ স্বয়ং ভৈরব বিক্রমে, বলবন্তকে আক্রমণ করিলেন, এবং চক্ষের নিমেষে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, তাহার সেই ঘোর অধর্ম্মাচরণের সমুচিত প্রতিফল দিলেন।

এইরূপে হিজলী,—প্রতাপাদিত্যের করায়ত্ত হইল। হিজলী করায়ত্ত হইবার পরই, প্রতাপ সর্ব্বাগ্রে কচুরায়কে হস্তগত করিবার চেষ্টা পাইলেন। চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কিন্তু বাঙ্গালা মুলুকে ত তাহার সন্ধান মিলিবে না;—রূপরাম ইতিপূর্ব্বেই বেগতিক দেখিয়া,—ইশাখাঁর পতনের আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া, কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া, ভারত-সম্রাটের শরণাপন্ন হইবার আশায় গিয়াছে।

প্রতাপ এ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু চিন্তিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—

"এত করিয়াও সেই ক্ষুদ্র গৃহশত্রুকে হস্তগত করিতে পারিলাম না! বুঝি বা, কালে এই ক্ষুদ্র কীট,—ভীষণ সর্পস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে দংশন করিবে বলিয়া, কেবলই আমার শত্রুর শরণাপন্ন হইতেছে! অথবা বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে?"

তখন প্রতাপ হিজলী শাসনের জন্য দুই জন বিশ্বস্ত হিন্দু কর্ম্মচারীকে তথায় নিযুক্ত করিয়া,—হিজলীর সমস্ত ধন-রত্নাদি সঙ্গে লইয়া, বিজয়ী-সেনা সমভিব্যাহারে, যশোহরে উপনীত হইলেন। এবং সর্ব্বাগ্রে ষোড়শোপচারে, মহাসমারোহে, যশোরেশ্বরীকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুরের দুই জন হিন্দু রাজা, —কেদার রায় ও চাঁদ রায় নামে দুই ভ্রাতা, প্রতাপের সখ্য-সূত্র ছিন্ন করিয়া, স্বাধীনভাবে আপনাদের রাজ্যশাসনে সচেষ্ট হন। চারি-চক্ষু প্রতাপ ইহার প্রতিবিধানার্থ, অবিলম্বে কিছু সৈন্য লইয়া, বিক্রমপুরে উপস্থিত হইলেন এবং উপর্য্যুপরি কয়েকটা ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করিয়া, হুঙ্কার রবে 'মার্ মার্—কাট্ কাট্' করিবামাত্র, কেদার রায় ও চাঁদ রায় ভীত-কম্পিত-কলেবরে আসিয়া, প্রতাপের চরণে আপন আপন অসি অর্পণ করিল। প্রতাপ এই শরণাগত ভ্রাতৃদ্বয়কে এ যাত্রা

ক্ষমা করিলেন,—এবং "আর কখন এমন কাজ করিব না,—এখন হইতে সর্ব্ব সময়েই আপনার আদেশ-মত চলিব"—এই মর্ম্মে তাঁহাদের নিকট হইতে এক প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখাইয়া, যশোহরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর প্রতাপের বিশেষ লক্ষ্য হইল,—পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে দমন করা। কারণ ইহার উপদ্রবে সে সময় বঙ্গোপসাগর উপকূল প্রদেশস্থ অধিবাসিগণ তিষ্ঠিতে পারিত না। গৃহস্থের সুখশান্তি হরণ করা ইহাদের দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। পাপিষ্ঠেরা কখন কখন মায়ের কোল হইতে বালক বালিকাগণকে কাড়িয়া লইয়া, দেশদেশান্তরে 'ক্রীতদাস' রূপে বিক্রয় করিত। প্রতাপ দেখিলেন, যেরূপে যেমন করিয়া হউক, এই পাপ দূর করিতে না পারিলে, তাঁহার দেশ স্বাধীন করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। এজন্য তিনি আরাকানাধিপতি মগরাজের সহিত সন্ধি করিলেন। উভয়ের মধ্যে এইরূপ সর্ত্ত হইল যে, মগরাজ বাঙ্গালা মুলুকের, এবং বঙ্গাধিপও মগরাজের কখন কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না,—অথচ উভয়ে সাধ্যানুসারে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে দমন করিবেন।

এই সন্ধির গুণে প্রতাপের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল,—পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ চিরদিনের জন্য বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, আপামর সাধারণের উৎকণ্ঠা ও অশান্তি দূর করিল।

এইরূপ দিন দিন প্রতাপের ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তৃত হইতে লাগিল। সম্রাট আকবর, বঙ্গীয় বীরের এই অভূতপূর্ব্ব অভ্যুত্থান দেখিয়া মনে মনে চমৎকৃত হইলেন। বুঝিলেন, প্রতিভা আপন পথ আপনি প্রস্তুত করিয়া লইয়া থাকে,—প্রকৃত প্রতিভার পথে ভগবান্ সহায় হন।

শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি প্রতাপের প্রধান সহচরগণ এ সময় মনের উল্লাসে, পূর্ণ উৎসাহে স্বদেশরক্ষায় ব্রতী হইলেন। কারণ, তাঁহারা

জানিতেন, শীঘ্রই হউক আর কিঞ্চিৎ বিলম্বেই হউক, মোগল-সম্রাট, বঙ্গীয় বীরের এ চরম সৌভাগ্য কিছুতেই সহিতে পারিবেন না, এবং তৎপ্রতিকারার্থ নিশ্চয়ই তিনি যুদ্ধঘোষণা করিবেন। তখন?—তখন "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা" অপেক্ষা, পূর্ব্ব হইতে পথ পরিষ্কার রাখাই প্রশস্ত। তীক্ষ্ণদর্শী শঙ্কর বুঝিলেন, সহস্র সহস্র গুলি, গোলা, বন্দুক তরবারিতে যাহা না হয়,—সম্পূর্ণরূপে লোকের হৃদয়ের উপর প্রভুতা স্থাপন করিতে পারিলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ফল হইয়া থাকে। তাই বাগ্মীবর শঙ্কর ভারতের নানা স্থানে বেড়াইয়া, তেজোদীপ্ত করুণ-কণ্ঠে, মোগল বিরুদ্ধে সকলকে মাতাইতে লাগিলেন। এই বক্তৃতাগুণে ত্রিহুত প্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িল। স্বদেশ-প্রেমিক শঙ্কর বুঝিলেন, আপনার ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া, প্রাণ খুলিয়া, সর্ব্ব সহানুভূতিপূর্ণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসগুলি ব্যক্ত করিতে পারিলে, তাহা নিষ্ফল হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শঙ্কর চারিজন সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বঙ্গের নানা স্থানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, স্বদেশবাসীকে মোগলবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবেন, এবং পরস্পর হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া, দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য সকলকে পরামর্শ দিবেন।

সেই চারিজনের সহিত আর একজন তরুণবয়স্ক যুবা আসিয়া যোগ দিল। তাহার আকৃতি যেমন মধুর, তাহার বাক্যগুলিও সেইরূপ মধুর। তেমন মধুর আকৃতিতে তেমন মধুর মর্ম্মস্পর্শী বাক্যের সংযোগ,—সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিল।

এই নবাগত যুবকের পরিচয় কেহ জানিত না। তিনি আপনাকে জনৈক স্বদেশভক্ত বঙ্গীয় গৃহস্থের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, আপনারা বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সকলকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। আমাদের জাতির কলঙ্ক এই যে, আমরা কেহ কাহারও সহিত মিশিতে পারি না, এবং কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহি না। ঈশ্বর না করুন,—যখন বিপুল মোগলবাহিনী এই যশোহর নগর অবরোধ করিয়া যমুনার উভয় তটে শিবির সংস্থাপিত করিবে,—তখন কে বলিতে পারে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিশান-তলে দাঁড়াইয়া, সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার ইঙ্গিতে চলিবে? সেই জন্যই পূর্ব্ব হইতেই এই বিষয়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।"

শঙ্করের অনুচরগণ সেই যুবকের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহার সেই মহত্ত্বব্যঞ্জক মধুরমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলেন, ইনি নিশ্চয়ই

কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় হইবেন। তাঁহারা সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন,——

"আপনি আমাদের অপেক্ষা বয়োঃকনিষ্ঠ ; দেখিয়া বোধ হয়, সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। এই বয়সেই আপনার এমন স্বদেশানুরাগ এবং এমন মহৎ ব্রতগ্রহণ,—নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গলের কারণ হইবে। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন, এবং আপনার নাম কি,—জানিতে পারিলে সুখী হই।"

যুবক। আমি সপ্তগ্রাম হইতে আসিতেছি। আমাকে অল্পবয়স্ক যুবক বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। মোগলের অত্যাচারে দেশ এমনই প্রপীড়িত যে, আমার দ্বাদশবর্ষীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি পর্য্যন্ত মোগল বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সক্ষম। আমাকে সকলেই কুমার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, আপনারাও সেই নামেই আমায় অভিহিত করিবেন।

একজন। আমাদের ইচ্ছা, মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং বীরবর শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তের সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিই। তাঁহারা আপনাকে আমাদের সমভিব্যাহারী দেখিলে আনন্দিত হইবেন।

কুমার। ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে পরে পরিচয় হইবে। এক্ষণে আমি আপনাদের সহিত যাইতে চাই ; দয়া করিয়া আপনারা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমিও আপনাদের মত সকলকে একত্র করিতে প্রয়াস পাইব, এবং বুঝাইব,—"হিন্দুর শুভদিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বুঝাইব যে, আমরা সকলেই হিন্দু, মোগল আমাদের জাতির শত্রু, এই শত্রুদিগের অধীনতাপাশ হইতে দুঃখিনী বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করাই আমাদের ধর্ম্ম। হিন্দুর চক্ষের জল হিন্দু না মুছাইলে আর কে মুছাইবে ? হিন্দুর যে সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছে, তাহা কি আর ভারত-গগনে উদিত হইবে না ?—এমনই করিয়া, লোকের গলা ধরিয়া,

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিব,—"মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন,—এস, আমরাও সকলে এই মহাযজ্ঞে জীবন আহুতি দিই।"

সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত যুবকের কথা শুনিতে লাগিল। তখন সেই পাঁচজনে মিলিয়া, অতুল উৎসাহে, মনের আনন্দে, মোগলবিরুদ্ধে নানা পরামর্শ করিয়া, যশোহর হইতে বহির্গত হইলেন।

বাঙ্গালার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সেই পঞ্চবীর মধুর উদ্দীপনায় জনসাধারণকে মাতাইয়া তুলিলেন। তাঁহারা যেখানে অবস্থিতি করেন, সেখানে শত শত লোক তাঁহাদিগকে দেখিতে আসে,—তাঁহাদের কথায় দ্রবীভূত হইয়া যায়! সকলেই আনন্দে বলিতে থাকে,—"ভাই রে! সত্যই কি আবার হিন্দুর দেশে, হিন্দুরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে? মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয় হউক! আমরা সকলেই তাঁহার প্রজা; আমরা চিরদিন তাঁহাকে মানিয়া চলিব, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। যদি এখানে মোগল আসে, বলিব—"দিল্লী কি আগ্রায় বসিয়া তোমরা বাদসাহী কর,—এ বাঙ্গালা মুলুকের দোকানপাট তোমাদিগকে চিরদিনের মত গুটাইতে হইতেছে!"

এইরূপ বাঙ্গালার সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া, অবশেষে সেই পঞ্চবীর রাজমহলে উপস্থিত হইলেন।

তখন রাজমহলে সের খাঁ নামে এক দুর্দ্দান্ত মোগল শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সের খাঁ তদানীন্তন বাঙ্গালার অবস্থা চিন্তা করিয়া এবং প্রতাপের প্রবল পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া, বিষম চিন্তিত হইয়াছিলেন। প্রতাপদমনে কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, কিছুই তিনি অবধারিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু শীঘ্রই একটা সুযোগ উপস্থিত হইল।

সেই পঞ্চবীর রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য,—

সের খাঁ এত নিকটে থাকিয়াও যে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে, বোধ হয় না ; অতএব কি করিতেছে, দেখা যাক্। রাজমহলে বিস্তর মোগল আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে সকল হিন্দু মোগলের অধীনে আছে, তাহাদিগকে ভাঙ্গাইয়া লইতে হইবে।”

এই অবসরে সের খাঁ, প্রতাপদমনের যে সুযোগ পাইল, তাহা বলিতেছি।
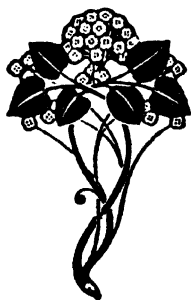
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজমহলে বসিয়া সেরখাঁ প্রতাপের প্রবল প্রতাপের বিষয় অবগত হইতেছিলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, এই বাঙ্গালী যুবক এত শীঘ্র এতটা প্রাধান্যলাভ করিবে। একবার তাঁহার মনে হইতেছিল, বাদসাহের নিকট প্রতাপের বিশ্বাসঘাতকতার কথা লিখিয়া পাঠান; আবার মনে হইল,—না, তাহাতে আপনারই কলঙ্ক; কারণ তিনি সৈন্যসামন্তাদি লইয়া এতটা নিকটে থাকিয়াও প্রতাপকে দমন করিতে পারিলেন না?—ইহার জন্য আবার দরবারে প্রার্থনা?

অগত্যা সেরখাঁ তাহা না করিয়া নিজেই তাহার প্রতিবিধান করিতে যত্নপর হইলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতাপও যে ইহা না বুঝিয়াছিলেন, এমন নহে। তিনি দেখিলেন, বাঙ্গালার প্রায় সকল হিন্দু একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তিনিও রাজকরপ্রেরণ এককালে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, অধিকন্তু সমগ্র বঙ্গের একাধিপত্য লাভ করিয়া, স্বাধীন রাজনাম গ্রহণ পূর্ব্বক, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতেছেন।—সত্যই কি মোগল ইহা উপেক্ষা করিবে? যুদ্ধ যে এক-দিন বাধিবে,—একদিন যে হিন্দু ও মোগলের শোণিতে যমুনার কালো জল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহা নিশ্চয়। বিশেষতঃ রাজমহল এত নিকটে, সেরখাঁ তথাকার শাসনকর্ত্তা, তাহার অধীনে বিস্তর ফৌজও আছে;—সেই সেরখাঁ যে এখনও প্রকাশ্যতঃ কিছু করিতেছে না,—অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। অতএব সেই গূঢ় কারণের অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই কাজ, যে-কোন লোকের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। প্রতাপ প্রিয়বন্ধু শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। শঙ্কর বলিলেন, "সুচতুর মোগলের অভিসন্ধি বুঝিতে হইলে, অনেকটা সতর্কতার প্রয়োজন। তেমন দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি সেরখাঁকে সহজে আঁটিয়া উঠা ভার। অতএব আমাদের কাহাকেও এ ভার গ্রহণ করিতে হয়।— মহারাজ! আপনার অভিপ্রায় হয় ত, আমিই এ ভার লইতে প্রস্তুত আছি।"

প্রতাপ। ভাই শঙ্কর! আমারও সেই ইচ্ছা। কি বল সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্যকান্ত। হাঁ,—যে কয়জন উৎসাহশীল, স্বদেশ-হিতৈষী, বিশ্বস্ত অনুচরকে বঙ্গের নানাস্থানে পাঠানো হইয়াছে,—শুনিতেছি, তাঁহারাও এক্ষণে রাজমহলে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিরস্ত্র আছেন। শঙ্কর সেখানে উপস্থিত হইলে ভালই হয়। শত্রুর দেশ,—কি জানি, সহজেই বিপদ ঘটিতে পারে।

শঙ্কর। আমার ইচ্ছা, আমিও নিরস্ত্র হইয়া যাই। কোনরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা ত উপস্থিত আমাদের নাই। বিশেষ সশস্ত্র অবস্থায় যাইলে, নানা গোলযোগেরও সম্ভাবনা।

প্রতাপ। তবে সেই ভাল। সূর্য্যকান্ত এখানে একাকীই সৈন্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তুমি রাজমহল হইতে প্রত্যাগত হইলে আমরা অন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইব।

শঙ্কর রাজমহল গমন করিলেন। এই রাজমহলেও প্রতাপাদিত্যের নাম লোকের জপমালাস্বরূপ হইয়াছিল। শঙ্কর দেখিলেন, সেই পঞ্চবীর এমন মধুর উদ্দীপনায় রাজমহলের হিন্দুগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছে যে, তাহারা সকলেই বলিতেছে,—"আমরা একজন উপযুক্ত নেতা পাইলে এখনই সের খাঁকে সদলবলে যমালয়ে পাঠাইতে পারি।" শঙ্কর হাসিয়া

বলিলেন,—"ভ্রাতৃবৃন্দ! মা-শঙ্করী এতদিনে সে মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য হইতেই বঙ্গে হিন্দু-নাম চির-গৌরবান্বিত হইবে। তোমরা কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাক।"

এই রাজমহলে শঙ্করের জীবনে এক বিষম পরীক্ষা উপস্থিত হইল। এখন সেই কথাই বলিব।

রাজমহলের এক ব্রাহ্মণ, সের খাঁর অত্যাচারে বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন।

অরুন্তুদ ক্রন্দনে বুক ভাসাইয়া, সেই ব্রাহ্মণ শঙ্করের চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন,—"বাবা! ব্রাহ্মণের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর। বুঝি আমার রক্ষার জন্য, ভগবান্ তোমাকে এদেশে পাঠাইয়াছেন!"

শঙ্কর ব্রাহ্মণকে অভয় দিলেন। আশ্বাস-বাক্যে কহিলেন,—"তোমার কি হইয়াছে, আমায় বল।—আদ্যোপান্ত সত্য বলিও, এই অনুরোধ।"

ব্রাহ্মণ চোখের জল মুছিয়া গদগদস্বরে কহিল,—

"বাবা, তোমার নিকট সত্যই বলিব,—এক বর্ণও মিথ্যা বলিব না।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল,—

"আপনি জানেন, বাদসাহের নানাবিধ অন্যায় কর-ভারে সমগ্র প্রজা নিপীড়িত। রাজমহলের এই কয়েদখানা,—দীন হীন কাঙাল প্রজায় পরিপূর্ণ! এই গরীব ব্রাহ্মণও সেই করের দায়ে আজ রাজপুরুষের ক্রোধানলে পড়িয়াছে। আমার প্রতি হুকুম হয়, 'তুমি অমুক তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে সমস্ত খাজনা কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করিবে; অন্যথায় পাইক গিয়া তোমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কাড়িয়া লইবে,—তোমাকে ভিটাচ্যুত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।' আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া আর একমাস সময় চাহিলাম,—রাজপুরুষ দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূরণ করিলেন। কিন্তু বাবা, পেটের দায় বড়

দায়,—অগ্রে পেটে না দিয়া খাজনা দিই কিরূপে ?—সুতরাং দ্বিতীয়বারও আমার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইল।—নির্দ্দিষ্ট দিন পূর্ণ হইবার পরদিনেই দেখি, সের খাঁর লোকজন আসিয়া আমার বাড়ী ঘেরোয়া করিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় হইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময় দেখি, সর্দ্দার পাইক আমার অন্দরে প্রবেশ করিল, তারপর অকথ্যভাষায় আমাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। আমি নীরবে তাহা সহ্য করিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, সেই দুর্ব্বৃত্ত পাইক অন্যান্য অনুচরের সহিত আমার দেবালয়ে উঠিয়া শালগ্রাম শিলা স্থানান্তরিত করিতে ও রমণীগণের উপর অত্যাচার করিতে পরামর্শ আঁটিতেছে,—তখন আর সহিতে পারিলাম না,—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, সেই সর্দ্দার পাইকের গলা টিপিয়া ধরিয়া, তাহাকে ভূমিতে ফেলিলাম এবং তারপর সজোরে তাহার মুখে এক পদাঘাত করিলাম। 'তোবা' 'তোবা' বলিয়া পাইক উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে লাগিল, আর আমিও সেই অবসরে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া, কোনও ক্রমে পলাইয়া প্রাণে বাঁচিলাম। তার পর বাবা, এই মহা বিভ্রাট !"

শঙ্কর নিবিষ্টচিত্তে সকলই শুনিলেন। বেশী কিছু না বলিয়া, গম্ভীরভাবে কেবল এইমাত্র বলিলেন,—"তবে দোষ শুধু পাইকের একার নহে। যাই হউক, যখন তুমি আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন নির্ভয়ে থাক,—আর একাগ্রমনে ভগবান্‌কে ডাক।"

এদিকে রাজমহলে, প্রধান রাজপুরুষের এজ্‌লাসে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সের খাঁ হুকুম দিলেন,—"সেই বেয়াদব বদ্‌বখত কাফেরকে ধরিয়া আনো,—আমি তাহার গর্দ্দান হুকুম দিলাম।"

হুকুম শুনিয়া ব্রাহ্মণের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল।

সেই নির্য্যাতিত ও অপমানিত পাইক, আর কয়েকজন পাইক ও দুঁদে

লস্করকে সঙ্গে লইয়া, সমগ্র রাজমহল পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিল,—কোথায় সেই মন্দমতি ব্রাহ্মণের সন্ধান পাওয়া যায়? শেষ তাহারা আসামীর সন্ধান পাইল। কিন্তু বুঝিল, সিংহের মুখ হইতে শিকার ছিনাইয়া লওয়া, সহজ কথা নহে।

তাহারা গিয়া তাহাদের প্রভুকে এ কথা জানাইল। জানাইল যে, বঙ্গীয় বীর—মহাবল শঙ্কর চক্রবর্ত্তী সেই মহা অপরাধীকে আশ্রয় দিয়াছে!

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। প্রতাপ-সহচরকে এই ঘটনার মধ্যে সংলিপ্ত থাকিতে দেখিয়া, সের খাঁ মনে মনে বিশেষ খুসী হইল। ভাবিল, এখন এক গুলিতে, অতি সহজে, দুইটি পক্ষী শিকার হইবে। সের খাঁ শঙ্করকে আহ্বান করিল।
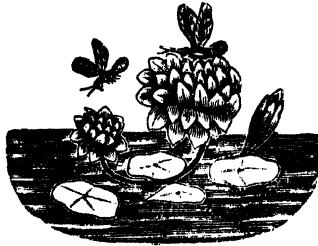
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:•:——

সেই দিন আর এক ঘটনা উপস্থিত হইল। পাঠক জানেন, শঙ্কর-নিযুক্ত সেই বক্তাদল রাজমহলের স্থানে স্থানে মোগল-বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করিতেন। এ কথা একদিন সেরখাঁর কর্ণগোচর হইল। তিনি হুকুম দিলেন,—"যেমন করিয়া পার,—এখনই সেই দুর্ম্মতি কাফেরগণকে বাঁধিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ কর।"

কিন্তু সের খাঁর অধীনে যে সকল হিন্দু-কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা গোপনে সেই বক্তাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

কোন বিশেষ কারণে কুমার নামে সেই তরুণ যুবা,—তাঁহার সঙ্গী বক্তা চতুষ্টয়ের সহিত থাকিতেন না,—তাঁহার আবাসস্থান স্বতন্ত্র ছিল।

যেদিন সের খাঁর এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হয়, সেইদিন কুমার মোগল-দলভুক্ত কয়েকজন হিন্দু-কর্ম্মচারীর সহিত কি পরামর্শ করিতেছিলেন। সের খাঁর অধীনে কত সৈন্য আছে,—তাহারা কিরূপ কার্য্যপটু,—সের খাঁর অর্থবল কত,—এইরূপ অনেক অনুসন্ধান লইতেছিলেন। সহসা দেখিলেন, একদল ফৌজ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। তাহারা আসিয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এবং তৎসঙ্গে সেই হিন্দু কর্ম্মচারিগণকেও বন্দী করিল। তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ফৌজের সহিত সের খাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন।

দূর হইতে সের খাঁ,—সেই তরুণবয়স্ক তেজস্বী যুবকের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন একখণ্ড জ্বলন্ত আগুন তাঁহার সম্মুখে আসিতেছে! সের খাঁ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী

কয়জনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন; তারপর সেই তেজস্বী যুবকের মনের ভাব সবিশেষ অবগত হইবার জন্য, তাঁহার বিচার করিতে মনস্থ করিলেন।

এদিকে সের খাঁর আহ্বানে, অবিচলিত-হৃদয় শঙ্করও সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইলেন। একত্র দুই রাজদ্রোহীর বিচার করিতে সের খাঁ এক মহা দরবার করিলেন।

মূর্ত্তিমান দম্ভ—সেই মোগল রাজপুরুষ, ঘৃণার দৃষ্টিতে শঙ্করের আপাদমস্তক দেখিয়া, রুক্ষস্বরে কহিল,—

"তুমি জানো,—কত বড় গুরুতর অপরাধে, তুমি আজ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ?"

নির্ভীক শঙ্কর অবিচলিত হৃদয়ে, মুক্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—

"আপনার নিকট আসিয়া আজ দাঁড়াইয়াছি বটে, কিন্তু বিশেষ যে কিছু অপরাধী হইয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহা মনে হয় না।"

সের খাঁ। তুমি সেই বদ্‌বখত বেয়াদব ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিয়াছ?

শঙ্কর। আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু——

সের খাঁ। আচ্ছা, চুপ কর। (কুমারের প্রতি) আর তুমি জান,—তোমার অপরাধ কত গুরুতর?

কুমার অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—

"আমার অপরাধ আমি অবগত আছি।"

সের খাঁ। জান, ইহার শাস্তি কি?

কুমার নীরব হইয়া রহিলেন।

সের খাঁ কোপ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—

"তোমরা সেই বিদ্রোহী প্রতাপাদিত্যের চর,—তাহা বুঝিয়াছি। সেই কাফের বড়ই বেয়াদব হইয়া উঠিয়াছে,—অচিরেই তাহার বিনাশ

সাধন করিতেছি।—তোমরা সেই নিমকহারামের কুহকে মজিয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করিতেছ!"

কুমার দেখিলেন, শঙ্কর স্থির অবিচলিত চিত্তে দাঁড়াইয়া আছেন। যেন তরঙ্গান্বিত সমুদ্রবক্ষে উন্নত গিরি,—সফেন তরঙ্গ-তুফানে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্থির রহিয়াছে! দেখিয়া কুমারের সাহস বাড়িল, সেই প্রদীপ্ত বিশাল নয়নে যেন ধক্ ধক্ করিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল। শঙ্কর স্থির-দৃষ্টিতে কুমারের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন;—তাঁহার সেই মনোহর মূর্ত্তি, সেই প্রদীপ্ত নয়ন-যুগল, সেই মধুর অবয়ব, সেই লাবণ্যপূর্ণ তরুণ বয়স,—দেখিতে দেখিতে শঙ্কর ভাবিতে লাগিলেন,—"কাহার এমন পুত্ররত্ন? কাহার প্ররোচনায় এই দেব-শিশু এই মহাব্রত গ্রহণ করিল? এই বালক দেশে দেশে স্বাধীনতার গীত গাহিয়া বেড়াইতেছে!—ধন্য জন্ম, সার্থক জীবন!"

শঙ্কর মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বৎস! ভগবান্ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। এ শত্রু-পুরী,—বুঝিতে পারিলাম না,—তুমি কে? তুমি যেই হও, দীর্ঘজীবী হইয়া, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

সের খাঁ। শুন যুবক, তুমি অল্পদিন মাত্র রাজমহলে আসিয়া অনেক ষড়যন্ত্র করিয়াছ,—ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়াছ। কিন্তু মোগল যদি তোমাদের চাতুরী বুঝিতে না পারিবে, তবে বৃথায় এ ভারতভূমে বিজয়-নিশান উড়াইয়াছে!—তোমায় প্রাণে মারিব না। তোমার অপরাধ যেরূপ গুরুতর, তাহাতে তোমার একার অপরাধেই সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে মারা উচিত। কিন্তু যে কারণেই হউক, তোমায় প্রাণে মারিব না। তোমার উপর কোন্ শাস্তি প্রয়োগ করিব, এখন বলিতে পারি না;—আপাততঃ তোমায় কারাগারে থাকিতে হইবে।

কুমার শঙ্করের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন,—শঙ্কর হাসিতেছেন। দেখিয়া কুমারও হাসিলেন।

সের খাঁ। এরূপ দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াও, ভীরু কাফেরের মুখে হাসি আসিতে পারে!

শঙ্কর। ধর্ম্মাবতারের দয়া দেখিয়া হাসি সংবরণ করিতে পারিলাম না।—একার অপরাধে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে জড়াইতে যাওয়া যথেষ্ট সুবিচার বটে! আর প্রাণদণ্ডের অপরাধেও যে, এই বালককে কারাদণ্ড দিলেন, ইহাও যথেষ্ট দয়ার পরিচয়।

সের খাঁ। কি,—আমার বিচারের উপর অপরাধী কাফেরের প্রতিবাদ!—প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যে কারাগারে পাঠাইতেছি, ইহা কি দয়া নহে?

শঙ্কর এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

সের খাঁ। তুমি যে ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিয়াছ, সে মহামান্য সম্রাটের ধর্ম্মাধিকরণে কিরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধী জান?—আর আমি তাহার প্রতি কি দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছি, তাহাও অবগত আছ?

শঙ্কর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ভূমিপানে মুখ নত করিয়া কহিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ।"

সের খাঁ। যখন সমস্তই অবগত আছ, তখন তুমি কি ভাবিয়া, কোন্ সাহসে সেই মহা অপরাধীকে আশ্রয় দিয়াছ?

শঙ্কর একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরভাবে উত্তর দিলেন,—

"বিশেষ যে কিছু ভাবিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিয়াছি, তাহা নহে। শরণাগতকে রক্ষা করিবার সময়, হিন্দু আপনার পরিণাম ভাবে না। জাঁহাপনা! মনে রাখিবেন, আমিও কিছু বাহাদুরী দেখাইবার জন্য এ কাজ করি নাই।"

সের খাঁ। এখন যদি বুঝিয়া থাক,—সেই অপরাধীকে আশ্রয়

দেওয়ায় তোমারও মহা অপরাধ হইয়াছে, তবে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, এখনই—এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে দরবারে পৌঁছিয়া দাও।

শঙ্কর নীরবে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সের খাঁর চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিল। সেই আরক্তিম চক্ষে, কঠোর কণ্ঠে পুনরায় বলিল,—

"আমি এখনই ইহার সদুত্তর শুনিতে চাই।"

এবার শঙ্কর ছলছল চক্ষে, বাষ্পগদগদ কণ্ঠে, যোড়হাতে কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতার! আমি প্রাণ থাকিতে শরণাগতকে তাহার শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব না। ইহা হিন্দুর ধর্ম্ম নহে।"

সের খাঁ। (দৃঢ়তার সহিত) তবে তুমি সেই অপরাধীর দণ্ড লইতে প্রস্তুত আছ?—কাফেরের আবার ধর্ম্ম!

কুমারের সেই কমনীয় দেহ থর্-থর্ কাঁপিতে লাগিল।

শঙ্কর অম্লানবদনে উত্তর দিলেন,—

"যদি আমার প্রাণদণ্ডে সেই গরীব ব্রাহ্মণ অব্যাহতি পায়, ত আমি এখনি তাহাতে প্রস্তুত আছি।"

উত্তর শুনিয়া সের খাঁ চমকিত হইল। কি ভাবিয়া, এবার কথা উল্টাইয়া লইয়া বলিল, "না, না,—এরূপ করিলে দিল্লীশ্বরের নামে কলঙ্ক স্পর্শিবে। আমি সেই অপরাধীকেই সমুচিত দণ্ড দিতে চাই। তুমি অপরাধীকে প্রত্যর্পণ করিবে কিনা—বল?"

শঙ্কর। জাঁহাপনা! বলিয়াছি ত, প্রাণ থাকিতে আমা দ্বারা সে কার্য্য হইবে না। বিশেষ, আপনি লঘুপাপে অতি গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ রাজবিধি অমান্য করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, আমি সেই অপরাধে দণ্ডিত হইতে প্রস্তুত আছি। আপনি নিজগুণে ব্রাহ্মণকে এ যাত্রা ক্ষমা করুন।"

এবার সের খাঁ ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কি, আমার বিচার-কার্য্যের উপর পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ! তোমার স্পর্দ্ধা যে চরম মাত্রায় দেখিতেছি! (রক্ষিগণের প্রতি) এখনই এই দুষ্ট কাফেরকে কারারুদ্ধ কর। ইহার বিচার আমি পরে করিব।"

নিরুপায় শঙ্কর তখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া, অবিচলিত হৃদয়ে কারারুদ্ধ হইলেন। কুমারও ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক, তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুইজনকেই কারারুদ্ধ হইতে হইল।

বলা বাহুল্য, শঙ্করের উদ্যোগে, ইতিপূর্ব্বেই সেই অপরাধী ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে—প্রতাপের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ব্রাহ্মণের মুখে সকল কথা শুনিলেন। পরে আরও সংবাদ পাইলেন, তাঁহার প্রাণোপম বন্ধু শঙ্কর ও তরুণবয়স্ক জনৈক যুবক-বক্তাও কারারুদ্ধ হইয়াছেন। বাকি চারিজন রাজমহলে আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এক প্রকার আত্মগোপন করিয়া আছেন। এই দারুণ দুঃসংবাদে প্রতাপ মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু বিপদে অধৈর্য্য হওয়া তাঁহার স্বভাব নহে। কার্য্যকুশল প্রতাপ অবিলম্বে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সূর্য্যকান্তের সহিত কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে রাজমহলে পাঠাইয়া দিলেন। উপদেশ দিলেন,—"যত অর্থ ব্যয় হউক,—কারা-গৃহের প্রহরীদিগকে হস্তগত করিয়া, এ বিপদে উদ্ধার হইতে হইবে। শুনিয়াছি, প্রহরিগণের অধিকাংশই হিন্দু; সুতরাং অন্তরে নিশ্চয়ই তাহারা মোগলবিদ্বেষী। এমত অবস্থায়, উপস্থিত বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

সূর্য্যকান্ত বহু অর্থ লইয়া, অদম্য উৎসাহে রাজমহল যাত্রা করিলেন।

কারাগারে আবদ্ধ হইয়া শঙ্কর ও কুমার দেখিলেন, বিস্তর দীনহীন হিন্দু-কৃষক করভারে প্রপীড়িত হইয়া, মোগলের অত্যাচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সের খাঁর সেই একমাত্র কারাগার ছিল। তথায় নরহত্যাকারী মহাপাপীও যে ভাবে আবদ্ধ থাকিত, অতি সামান্য অপরাধে অপরাধীও সেইভাবে আবদ্ধ থাকিত। সে কারাগারের অবস্থাও অতি ভীষণ। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, লৌহ-নির্ম্মিত গবাক্ষ, অতি কষ্টে আলো ও বাতাস তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পায়। তারপর, অতি অল্প স্থানে

বিস্তর লোকের সমাবেশ, এবং কয়েদীদিগের আহারীয় দ্রব্যও অতি সামান্য এবং কদর্য্য। সে দ্বিতীয় যম-গৃহে, যে অধিক দিন থাকিত, তাহাকে আর ফিরিতে হইত না। শঙ্কর ও কুমার সেই কারাগৃহে আবদ্ধ হইলেন। কতদিনের জন্য, কে বলিতে পারে?

কুমার এক এক করিয়া বন্দীদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি সংখ্যা করিয়া দেখিলেন, প্রায় পাঁচশত হিন্দু-প্রজা কারারুদ্ধ আছে।

ধর্ম্মপ্রাণ শঙ্কর,—সম্পদে, বিপদে সদাই ভগবানের নাম-গানে বিভোর। এই কারাগারে আসিয়াও তিনি গুন্ গুন্ স্বরে ভগবানের নাম-গানে রত। গবাক্ষ-পথে চাহিয়া, এইরূপ একান্তমনে মৃদুমধুর তানে তিনি ভগবানের নাম-গান করিতেছেন, আর শত শত বন্দী ভক্তিভরে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। গান শেষ হইলে কুমার সেইখানে গিয়া শঙ্করের চরণে প্রণাম করিয়া চুপিচুপি বলিলেন,—

"মহাত্মন্! দেখিলাম, এই কারাগৃহে প্রায় পাঁচশত হিন্দু বন্দী আছে। এই পাঁচশত লোকের মধ্যে তিনশতেরও অধিক,—বলিষ্ঠ এবং দৃঢ়কায়। এই দরিদ্রগণকে মুক্ত করিয়া, উপযুক্ত বেতন দিয়া রাখিলে, বোধ করি, একদিন আমাদের কিছু উপকার হইতে পারে।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিলেন,—

"যুবক! তুমি—কি? এই কারাবাসই দণ্ডের শেষ নহে,—তাহা জান?—তুমি এমন নিশ্চিন্তভাবে আছ কেমন করিয়া?"

কুমার। কৈ, আমার মনে ত কিছুমাত্র ভীতির সঞ্চার হয় নাই? বরং আপনাকে পাইয়া আনন্দেই আছি। আমি রাজমহলে আসিয়া যে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে বলিতে পারিব।

এই বলিয়া কুমার চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন,—"এই সের খাঁ অতি দুর্দ্দান্ত বটে, কিন্তু তেমন চতুর লোক নহে। যদি ইহার তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি

থাকিত, তবে কথনই আপনাকে ও আমাকে একই কারাগৃহে আবদ্ধ করিত না। আগুনের পার্শ্বে পবনকে ডাকিয়া, কে বসাইতে চায়? যাহা হউক, আমার বিশ্বাস আছে, এই পাঁচশত বন্দীকেই আমাদের দলভুক্ত করিতে পারিব। আর——”

শঙ্কর বাধা দিয়া বলিলেন, “ধন্য তোমার সাহস!—কাল হয়ত তোমার শোণিতে বধ্যভূমি রঞ্জিত হইবে,—আর আজ কিনা তুমি কারাগৃহে বসিয়াও ষড়যন্ত্র করিতেছ!”

কুমার হাসিয়া বলিলেন,—

“আমি বালক মাত্র, আমার অপরাধ লইবেন না। হইতে পারে, কল্য আমার শেষ দিন! কিন্তু যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ জননী-জন্মভূমিকেও ভুলিতে পারি না। আপনি কি আমার মনের বল পরীক্ষা করিতেছেন? বীরবর! আমি যাহা বলি, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন। এই সের খাঁ আমাদিগকে অল্পে ছাড়িবে না, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু ইহার অধীনে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যে তিন সহস্রের অধিক নাই। ইহার ধনাগারে এখন তেমন অর্থও নাই যে, সহসা যুদ্ধ বাধিলে খরচ চালাইতে পারিবে। তার পর, বর্ষাও আগতপ্রায়। এত সৈন্যের রসদ সের খাঁ সহসা সংগ্রহ করিতে পারিবে না। কাজেই হঠাৎ যুদ্ধ বাধিলে ইহারই পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক। বিশেষ, ইহার হিন্দু-কর্ম্মচারিগণ গোপনে আমাদিগের সহিত যোগ দিয়াছে। আমার মৃত্যুতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, তবে আপনার মুক্তির বিশেষ প্রয়োজন বটে। আপনি ও সূর্য্যকান্ত,—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দুই হস্ত স্বরূপ। যদি আপনার মুক্তিসাধন করিতে পারি, তবে এই হতভাগ্য বন্দিগণেরও মুক্তিলাভ হইবে।—আপনি বলিতে পারেন, মহারাজ প্রতাপাদিত্য এ সংবাদ পাইয়াছেন কি না?”

"হাঁ, পাইয়াছেন।"

শঙ্কর কিছু বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন,—"এ যুবা কে? এ ত সামান্ত নহে! এতদিন ইহাকে দেখি নাই কেন? নাম,—কুমার! কৈ, এ নাম ত কাহারও শুনি নাই? এই অল্পবয়স, এমন রূপ, এমন মধুর কথা, এমন উৎসাহ, এমন তেজ, এমন দেশভক্তি,—কৈ, এমন ত কোথাও দেখি নাই?" শঙ্কর মনে মনে কুমারকে শত ধন্যবাদ করিলেন; পরে বলিলেন, "কুমার, তোমার শুভ ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। তুমি যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ, তাহাতে আমাদের বিশেষ উপকার হইবে।"

কুমার আবার বলিলেন,—"দেখুন, এই কারাগৃহের প্রহরিগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।—দুই একজনের সহিত ইতিপূর্ব্বে আমার সৌহার্দ্দও হইয়াছে। সময়ে ইহারা আমাদের দলভুক্ত হইবে,—এমন কথাও বলিয়াছে। তাই আমার মনে হয়, ইহাদিগের দ্বারাই আমাদের উদ্ধার হইবে।—হাঁ, একটা কথা;—মহারাজ প্রতাপাদিত্য বোধ হয়, আমাদের উদ্ধারার্থ সূর্য্যকান্তকেই এখানে পাঠাইবেন?"

শঙ্কর। যদি তাহাই হয়,—তবে কি হইবে?

কুমার কি ভাবিয়া বলিলেন,—"যদি আমাকে কল্যই ইহারা স্থানান্তরিত না করে, তবে কাহার সাধ্য,—আমাদিগকে কারারুদ্ধ রাখে?"

শঙ্কর হাসিয়া বলিলেন,—

"যাক্, আর অত ভাবিয়া কাজ নাই;—যিনি জনশূন্য দুর্গম প্রান্তরে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটাণুর কথাও ভাবিয়া থাকেন, আমাদের ভাবনাও তিনি ভাবিতেছেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাই হইবে। তোমার ন্যায় আমারও মনে হইতেছে, আমরা মুক্তিলাভ করিব। কেন মনে হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। এখন এস,—একবার সেই ভাবরূপ অব্যক্ত পরমপুরুষের নামগান করি।"

কুমার পার্শ্বে বসিলেন। শঙ্কর সেই কারাগৃহ ভুলিয়া গিয়া,—মনের আনন্দে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, শ্রীজয়দেবের সুধার সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন ;—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥ * * *

শুনিতে শুনিতে সেই বন্দিগণ ভাবে গদগদ হইল,—সকলে স্থানকাল ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িল।

বাহিরে হিন্দু-প্রহরিগণ নীরবে সেই গান শুনিতেছে, আর পুলকে পূর্ণ হইতেছে। হায়! মোগলের আবাসে বসিয়া, প্রাণ খুলিয়া, একদিন ভগবানের নামগানও করিতে পায় নাই! মোগল-প্রহরিগণ লৌহ-গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল, আর শান্তিরক্ষার জন্য "হাঁক-ডাক" আরম্ভ করিয়া দিল।

গান থামিল। কুমার বন্দিগণকে বলিলেন,—

"ভাই সব! এই মহাত্মা যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনাইয়া আজ আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন, এ গানের মূল্য নাই। দেখ, এই মোগলদিগের

অত্যাচারে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইয়াছে! প্রাণ ভরিয়া ভগবানের নামও লইতে পারি না! আমরা সকলেই বন্দী ঘটে, কিন্তু দেহ বন্দী হইয়াছে বলিয়া কি প্রাণও বন্দী হইয়াছে? আমরা সকলেই বন্দী,—কে জানে, হয়ত এই কারাগারেই আমাদের জীবন-দীপ নিবিয়া যাইবে!—আর হয়ত পিতা মাতার স্নেহ, ভ্রাতা ভগিনীর যত্ন, পুত্র কন্যার ভক্তি,—কিছুই ভোগ করিতে পাইব না! কত হতভাগ্য শিশু পিতৃহীন হইবে,—কত দুঃখিনীর সীমন্তের সিন্দূর মুছিবে,—আর কত পিতা মাতা হয়ত নয়ন-তারা হারাইয়া শোকে পাগলপ্রায় হইবেন!"

এক একটি দীর্ঘশ্বাসে সেই কারা-গৃহ পূর্ণ হইল! কাহারও চক্ষে জলবিন্দু ঝরিতে লাগিল। কুমার নিজেও একবার চক্ষু মুছিলেন। এবার শঙ্কর বলিলেন,—"সেই পরম দয়াল ভগবান্ এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিলেন,—হিন্দুর এ দুঃখ আর থাকিবে না। কারণ হিন্দুবীর এখন বঙ্গের সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছেন।"

দুই চারিজন বন্দী নিকটে আসিয়া, শঙ্করকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল,—"প্রভু! আপনি কে? আপনারা কি আমাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন? বলুন,—কি করিতে হইবে, আমরা এখনই সকলকে সে শুভসংবাদ দিই।"

মোগল-প্রহরী দেখিল, সন্ধ্যায় সমস্ত বন্দী এক হইয়া, কি পরামর্শ করিতেছে,—একজন কি বলিতেছে, আর সকলে একাগ্রমনে তাহা শুনিতেছে। দেখিয়া প্রহরী ভাবিল,—"এই কাফের বন্দিগণ পলায়নের কথা ভাবিতেছে না ত?" কিন্তু সেই কঠিন লৌহ-অর্গলে-আবদ্ধ বাতায়ন দেখিয়া, প্রহরী হাসিল,—মনে মনে বলিল,—"অসম্ভব!"

রাত্রির অন্ধকারে বসিয়া, সকলে নিবিষ্টচিত্তে, শঙ্কর ও কুমারের মুখে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কথা শুনিল। শঙ্কর ও কুমার সেই

পাঁচশত বন্দীকে একমত করাইলেন। সুবিধা হইলেই তাহারা কারাগার হইতে পলায়ন করিবে এবং স্বদেশের চিরস্বাধীনতা স্থাপনের জন্য প্রাণ দিবে,—ইহা স্বীকার করিল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলে কারাগারের দুঃখ ভুলিয়া গেল,—মুহূর্ত্তের জন্য সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।

কুমার শঙ্করের পার্শ্বে আসিয়া, পুনরায় চুপি চুপি বলিলেন,—

"দেখুন, আজ রাত্রেই আমাকে কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।—এই বন্দিগণ নিদ্রিত হইলে,—ঐ উচ্চ বাতায়নে উঠিয়া, আমি যাহা করিব, আপনি তাহাতে কোন প্রশ্ন করিবেন না।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বুদ্ধি ও সাহসে আমার অটল আস্থা জন্মিয়াছে। বুঝিয়াছি, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পার! তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই আমার জানা উচিত ছিল।—সূর্য্যকান্ত কি তোমায় চিনেন?

কুমার। তাহা বলিতে পারি না।

শঙ্কর। তবে, তিনি তোমাকে এখানে প্রেরণ করেন নাই?

কুমার। না, আমি নিজেই আসিয়াছিলাম।

শঙ্কর কুমারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কুমার তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন,—আপনারা যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে যেন আমি জীবন আহুতি দিয়া, আমার ব্রত উদ্যাপন করিতে পারি! তবেই আমার জীবন সার্থক হইবে।"

শঙ্কর। তোমার ব্রত কি?

কুমার। বীর-ধর্ম্ম আমার ব্রত,—আর সেই ব্রত উদ্যাপনই আমার লক্ষ্য।—আশা কি পূর্ণ হইবে না?

শঙ্কর সর্ব্বান্তঃকরণে অতি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"তোমার আশা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তুমি বয়সে বালক বটে, কিন্তু তোমার অমৃতময়ী কথা শুনিয়া, এবং তোমার এই অতুল উৎসাহ দেখিয়া, সত্য সত্যই আমি মুগ্ধ হইয়াছি।—বৎস, তুমি চিরজীবী হও।"

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন রাত্রে, সেই কারাগৃহে, লৌহনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বাতায়নের উপর বসিয়া, এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী বীণাবিনিন্দি মধুরস্বরে গান গায়িতেছিলেন। নিস্তব্ধ নিশীথে দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় সেই করুণ-গীতি অতি মধুর লাগিতেছিল। সেই গান যাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, সেই-ই মুগ্ধ হইল।

বন্দিগণ নিদ্রায় অভিভূত ছিল। সেই গীত-লহরী তাহাদের প্রাণে স্বপ্নশ্রুত কোন অপ্সরা-কণ্ঠ বলিয়া বোধ হইল। কারাগৃহে হিন্দুপ্রহরি-গণ সেই গীত লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইল;—দেখিল, উচ্চ বাতায়নে বসিয়া, এক দেবীমূর্ত্তি করুণস্বরে কি মর্ম্মগাথা গায়িতেছেন। গায়িতে গায়িতে, বুঝি বা সে বিশাল আঁখি-যুগল হইতে মধ্যে মধ্যে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার কি অপরূপ রূপ!—মনুষ্যলোকে কি এ রূপ সম্ভবে? নিশ্চয়ই ইনি কোন দেবী,—হিন্দু-বন্দীর দুঃখ দূর করিতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন! তাহারা সেই দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তার পর মোগলপ্রহরিগণ আসিল। সেই নির্ম্মল জ্যোৎস্নায়, সেই দেবী-প্রতিমা দেখিয়া,—তাঁহার সেই মধুর সঙ্গীত শুনিয়া, তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইল। মোগলপ্রহরিগণ ভাবিল, এ নিশ্চয়ই কোন পরী হইবে! নহিলে এই বন্দীগৃহে স্ত্রীলোক আসিবে কোথা হইতে? পরী না হইলে কি এত রূপ হয়? কণ্ঠ কি এমন মধুর হয়? তাহারা ত বহুকাল হইতে এই কার্য্য করিতেছে,—কৈ, এমন দৃশ্য ত আর কখন দেখে

নাই? কিন্তু এই বন্দিগণ কাফের,—পরী ইহাদের কাছেই বা আসে কেন? হইতে পারে, আজ এক বড় সুন্দর যুবা বন্দী হইয়াছে,—পরী হয়ত তাহার সহিত প্রেম করিতে আসিয়াছে!—তাহারা অবাক্ হইয়া পরী দেখিতে লাগিল।

পরী, গীত গায়িতে গায়িতে সহসা বাতায়ন হইতে অবতরণ করিল এবং অন্য বন্দিগণের সহিত মিশিয়া গেল। বাহিরের প্রহরিগণ দেখিল, পরী অন্তর্হিত হইয়াছে,—কিন্তু এখনও তাহার করুণ-গাথা বাতাসে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরীর এই হঠাৎ অন্তর্ধানে, তাহাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। কেহ প্রমাদ গণিয়া বলিল,—'পরী দেখা ভাল নহে; কি জানি হয়ত আমরা কি দোষ করিয়া থাকিব, তাই তিনি দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন।' কেহ বা পরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, মদনের ফুলশরে কাতর হইল, ভাবিল,—'মনুষ্যজন্মে কি পরীলাভ করা যায় না? তেমন সুকৃতি কি আমার নাই? যাই হোক্, আজ একবার দেখিব। যদি একা না পারি, দশ পনেরো জনেও চেষ্টা করিয়া দেখিব!—না হয় প্রাণ যাইবে।'

পরদিন প্রভাতে, সেই প্রহরিগণমধ্যে, এই বিষয় লইয়া একটা বাক্-বিতণ্ডা চলিল। নানা জনে নানা কথা বলিল। কেহ বা বলিল, "নারে না, ইহা পরী নয়—প্রেতযোনি।" তখন সেই সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিল। কিন্তু সর্দ্দার প্রহরীর এ সব কথা মনে ধরিল না, সে বলিল, "তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তোমরা আসিও না, কিন্তু যাহার ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে আইস। আমি এই পরীকে আজ ধরিবই ধরিব। আমার মনে হইতেছে, অদূরে ঐ যে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাইতেছে, পরীকে যেন ঐ পাহাড়ের উপর উঠিতে দেখিয়াছি। যাহা হউক, উহার দূরে দূরে থাকিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

সকলে হাসিয়া বলিল, "সর্দ্দারের সাহস নাই,—তাই দূরে দূরে থাকিয়ে বলিতেছে।"

সর্দ্দার। কি জানো ভাই, প্রেম বল আর যাই বল,—প্রাণ আগে; —প্রাণে বাঁচিলে ত সব হইবে?

আবার বড় একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। তখন হিন্দুপ্রহরীর যে প্রধান, সে সেইখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হে! আজ তোমরা এত হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়াছ কেন?"

মোগল প্রহরী। আরে ভাই, বড় মজার কথা। কাল রাত্রে আস্‌মান্ হইতে এক পরী নামিয়াছিল!

হিন্দু প্রহরী। তোমায় নিকা করিতে নাকি?

মো, প্র। তা কে জানে ভাই! বড় খুবসুরৎ চেহারা, বড় মিঠা গলা! আমার কলিজার উপর খাড়া হ'য়ে, যেন প্রাণটা নিয়ে আস্‌মানে গেল।

হি, প্র। তুমি সঙ্গে যেতে পাল্লে না?

মো, প্র। তা পাত্তুম,—ঘরের যে বিবিজান,—বাপ্‌রে! তাঁর পিয়ারে জান্ ভাজা-ভাজা হ'য়েচে।—তোমরা কি পরী দেখ নাই?

হি, প্র। আমরাও দেখেছি বটে। এ বড় অদ্ভুত দৃশ্য! আমিও কাহাকে না বলিয়া, খুব ভোরে উঠে কয়েদখানার ভিতর গিয়ে চারিদিক্ দেখেছি,—কিন্তু কোথাও তার দেখা পাই নাই।

মো, প্র। কেমন দাদা, কেবল কি আমিই কাতর হ'য়েছি? তা শোন,—একটা পরামর্শ করি। আমি মনে ক'রেছি, আজ যদি আবার দেখি, তবে পরীজানকে ডাকিয়া বলিব, 'তুমি নামিয়া এস, তোমায় আমি কাফেরের মত পূজা দিব, আর তোমার সঙ্গে পিয়ার করিব।' তা পরীজান্ যদি নামিয়া আসেন, তবে তাঁহার সঙ্গে আমরা জনকতক যাব;—কিন্তু

কাছে যাওয়া হইবে না!—তখন ভাই, তোমরা একবার গারদ ঘরের চারিদিকটা ভাল ক'রে পাহারা দিও। কিন্তু সাবধান,—একথা যেন আর কেউ না শুনে!—কেমন, তুমি রাজী আছ ত ভাই?

হি, প্র। দেখি, আর সকলের কি মত্ হয়। এত রাত্রি পাহারা দিয়া, আবার যে শেষ-রাত্রিও পাহারা দেয়, এমন ত কাহাকে দেখি না।

মো, প্র। না, তোমায় চেষ্টা করিতেই হইবে। না হ'লে দাদা আমার প্রাণ যায়। আর মনে করিলে তুমি একাই থাক্‌তে পার, —কয়েদীগুলো কি সত্যি সত্যি লোহার কবাট ভেঙ্গে ভাগ্‌বে?

হিন্দু-প্রহরী হাসিয়া বলিল,—"আরে রাম! তাও কি সম্ভব?"

প্রভাত হইলে শঙ্কর বলিলেন, "কুমার! তুমি এমন সঙ্গীত শিখিয়াছিলে কোথায়? এমন মধুর কণ্ঠ আমি শুনি নাই।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন,—"এ কণ্ঠ কি আপনার তুল্য?"

শঙ্কর। কল্য রাত্রে তোমার কার্য্য দেখিয়া, আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। তুমি সার্থক রমণী সাজিয়াছিলে। আমারও ভ্রম হইয়াছিল।

কুমার হাসিয়া বলিলেন,—"অনেকবার আমাকে এমন সাজিতে হইয়াছে। আপনি বোধ হয় বুঝিয়াছেন, এই রমণী-সজ্জাই আমাদের উদ্ধারের পথ!"

শঙ্কর। হাঁ, কতক কতক বুঝিয়াছি বৈ কি?—তুমি যে হিন্দু প্রহরীর কথা বলিয়াছিলে, সেই কি কারা-দ্বার খুলিয়া দিবে?

কুমার। হাঁ। সে ব্যক্তি সামান্য প্রহরী নয়, ছদ্মবেশী একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। মোগলের সর্ব্বনাশ করিবেন বলিয়াই এই প্রহরীর কাজ লইয়াছেন।

শঙ্কর। ধন্য তুমি! এত সন্ধানও রাখিয়াছ?

কুমার পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

"সের খাঁ এই হিন্দু প্রহরীকে খুব বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে। অনেকবার অনেক উচ্চপদ দিতে চাহিলেও ইনি নিজে এই পদ লইয়াছেন। যেদিন আমি হিন্দু সৈন্যগণের এক অধিনায়ককে নিকটে লইয়া, আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাইতেছিলাম, এবং তাঁহাকে আমাদের দলভুক্ত হইতে অনুরোধ করিতেছিলাম,—সেই দিন ইনিই আমাকে সাবধান করিয়া দেন যে, সের খাঁ আমাদের প্রতি অতি কঠিন আজ্ঞা প্রচার করিয়াছে। আমি তখনই ইহাঁকে বুঝিলাম, বলিলাম,—'আপনি হিন্দু ;—দৈবদুর্ঘটনায় সত্য সত্যই যদি আমি বন্দী হই, আপনিই আমায় উদ্ধার করিবেন।' তারপর যখন আমি বন্দী হইলাম, তখন কারা-দ্বারে প্রথমেই তাঁহাকে দেখিলাম। তিনি স্মিতমুখে ইঙ্গিতে জানাইলেন, 'কোন ভয় নাই'—তাই আমার এত সাহস।"

শঙ্কর। কুমার, তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং এই অলৌকিক কৌশল ও সাহস দেখিয়া, সত্য সত্যই আমি বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক্। সেই হিন্দু-প্রহরীকে নিকটে পাইলে আমি সমস্ত বুঝাইয়া বলিব।

কুমার। তাহাই করিবেন। বলিলেন, আমি স্ত্রীলোকের বেশে এই কামান্ধ মোগলদিগকে মুগ্ধ করিয়া, স্থানান্তরে লইয়া যাইব,—আর সেই সুন্দর অবসর।

শঙ্কর। তুমি উপস্থিত থাকিবে না ?

কুমার। না, সংপ্রতি আমি অন্যত্র থাকিব। কোন বিশেষ কারণে এখন আপনার সহিত দেখা করিব না,—সন্ধ্যার সময় আবার দেখা হইবে।

কুমার মনে মনে বলিলেন,—"হে অন্তর্য্যামী দেবতা! আমায় ক্ষমা

করিও। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া, দেশের মুখ চাহিয়া, আমি এই কূট কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছি।"

এই সময় সেই হিন্দুপ্রহরী বন্দিগণকে মিছামিছি তিরস্কার করিতে করিতে, কারাদ্বার উন্মোচন করিল। সর্দ্দার চাবি লইয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে আবার একটা কাতরতা প্রকাশ পাইল।

কুমার সেই হিন্দুপ্রহরীকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ইনিই সেই।"

শঙ্কর, দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তিনিও দূর হইতে, অন্যের অলক্ষ্যে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রহরী,—উত্তরপশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে অধিকতর সংখ্যায় হিন্দু ও মোগলপ্রহরিগণ কারাগৃহে পাহারা দিতে লাগিল। রাত্রিকালে সে ভীষণ দ্বিতীয় যম-গৃহ বন্ধ হইলে, তথা হইতে একটি পিপীলিকারও বাহির হইবার সাধ্য থাকে না। সেই জন্য চারি পাঁচ জন মাত্র হিন্দু-প্রহরী প্রথমরাত্রে এবং চারি পাঁচ জন মোগল প্রহরী শেষরাত্রে পাহারা দিত।

এই প্রহরিগণের মধ্যে একটা শ্রেণীবিভাগ ছিল। বিশ জন প্রহরী লইয়া একটি দল হইত, আর একজন তাহার অধিনায়কস্বরূপ থাকিত। এইরূপ পাঁচটা দলের, পাঁচজন অধিনায়কের উপর আবার একজন সর্দ্দার থাকিত। সর্দ্দার,—মুসলমান। সেই সর্দ্দারের নিকট কারাগৃহের চাবি-তালা থাকিত, কারাগৃহের সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখিয়া-শুনিয়া লইবার ভার তাহার উপর নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই সর্দ্দার মহাশয় যে বন্দীর প্রতি নেক-নজরে চাহিতেন, সে বন্দীর আর সুখের সীমা থাকিত না। কিন্তু তিনি যাহার প্রতি বাম হইতেন, তাহার আবার তেমনি দুর্দ্দশারও অবধি থাকিত না। এজন্য সর্দ্দারের অনুগ্রহ পাইতে সকলেই যত্নবান্ হইত।

শঙ্কর ইহা জানিতেন। তথাপি অন্যান্য বন্দীর ন্যায় তিনি সর্দ্দারকে অভিবাদন করিলেন না। সর্দ্দার তাহা দেখিল এবং মনে মনে শঙ্করের মুণ্ডপাত করিল। যে হিন্দু-প্রহরী সর্দ্দারের সঙ্গে আসিয়াছিল, সে ব্যক্তি সর্দ্দারের সহকারী। তাহাকে সকল প্রহরীর উপর পাহারা দিতে হইত, অধিকন্তু সর্দ্দারের সহায়তা করিতেও হইত। এজন্য এই হিন্দুপ্রহরী, মোগল-সর্দ্দারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিল।

মোগল-সর্দ্দার শঙ্করের নিকট আসিয়া বলিল,--

"তুমি না কম্মা এখানে আসিয়াছ? আর তোমার সঙ্গে না তোমার এক [illegible] চেলাটি কোথায়?"

[illegible] চক্ষু রক্তবর্ণ, স্বর কর্কশ, ভাষা শ্লেষপূর্ণ।

শঙ্কর। তিনি এই কোথায় গেলেন।

সর্দ্দার। এখন একবার তোমাদের শিল নুড়ি, গাছ পাথর—ঠাকুর ঠাকরুণদের স্মরণ কর, যদি রক্ষা পাও। নহিলে, এই শুভসংবাদ শোন।—তোমার পায়ে ও হাতে এই গহনা পরিবার হুকুম হইয়াছে।

শঙ্কর নির্ব্বিকারচিত্তে সেই শৃঙ্খল পরিলেন এবং অর্দ্ধস্ফুট হাস্যে সেই হিন্দু-প্রহরীর পানে চাহিলেন। হিন্দু-প্রহরী বলিলেন,—

"তোমার উচিত দণ্ডই পাইয়াছ। রাজার প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ!—রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র!"

এমন সাদাসিদা কথায় সর্দ্দারের বড় একটা ভ্রূক্ষেপ নাই;—তিনি আপনার কাজে মন দিলেন। দূরে কুমারকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"জাঁহাপনা! এ নফর আপনাকে কুর্ণিশ করিতেছে।"

কুমার রহস্য কিছু বুঝিলেন না। নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

সর্দ্দার। ভাবনা কি! এ হাবুসখানা,—এ রাজ-পাট,—যাহা বলেন, সকলি আপনার! খোদাবন্দ সরকার বাহাদুর সের খাঁ আপনার উপর বড় সন্তুষ্ট। শুনিয়া সুখী হইবেন,—তিনি হুকুম দিয়াছেন,—আজ হইতে তৃতীয় দিবসে কাফেরের দেহ কবরে গাড়িয়া ফেলা হইবে! মহাশয়ের ত দেখি, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই,—যেন জামাতা শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া, গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইতেছেন!

কুমার। একবার বৈ ত দুইবার মরিব না—তার জন্য এত ভাবনা কি?

সর্দ্দার। বটে, বটে; তা বেড়ান্,—ভাল করিয়া বেড়ান্! আহা, দুই দিন বৈ ত আর এ দুনিয়ায় থাকিবার ঠাঁই হইতেছে না! (হিন্দু-প্রহরীর প্রতি) দেখ রামনিধি,—এই সেই বদ্‌বখত কাফের বিদ্রোহী! তুমি ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছ, তাহার এতদূর সাহস নাই;—কিন্তু এই ছোঁড়ার বুকের পাটাটা বড় বেশী দেখিতেছি!

তারপর কাণে কাণে বলিল,—"কিন্তু আমার অনুপস্থিতির কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিও না।"

রামনিধি খুব খানিকটা জিব কাটিয়া বলিল,—

"রাম! তাও কি হয়? কিন্তু একটা কথা এই,—ছোঁড়াটাকে শিক্‌লি পরাইলে না?"

সর্দ্দার। পরাইলে ভাল হয় বটে, কিন্তু সে হুকুম পাই নাই।

রামনিধি ইহা জানিত; তাই মোগল প্রহরীর অধিকতর বিশ্বাস-ভাজন হইবার উদ্দেশ্যে, তার এইরূপ মন-রাখা কথা বলিল।

সর্দ্দার প্রস্থান করিলে, সেই হিন্দু-প্রহরী স্মিতমুখে শঙ্করের নিকট আসিলেন। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ব্যাপারখানা কি? এ নূতন সাজ কেন?"

রামনিধি। এইরূপ হুকুম। এখন কি ভাবিতেছেন? পলাইতে ত হইবে? নহিলে দিনদিন এই খাম্‌খেয়ালী নূতন নূতন হুকুম!—শুনিয়াছেন, কুমারের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে?'

শঙ্কর। (সচকিতে) সত্য নাকি? কুমার এ কথা শুনিয়াছেন?

রাম। হাঁ; কিন্তু সে জন্য তাঁহার একটুকুও উদ্বেগ নাই।—ধন্য সাহস!

শঙ্কর। তার পর?

অন্য এক প্রহরী আসিল। রামনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি চাও?"

প্রহরী। দুই জন বন্দী আমার কথা শুনিতেছে না। আমায় তাড়া করিয়াছে।

রামনিধি। কেন?

প্রহরী। কি একটা গোলযোগ হইয়াছে। কেহ কাজে মন দেয় না,—কেবল কি পরামর্শ আঁটিতেছে। আমি যদি ভয় দেখাই, তাহাও গ্রাহ্য করে না।

রাম। আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাইতেছি।

প্রহরী চলিয়া গেল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ আবার কি?"

রাম। কুমারের খেলা! সে জন্য ভাবি না। এই সর্দ্দার, রাত্রে প্রায়ই এখানে থাকে না, আজও থাকিবে না। চাবি আমারই হাতে থাকিবে। কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত মোগলপ্রহরীকে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে, উদ্ধারের উপায় নাই।—দেখি, কুমার কতদূর করিতে পারেন!

শঙ্কর। কুমার বলিয়াছেন, আজ কারাগারের ঐ দক্ষিণ-প্রাচীরে বসিয়া গান গায়িবেন। আশা করি, সে সময় সমস্ত প্রহরী ঐ দিকে যাইবে। আর তখনি আপনার সুন্দর অবসর!

রাম। কিন্তু সকলে যদি না যায়?

শঙ্কর। আপনি তাহারও উপায় করিবেন। আমি বাহির হইতে না পারিলে ত কোন সুবিধা করিতে পারিব না। ভরসা করি, আপনা হইতেই এ কার্য্য সমাধা হইবে। নহিলে এ বিপদকালে, এ ভীষণ শত্রু-পুরীতে আপনাকে বন্ধুরূপে পাইব কেন? আমি হিন্দু, আপনিও হিন্দু,—আপনি আমাদের উদ্ধার না করিলে, আর কাহার দ্বারা এখানে

সে আশা করিতে পারি? আপনার এ উপকার—এ মহৎ আত্মত্যাগ আমরা জীবনে ভুলিব না।

রাম। সে কথা যাক্।—আমি আপনাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া অস্ত্রাদি দিলে, আপনি আপনার পথ পরিষ্কার করিতে পারেন কি না?

শঙ্কর হাসিয়া বলিলেন,—"মা ভবানীর প্রসাদে, তখন এই হতভাগা বন্দিগণকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে পারিবে।"

রাম। সে কি? কুমার ইহাদিগকেও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে নাকি? কিন্তু ইহারা পলাইতে সম্মত আছে? গোলযোগটা কিন্তু কিছু অধিক হইবার সম্ভাবনা।

শঙ্কর। কিছু ভাবিবেন না। সে সমস্ত আমি ঠিক করিয়া লইব। কিন্তু আজ কালের মধ্যে যাহা হয় করিতে হইবে। এ খাম্‌খেয়াল মোগলকে বিশ্বাস নাই,—কখন্ কি করিয়া বসে!

রামনিধি কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন, দুই একজন বন্দীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া গেলেন। যাহারা গোলমাল করিতেছিল, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াও গেলেন।

সন্ধ্যার সময় কুমার আসিয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ শঙ্করকে প্রণাম করিলেন। শঙ্কর আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"মা ভবানী তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। শঙ্কর ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিলেন,—

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিত ললিত বনমাল। জয় জয়, দেব হরে॥
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস। জয় জয় দেব হরে॥

কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ। জয় জয়, দেব হরে॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান। জয় জয়, দেব হরে॥ *

গান শুনিয়া দরদর ধারে কুমারের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া, তিনি বলিলেন,—

"হে মহাত্মন্! আপনার এই সুধাময় কণ্ঠে এই সুধাময় গান শুনিয়া, আমি মোহিত হইয়াছি। ধন্য তিনি,—যিনি এই গান রচনা করিয়াছেন! আর ধন্য সেই মহাত্মা,—যিনি এই গান গাহিয়া শত শত লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন!"

কিছুক্ষণ পরে রামনিধি আসিয়া কুমারকে বলিয়া গেলেন,—"আজিও পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় আপনি গান গাহিবেন,—কিন্তু এক স্থানে বসিয়া নহে। গানের সুর যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রাচীর হইতে পড়িয়া যাইবার আপনার কোন সম্ভাবনা নাই। আপনি, যে কৌশল অবলম্বন করিয়া মোগলের চক্ষে ধূলি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন কৌশল সকলের মাথায় আসে না। আপনার সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা শতমুখে করিতে হয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, কারাগৃহের ভিতরে কোন প্রহরীর থাকিবার ব্যবস্থা নাই।—বাহিরেই তাহারা পাহারা দিতে পায়। যাইহোক, আপনার কৌশলে আজ আমি এই মূর্খ মোগলকে ঠিক পাইয়া বসিব।"

তাহাই হইল। সেই গভীর নিশীথে, সেই উচ্চ বাতায়নে বসিয়া, তেমনি মোহিনী মূর্ত্তিতে, সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া, কুমার গান গায়িতে লাগিলেন। সেই নিটোল ললাট, প্রশান্ত আঁখিযুগল, পরিপূর্ণ গণ্ডস্থল, অপূর্ব্ব মুখাবয়ব,—আ মরি মরি! কুমারের কি অপরূপ রূপ! এই

রূপের উপর আবার সেই বীণাবিনিন্দি কণ্ঠস্বর!—কুমার গাহিতে লাগিলেন,—

"প্রেমের মানুষ পাব ব'লে এসেছি আমি ধরাতলে।
কে আছ প্রেমিক সুজন, এস ব'স হৃদ্-কমলে।
প্রাণে প্রাণে মিশে রব, দু'য়ে এক হ'য়ে যাব,
নিতুই নূতন ভাব দেখাব, কেনা রব বিনা মূলে॥"

মোগলপ্রহরী, এই গান শুনিয়া, একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল; তাহার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। রামনিধি সহসা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"তোমরা সাবধান হও, পশ্চাতে কি একটা আতঙ্কজনক গোলমাল শুনিতেছি।"

সকলে পশ্চাৎ ফিরিল, কিন্তু কোথাও কিছু নাই। রামনিধি তথাপি বলিলেন,—

"আমার কাণে কিন্তু এখনও কোলাহল আসিতেছে।"

সকলে অন্যমনস্ক ও কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন;—আর পরী সেই অবসরে সহসা প্রাচীর হইতে অবতরণ করিল।

সকলে চাহিয়া দেখিল, কৈ, পরী ত আর সেখানে নাই? সে বাতায়নে ত কিছুই নাই। তবে এ কি, ভৌতিক-ক্রীড়া?

আবার ঐ দূরে চাহিয়া দেখ, প্রাচীরের উপর কে দাঁড়াইয়া আছে। মুক্ত কেশরাশি পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, রূপে চারিদিক্ আলোকিত হইয়াছে। ঐ পরী না?—হাঁ।—এবার মোগল প্রহরিদল ব্যগ্রভাবে ছুটিল, আশা—পরীকে ধরিবে! কিন্তু সাধ্য কি! নিকটে যাইয়া দেখিল, পরী দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার পা ত দেখা যায় না! একজন দেখিল, পরীর পাখা দু'খানি জ্যোৎস্নায় মিশিয়া ক্রমেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! তখন তাহাদের একটু একটু করিয়া ভয় হইল।

ভয়ে তাহারা ফিরিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সর্দ্দার প্রহরী ফিরিল না, সে দাঁড়াইয়া রহিল। করযোড়ে বলিল,—

"হে পরিজান্! তুমি আমাকেই মেহেরবাণী কর! আমার দীল্ তোমা বিনে বুঝি আর থাকে না!—সত্যি বল্‌চি, ভাই!"

পরী কথা কহিল না, ঈষৎ হাসিল। সে হাসিতে মুক্তা ঝরিল। দূর হইতে কে, প্রহরীকে ডাকিল। সে যেমনি সেদিক পানে চাহিয়া দেখিবে, পরীও অমনি সেই সুযোগে দ্রুতপাদবিক্ষেপে আর এক দিক্ দিয়া অদৃশ্য হইল।

আবার দেখ,—পরী আর একস্থানে বসিয়া, চন্দ্রকিরণে কেশরাশি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, মৃদু মৃদু গাহিতেছে;—

"প্রেমের মানুষ পাব ব'লে এসেছি আমি ধরাতলে।
কে আছ প্রেমিক সুজন, এস ব'স হৃদ্-কমলে॥"

এবার আর কেহ নিকটে যাইতে সাহস করিল না। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রহরিগণের মধ্যে প্রায় সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল যে, সত্য সত্যই পরী কি প্রেতযোনির আবির্ভাব হইয়াছে। যাহারা কেবল পরীকে দেখিবে কথা ছিল, তাহারা আজও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে কোন উপায়ে হউক, পরীকে ধরিবে।

রামনিধি বলিল,—"ভাই সব, যদি তাহাকে ধরিতে চাও, তবে অস্ত্রাদি কেহ সঙ্গে লইও না,—কেন না তাহা দেখিলে পরী ভয়ে পলাইবে; কেহ তাহার নিকটেও যাইও না। কি জানি, কিছু অনিষ্টও করিতে পারে।"

মোগল-প্রহরী। তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। কিন্তু পরী ত কারাগৃহের বাহিরে আসে না?

রামনিধি। আমার বোধ হয়, কাল আসিত;—তোমাদের গোল-যোগে ঐ প্রাচীর হইতেই পলাইয়াছে।

এইরূপ নানা কথায় সেই মোগল প্রহরিগণকে ভ্রম-বিশ্বাসে অন্ধ করিয়া, এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনিয়া, রামনিধি নিশ্চিন্ত হইলেন।

তখন তিনি কারাগৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়া,—যেখানে শঙ্কর নিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত,—সেইখানে উপস্থিত হইলেন। শৃঙ্খলা-বদ্ধ, ভগবদ্ভক্ত মহাপ্রাণ শঙ্কর,—তখন ধ্যাননিমীলিত নেত্রে,—সেই সিংহবাহিনী, অসুরনাশিনী দশভুজামূর্ত্তি মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে-ছিলেন;—রামনিধি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ভক্তের সেই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া

রোমাঞ্চিত কলেবর হইতেছিলেন। শঙ্করের এই মানসপূজা শেষ হইলে, রামনিধি বলিলেন,—

"আজ সব ঠিক। আপনাকে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিব, অস্ত্রাদিও দিব। পারেন, এই বন্দিগণকে সঙ্গে লইবেন,—নচেৎ আপনি একাকীই যাইবেন।—আপনার জীবনের মূল্য অনেক। কুমার ঐ পরীবেশ ধরিয়াই কারাগার হইতে বহির্গত হইবেন। কিন্তু তাঁহাকে নিরস্ত্র থাকিতে হইতেছে, এই জন্য আমার কিছু আশঙ্কা। যদি সহসা কোন মোগল সন্দেহ করিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে, তবে বড়ই গোল।"

শঙ্কর। আমি কুমারের পশ্চাতে থাকিব। যদি হাতে তরবারি থাকে, তবে ভবানীর প্রসাদে, আমাদের আশঙ্কা খুবই কম জানিবেন। আপনি তবে আমাদের সঙ্গে থাকিতেছেন না?

রাম। না, লোকে সন্দেহ করিবে। যা হোক, আমি শীঘ্রই আপনাদের সহিত মিলিত হইব। বন্দিগণকে রাজমহলের প্রকাশ্য পথ না ধরিয়া, গোপনে যাইতে আদেশ করিবেন। এখন এই পর্য্যন্ত। আপনারা প্রস্তুত হউন।

রাত্রিকাল। পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি। আকাশ নির্ম্মল। কুমার একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি বাঁধিয়া তাঁহার বস্ত্রাদি লইলেন,—কেবল পরিধেয় বসনখানি স্ত্রীলোকের মত করিয়া পরিলেন। তিনি শঙ্করের সম্মুখে আসিলেন না, মনে মনে বলিলেন—"ছি! লজ্জা করে।"

এ দিকে শঙ্কর সকল বন্দীকে চুপি চুপি উপদেশ দিয়া সব ঠিক করিয়া রাখিলেন। বন্দিগণ কুমারের স্ত্রীবেশ দেখিয়া কাণাকাণি করিল,—"এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক।" কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ সে কথা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইল না।

দেখিতে দেখিতে দুই প্রহর রাত্রি অতিবাহিত হইল। আজ আর

কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। কাহারও মনে ভয় হইতেছে,—'না জানি কি বিপদই উপস্থিত হয়!' কাহারও মনে আশা ও আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে,—'আহা! এতদিনে আবার স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিব।' কেহ বীরহৃদয়ে নাচিয়া উঠিল,—'এই নরক হইতে উদ্ধার পাইলে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শরণাপন্ন হইব, আর তাঁহার আজ্ঞায় মোগলবিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মনের কালি মুছাইব।' শঙ্কর একান্ত-মনে ভগবানকে ডাকিতেছিলেন। আর কুমার?

কুমার নিভৃতে বসিয়া ভক্তিভরে সেই অগতির গতিকে স্মরণ করিতেছিলেন,—

"হে দুর্ব্বলের বল,—অসহায়ের সহায়! তুমি তোমার আশ্রিতাকে রক্ষা করিও। আমি ক্ষীণপ্রাণা বঙ্গরমণী,—যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহা আমার পথ নহে। অন্তর্য্যামী তুমি,—এই হৃদয় তুমি দেখিতে পাইতেছ!—সূর্য্য-কান্ত হইতেই এই হৃদয় ফাটিয়া, এই প্রেম-নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইয়াছে! প্রভু! এই প্রেমব্রত কি নিষ্ফল হইবে? আজ আমার ভয় হইতেছে,—কি করিয়া সকল দিক্ রক্ষা করি!—দয়াময়! তুমিই সেই পাপ কৌরব-সভায় বিবসনা দ্রুপদতনয়ার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলে,—আর আজি তোমার এই দুঃখিনী কন্যারও লজ্জা রাখো প্রভু! আমি তোমারই চরণে শরণ লইলাম। জীবন যায় যাক্,—জীবন তুচ্ছ; কিন্তু কলঙ্ক বড় মর্ম্মপীড়ক; —দয়াময়! আর কিছু না হোক্, যেন কলঙ্কশূন্য হইয়া মরিতে পারি।"

কুমারের চক্ষে ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। সেই ভক্তি-অশ্রু নির্গত হইবার পর মন অনেকটা সুস্থির হইল।

তখন পরীর আবার সখ্ চাপিল। প্রাচীরে উঠিয়া, পরী সুধাকণ্ঠে এক গান ধরিল! নৈশ নিস্তব্ধতায় সেই সুমধুর সঙ্গীত,—কামান্ধ মোগলকে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন করিয়া ফেলিল।

তা, ফুলজানির এইসব কাণ্ড, আমায় যে এত স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে হইবে, তা ভাবি নাই। ফুলজানি নহিলে, এত সাহস আর কার? এত বুদ্ধি কার?—বিপদে স্থির, কার্য্যে উৎসাহময়ী, দুঃখে অবিচলিতা,—এমন আর কে? যদি কেহ না বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারই জন্য বলিয়া দিলাম,—ফুলজানি এই ভাবেই তাহার ব্রত পালন করিতেছিল! কিন্তু এখন উদ্বোধন মাত্র।

সকল মোগল একত্রে সেইদিকে,—যেখানে প্রাচীরের উপর বসিয়া, চরণ দু'খানি ঝুলাইয়া দিয়া, সুনীল নির্ম্মল আকাশপানে তাকাইয়া, পরী গান গায়িতেছিল,—সেইদিকে সমবেত হইল। পরীর বস্ত্রাঞ্চল বাতাসে চঞ্চল হইয়া উড়িতে লাগিল; মূর্খ মোগল ভাবিল,—পরীর পাখা দু'খানি শূন্যে বিস্তারিত হইতেছে।

এই অবসরে রামনিধি নিঃশব্দে কারাগৃহের দ্বার উন্মোচন করিলেন। দেখিলেন, সকলেই তাঁহার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে। তিনি অগ্রে শঙ্করের শৃঙ্খল খুলিয়া দিলেন। শৃঙ্খলমুক্ত শঙ্কর আবেগপূর্ণ হৃদয়ে রামনিধিকে আলিঙ্গন করিলেন।

তারপর তিনি ইঙ্গিতে কুমারকে জানাইলেন,—"সব ঠিক হইয়াছে।"

কুমারের বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ শব্দ হইতে লাগিল।

রামনিধি বাহিরে আসিয়া, বন্দুকের একটা আওয়াজ করিল। সকলে চমকিয়া উঠিল। মোগল-প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—"একি! হঠাৎ তুমি বন্দুকের আওয়াজ করিলে কেন?"

রামনিধি। কে যেন অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সহসা এই পথ দিয়া দৌড়িয়া গেল।—আমার গুলি ব্যর্থ হইয়াছে।

সকলে চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিল।

পরী সেই অবসরে সহসা নামিয়া পড়িল, এবং কারাগৃহের ভিতর

দিয়া উন্মুক্ত দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর কম্পিতচরণে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহরিগণ তখন অন্য প্রান্তে ছিল,—কিছুই বুঝিল না।

কিয়দ্দূর গিয়াই পরী,—পরীর মতই দ্রুতপদে যাইতে যাইতে বড় মধুর সঙ্গীত ধরিল। সেই গান তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিতে লাগিল। চারিদিকে বৃষ্টিধারার ন্যায় সেই সঙ্গীত-সুধা ছড়াইয়া পড়িল ;—

"যাই—যাই—যাই, হ'য়েছে সময়,
কে আছ পিপাসী এস ত্বরা যাই।
অমৃত পানে, অভিলাষী যে,
এস এস এস—এস গো সে ॥
কি ফলে বলো গো প'ড়ে আছ হেথা,
বিফলে অব্যাজে পাও মনোব্যথা ;
প্রেম-সাগরে সাঁতারিবে যদি,
সব ভুলে তবে এস গুণনিধি——"

মোগলপ্রহরিগণ দূর হইতে দেখিল,—পরী অতি দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে, আর সেই সুমধুর সঙ্গীতে চারিদিকে সুধাবৃষ্টি হইতেছে। তখন সেই সর্দ্দার প্রহরী সকলকে বলিল,—

"ভাই সব, যে যাহা চাও তাহাই দিব,—আমার সঙ্গে আইস। রামনিধি পাহারা দিবে,—কোন গোলযোগ হইলেই আওয়াজ করিবে,—আমরাও তখন উপস্থিত হইব।"

তখন সকলে মিলিয়া, পরীর অনুসরণ করিল। কিন্তু, পাছে পরী ভয়ে পলাইয়া যায়, এজন্য কেহ নিকটে গেল না,—দূরে দূরে তাহার অনুসরণ করিল।—পরী কোথায় থাকে, অগ্রে তাহা দেখিয়া আসিবে!

ইত্যবসরে শঙ্কর সকল বন্দীকে সঙ্গে লইয়া, কারাগৃহের বাহিরে আসিলেন, এবং রামনিধি যে পথ দেখাইয়া দিলেন, সেই পথ ধরিয়া

বরাবর চলিয়া গেলেন। রামনিধি বলিলেন, "আমার জন্য ভাবিবেন না। আজি হউক বা কালি হউক, আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইব। আমি সঙ্কেত করিলেই মোগলগণ ফিরিয়া আসিবে,—আর আপনি সেই অবসরে কুমারকে সঙ্গে লইবেন।"

শঙ্কর গভীর কৃতজ্ঞহৃদয়ে রামনিধিকে ধন্যবাদ করিয়া, ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বন্দিগণকে অগ্রে অগ্রে দিয়া, শঙ্কর নিষ্কাশিত অসিহস্তে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এক এক করিয়া, বন্দিগণ নিঃশব্দে রাজমহলের প্রকাশ্যপথে উত্তীর্ণ হইলে, রামনিধি আসিয়া শূন্য কারাগৃহ বন্ধ করিলেন, এবং তাহার চাবি একটা কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তার পর, কারাগৃহের পার্শ্বেই যে সুবিস্তৃত খুব একটা ফর্‌দা জায়গা,—সেইখানে বন্দুকের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, আকাশপানে চাহিয়া, ভাবিতে লাগিলেন,—

"কাজটা কি ভাল হইল?—ইহা কি দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা নহে? যখন প্রাতে সকলে দেখিবে এইরূপ হইয়াছে,—কি ভাবিবে? কিন্তু মোগল এতটা অত্যাচারী না হইলে, এমনটা ঘটিত না।—এত দিনে আমার কতক মনঃকষ্ট ঘুচিল।"

রামনিধি বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। আবার—আবার আওয়াজ করিলেন। তথাপি মোগলপ্রহরী ফিরিল না। তখন পুনঃ পুনঃ আও-য়াজ করাতে, সেনা-নিবাসেও আওয়াজ করিয়া, কে তাহার প্রত্যুত্তর দিল। সেনাপতি লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি! এত রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজ কেন?" ইত্যবসরে মোগল প্রহরিগণ দ্রুতপদে সেখানে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহাদের সর্দ্দার ফিরিল না।

রামনিধি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,——

"সেনাপতিকে গিয়া এখনই খবর দাও, সমস্ত বন্দী কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে! সর্দ্দার এখানে উপস্থিত নাই, চাবি তাহার নিকটে;—আমি যতদূর দেখিয়াছি, বন্দীদের কোন সাড়া পাই নাই। নিশ্চয়ই তাহারা কোন বিশেষ উপায়ে পলাইয়াছে।"

মোগল প্রহরিগণ অন্তরে মহা প্রমাদ গণিল। তাহারা যে উপস্থিত ছিল না, সে কথা এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে,—তখন সের খাঁ আর উপায় রাখিবে না। তার পর সকলে ভাবিল,—"হঠাৎ এ কি হইল? সত্যই কি সমস্ত বন্দী পলাইয়াছে?"

একজন অতি কষ্টে উচ্চ প্রাচীরে উঠিয়া, অনেক ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি করিল, কিন্তু কাহারও কোন সাড়া পাইল না।

ভয়ে তাহাদের মুখ শুকাইল। রামনিধি বলিলেন,—"এখন উপায়?"

সেনাপতির লোক গিয়া তাহার প্রভুকে সকল কথা জ্ঞাপন করিল। তখন চারিদিকে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

ক্রমে সের খাঁর নিকটও এ সংবাদ পঁহুছিল। তিনি কোপ-প্রজ্বলিত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—'কারারক্ষিগণকে সেই কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হউক, এবং সৈন্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, এখনই সেই পলাতক বন্দিগণের সন্ধানে প্রেরণ করা হউক।' সেনাপতি তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু রামনিধির সহিত একটু পরামর্শের আবশ্যক হইল। রামনিধির পাথরে পাঁচকিল!—যে পথে বন্দিগণ গিয়াছে,—তাহার বিপরীত পথ দেখাইয়া দিয়া, কৌশলপূর্ব্বক তিনি বলিলেন,—"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—বন্দিগণ এই পথ ধরিয়াছে।"

ইহার পরিণাম যাহা হইল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। দুই দিনের পথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও, সৈন্যগণ একটিও বন্দীর সন্ধান পাইল না,—তাহারা নিরাশ অন্তরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

মোগল-প্রহরীর সেই সর্দ্দারের দশা কি হইল, এখন দেখা যাক্।

কুমার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, এখনও পর্য্যন্ত সেই প্রহরী তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তখন তিনি ভিন্ন পথ ধরিলেন। কত তৃণাঙ্কুর সেই কোমল চরণে বিদ্ধ হইল, কত কণ্টকে সে কমনীয় দেহ ক্ষত বিক্ষত

হইল,—কুমার তথাপি চলিয়াছেন। অতি দূরে দেখিলেন, বহুসংখ্যক লোক চলিয়াছে;—কাঁহারও মুখে কোন কথা নাই,—নিঃশব্দে চলিয়াছে। পশ্চাতে একজন নিষ্কাসিত অসিহস্তে চলিয়াছে। তখন কুমারের সাহস হইল, আনন্দে প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি মনে মনে ভগবান্‌কে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। প্রহরীর সর্দ্দার মহাশয় ভাবিলেন,—"এত পথ আসিলাম,—জ্যোৎস্নার আলোও নিবিয়া আসিয়াছে,—পরী ত একটা কথাও কহিল না! হায় রে! পোড়া নশিব!—ঐ না দূরে অগণিত লোক দেখিতেছি?—উহারা কাহারা? পরী ত ঐ দিকেই চলিয়াছে। আমি কি আর যাইব?—হাঁ, যাইব বৈ কি!—মরিতে হয় সেও ভাল,—তথাপি যাইব!"

কিন্তু, সহসা একি?—একটা বনের মধ্যে গিয়া পরী বাতাসে মিলাইয়া গেল না?

তখন জ্যোৎস্নার আলো নিবিয়া গিয়াছে, অরণ্যানীর মধ্যে গাঢ় অন্ধকার, চারিদিকে জঙ্গল ও কাঁটা-গাছ,—ও হো, হো! পরী তাহাকে কোথায় আনিল? ভয়ে প্রহরীর অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল। তখন তাহার মনে হইল,—"এ নিশ্চয়ই হিঁদুর প্রেত, নহিলে গরীব মোগলের উপর এ অত্যাচার করিবে কেন?"

ভয়ে প্রহরী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কুমার তাহা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি চকিতে পুরুষ সাজিয়া, দ্রুত আসিয়া, শঙ্করের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। শঙ্কর আনন্দে বাহু প্রসারণ করিয়া, যেমনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, কুমার অমনি দশ হাত পশ্চাতে গিয়া বলিলেন,—

"এই কি প্রশংসার সময়, না আনন্দ প্রকাশের অবসর? আসুন, এখন মুক্তকণ্ঠে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, বিপদ-ভয়হারীর নামগান করি।"

ভগবদ্ভক্ত শঙ্কর তখন অতি উচ্চমধুরকণ্ঠে, অপার আনন্দে ভগবান্‌কে

ডাকিতে লাগিলেন। কুমারও তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্দিগণও গাহিতে লাগিল ;—

"নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ হে!
দুস্তরে নিস্তার করিলে হে।
মহিমা রাখিলে, সঙ্কটে তারিলে,
করুণা দেখালে কৃপাময় হে।
বহিছে নয়নে ধারা, উথলে হৃদয়ে প্রেম,
কি ভাবে তোষিব তোমারে হে।
বাক্য-জ্ঞান অতীত, ভাবরূপ চরিত,
তোমাতে অর্পিত যা কিছু আমার হে।
প্রেমময়, প্রাণেশ্বর, হে নিখিল-নির্ভর,
নাশ' অহং বুদ্ধি হরি, এই আকিঞ্চন হে॥"

সেই নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, সেই নির্জ্জন প্রান্তর পূর্ণ করিয়া, ভক্তের এই গান—চারিদিক্ প্লাবিত করিল।

বন্দিগণসহ শঙ্কর ও কুমার যথাদিনে যশোহরে উপনীত হইলেন। সূর্য্যকান্ত পথ হইতেই শঙ্কর প্রভৃতির মুক্তিলাভের এই শুভ সংবাদ পাইয়াছিলেন,—তিনিও হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিলেন। শঙ্করের সহিত প্রতাপ ও সূর্য্যকান্তের তখন আলিঙ্গনের ধূম পড়িয়া গেল। শঙ্কর, কুমারকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রতাপ! এই বালকরূপী কৌশলীবীর আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন! মা-শঙ্করী ইহাঁকে রাজমহলে না পাঠাইলে, আমার উদ্ধার অসম্ভব হইত।"

তখন শঙ্কর একে একে সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। শুনিতে শুনিতে প্রতাপের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,—

"ভাই কুমার! আজ হইতে তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর হইলে। যাহা শুনিলাম, সহজে কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবে না। যদি

বাঁচিয়া থাকি, তোমায় ভুলিব না। যদি কখন মোগলের গ্রাস হইতে সমগ্র দেশকে উদ্ধার করিতে পারি, তবেই জন্ম সার্থক। কিন্তু জানিব, তুমিই তাহার মূল। এস ভাই, একবার প্রাণ ভরিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হই।"

কুমার প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার দয়াই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি মাত্র,—তার বেশী কিছুই নহে। আজ আপনাকে দেখিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। বাল্যকাল হইতে সাধ ছিল,—হিন্দুর এই সৌভাগ্য কি দেখিতে পাইব না? এতদিনে আশা হইয়াছে, আপনা হইতে সে সাধ পূর্ণ হইবে। মহারাজ! আমি কোন কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছি;—আত্মপ্রশংসা শুনিতে যেমন আমার নিষেধ, সেইরূপ প্রশংসার অনুরূপ এই আলিঙ্গনও, উপস্থিত আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। রাজ-অনুগ্রহই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার।"

প্রতাপ। ভাল, তাহাই হউক। বলিবে,—তোমার ব্রত কি?

কুমার। যদি ঈশ্বর দিন দেন, তবে তাহা আপনার অগোচর থাকিবে না।

প্রতাপ নিজ-ব্যবহৃত একখানি অসি ও সুন্দর একটি বীরপরিচ্ছদ কুমারকে উপহার প্রদান করিলেন,—বলিলেন, "আশা করি, তুমি এ অসির সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করিবে।"

কুমার নতজানু হইয়া, তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদ যেন সার্থক হয়।"

কুমার প্রস্থান করিলেন।

সূর্য্যকান্ত—স্তম্ভিত, বিস্মিত, নির্ব্বাক্!

প্রতাপ বলিলেন,"ভাই শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত! এই বালকটি কি তেজস্বী!

আমার বোধ হইতেছিল, যেন একখণ্ড প্রজ্বলিত আগুন আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছে!—ভবিষ্যতে এই বালক বীরাগ্রগণ্য হইবে।"

শঙ্কর। আমিও যখন প্রথমে ইহাকে সের খাঁর দরবারে দেখি, তখন আমারও ঐরূপ মনে হইয়াছিল।—এত সাহস, এত তেজ, এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! তার উপর আবার এমন রূপ,—এমন মধুর কণ্ঠ!—সূর্য্যকান্ত, তুমি কি ইহাকে কখন দেখিয়াছ?

সূর্য্যকান্ত একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয়, আমি এইরূপ একটি বালিকাকে দেখিয়াছিলাম।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও পাগল হইলে নাকি? মোগলেরা ত 'পরীজান্—পরীজান্' করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিল! তুমিও তাহাই হইবে নাকি?—তুমি কি বলিতে চাও, বঙ্গের কোন বীর-রমণী এমনই ছদ্মবেশে ঘুরিয়া, এই কাজ করিতেছেন?"

সূর্য্যকান্ত। তাই বা বলি কেমন করিয়া?—আমি কিন্তু এই বালকের সবিশেষ অনুসন্ধান লইব।

প্রতাপ। যদি তাহাই হয়, কেহ লজ্জিত হইও না। 'বঙ্গের রমণী আমাদের উদ্ধার করিল,'—এ কথায় লজ্জায় অধোমুখ হইবার কারণ দেখি না। যদি এই বালক, ছদ্মবেশিনী কোন রমণী হয়, তবে ইহার এই মহৎ কার্য্যে কেহ কোনরূপ বাধা দিতে না পারে, তাহা আমাকে দেখিতে হইবে।

রাজমহলের সেই বন্দিগণ প্রতাপের অধীনে কার্য্য পাইল। অনেকে চিরদিনের জন্য যশোহরে গৃহাদিও বাঁধিল, এবং স্ত্রী-পুত্র লইয়া আসিয়া, সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সের খাঁ বুঝিল, শিকার হাত-ছাড়া হইয়াছে,—বন্দী তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিয়াছে।—সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট্ কয়েদখানা একেবারে শূন্য হইয়াছে। ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

কিন্তু ক্ষোভ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসা-বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। সের খাঁ সম্রাটের অনুমতি লইয়া, বঙ্গীয় বীরের দমনার্থ যুদ্ধঘোষণা করিল। যথাদিনে বিপুল বাহিনী সঙ্গে লইয়া, অদম্য উৎসাহে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইল। সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করিল,—"সেই দস্যুর সর্দ্দার প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার দলবল সকলকে বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিব,—তবে আমার নাম সের খাঁ!"

এদিকে গুপ্তচর গিয়া প্রতাপকে সংবাদ দিল,—"মহারাজ! শত্রু দ্বারে উপস্থিত প্রায়,—আপনি প্রস্তুত হউন।"

দূরদর্শী প্রতাপ অগ্রেই ইহা বুঝিয়াছিলেন। এখন আরও বুঝিলেন,—মোগল-রক্তে বঙ্গভূমি প্লাবিত করা অনিবার্য্য।

যে হিন্দু প্রহরী রামনিধি, কারাগার হইতে অন্যান্য বন্দিগণের সহিত শঙ্কর ও কুমারকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বেই রাজমহল হইতে যশোহরে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রতাপ তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একজন প্রধান সদস্যের পদে বসাইলেন।

এদিকে, যমুনার পর-পারে সমরানল প্রজ্বলিত হইল।

প্রতাপ-সৈন্য দুই দলে বিভক্ত হইল। একদলের অধিনায়ক

হইলেন,—মহাবীর শঙ্কর; অন্যদলে সূর্য্যকান্ত, সুন্দর, মদন প্রভৃতিকে লইয়া স্বয়ং প্রতাপাদিত্য মূর্ত্তিমান্ যমের ন্যায় সংহার-মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন। ঝম্ ঝম্ রবে রণ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। প্রতাপ জলদ্‌গম্ভীরস্বরে উত্তেজিত হিন্দু-সৈন্যগণকে কহিয়া উঠিলেন,—

"ভাই সব, একবার কালী কালী বল,—একবার মা মা বলিয়া ডাক,—একবার প্রাণ ভরিয়া দুর্গানাম কর! দেখ, যাহারা ধর্ম্মের শত্রু,—দেবতার শত্রু,—হিন্দুর শত্রু,—সেই দুর্দ্দান্ত মোগল তোমাদের দেশ লুঠিতে আসিয়াছে! একবার বৈ দুইবার মরিতে হইবে না,—অতএব তোমরা মরণভয় তুচ্ছ করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হও! ঐ দেখ, মা-দনুজদলনী বিমানে আবির্ভূত হইয়া, মাভৈঃ মাভৈঃ রবে তোমাদিগকে আশ্বাস দিতেছেন!—মাগো! ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর।"

এই বলিয়া মহাবল প্রতাপ অমিতবিক্রমে মোগল সৈন্যমধ্যে ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিলেন। হিন্দু-সৈন্যগণ গভীর রোলে 'কালী কালী' বলিতে বলিতে,—'জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়' উচ্চারণ করিতে করিতে, প্রতাপের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। চারিদিক হইতে 'মার্—মার্'—'কাট্—কাট্' ধ্বনি উঠিল।

কিন্তু এই সময়ে চকিতমাত্রে শঙ্কর ও প্রতাপের মধ্যে পরামর্শ হইল,—উপস্থিত একদল সৈন্য লুক্কায়িত থাকুক। শঙ্কর-সৈন্য অগ্রে যুঝিয়া মোগলের গতিরোধ করিবে এবং কৌশলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আপনাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিবে;—আর সেই অবসরে লুক্কায়িত প্রতাপ-সৈন্য সহসা তাহাদিগকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিয়া, তাহাদের সকল শক্তি হরণ করিবে।

ঝম্ ঝম্ রবে রণ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মোগলবাহিনী উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া, বিপুল বিক্রমে 'দীন্ দীন্' শব্দে, শঙ্কর-সৈন্যকে আক্রমণ

করিল। পূর্ব্ব-সঙ্কেতমত শঙ্কর, পরাজিত হইবার ভাণ করিয়া, মদমত্ত মোগলসৈন্যকে ক্রমশঃ এক দুর্গম জলাভূমি মধ্যে লইয়া চলিলেন। অল্পবুদ্ধি সের খাঁ বুঝিল, শত্রু রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণভয়ে পলাইতেছে। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি শঙ্কর যখন দেখিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে,—এখন অল্পায়াসেই তিনি রণজয়ী হইতে পারিবেন, তখন সহসা তিনি তাঁহার সেই বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে সংযত করিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিকট এক হুঙ্কার করিয়া, মুখে 'কালী—কালী' বলিয়া, উলঙ্গ অসিহস্তে মোগলের গতিরোধ করিলেন। সহসা তাঁহার সেই ভীম-ভৈরব-মূর্ত্তি দেখিয়া, সসৈন্য সের খাঁ কিছু বিস্মিত হইল। "মার্ মার্—কাট্ কাট্" শব্দে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া, এই সময় শঙ্কর এক সাঙ্কেতিক ভেরী বাজাইলেন। সেই ভেরীর স্বরে সহসা কোথা হইতে অগণিত অশ্বারোহী হিন্দু-সৈন্য আসিয়া, তাঁহার সহিত যোগদান করিল। সের খাঁ বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে দেখিল, স্বয়ং বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্য দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় রণ-প্রাঙ্গণে উদিত হইয়া, সেই অগণিত হিন্দু-সৈন্যের অধিনায়কত্ব করিতেছেন। চক্ষের নিমেষে শঙ্কর ও প্রতাপ-সৈন্য অমিত-বিক্রমে শত শত মোগলসৈন্য সংহার করিল। অধিকন্তু স্বয়ং প্রতাপ, শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত,—মূর্ত্তিমান্ যমের ন্যায় বহু মোগলের প্রাণনাশ করিলেন। মোগলের মুখ দিয়া শেষ 'আল্লা' নাম ফুটিবারও আর অবকাশ রহিল না, তাহারা অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া মরিতে লাগিল।

রণ-প্রাঙ্গণে রক্ত-গঙ্গা বহিল। সে উত্তপ্ত রক্তে পাদদেশ নিমজ্জিত হওয়ায়, অশ্বগণ বিকট হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিতে লাগিল। সের খাঁ বুঝিল, ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল হইয়াছে,—নিরর্থক আর এখানে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া, লোকক্ষয় করার লাভ নাই,—হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পলায়ন করাই এখন যুক্তিযুক্ত। সের খাঁ সঙ্কেতে আপন

সৈন্যগণকে মনোভাব জানাইল, এবং প্রাণভয়ে নক্ষত্রগতিতে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। আর এতটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া, সৈন্যগণও সেনাপতির পদানুসরণ করিল।

প্রতাপ ও শঙ্কর-সৈন্য বিজয়োল্লাস করিতে করিতে, মুখে 'কালী কালী' বলিতে বলিতে, সেই পলায়িত মোগল-সৈন্যের অনুসরণ করিল এবং তাহাদিগকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ তাড়া করিয়া, স্বস্থানে প্রত্যাগত হইল।

পরাজিত ও নির্য্যাতিত বহু মোগলের বহু যুদ্ধোপকরণ প্রতাপ হস্তগত করিলেন। এবং যথাসময়ে মনের আনন্দে, একান্ত ভক্তিভরে যশোহরেশ্বরীকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

বিদ্যুদ্‌গতিতে এ শুভসংবাদ বঙ্গের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। বঙ্গীয় রাজন্য-বর্গ এইবার সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতাপের পক্ষ সমর্থন করিলেন, এবং সকলেই আপন আপন শক্তি অনুসারে, মোগলবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

সম্রাট্ আক্‌বরের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় বীরের এই প্রথম যুদ্ধ,—ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এই বার সম্রাটের আসন টলিল। তিনি ইব্রাহিম খাঁ নামক এক-জন প্রধান সেনাপতিকে বহু সৈন্য-সামন্তের সহিত, প্রতাপের দমনার্থ বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। ইব্রাহিম মহা আড়ম্বরে, সম্রাটের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিল। যাইবার সময় দম্ভভরে মহা আস্ফালন পূর্ব্বক কহিয়া গেল, "জাঁহাপনা! হয়—সেই কাফেরের ছিন্নমুণ্ড ধর্ম্মাধিকরণে প্রেরণ করিব,—নয়, সেই নিমকহারামকে সদলবলে বন্দী করিয়া, প্রভুর সন্তোষ উৎপাদনে কৃতার্থ হইব।"

দিল্লী হইতে নৌকাযোগে আসিয়া ইব্রাহিম খাঁ প্রথমতঃ রাজমহলে আশ্রয় লইল। তথায় কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া এবং তথা হইতে আরও কতকগুলি মোগলসৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ইব্রাহিম সপ্তগ্রাম পঁহুছিল।

প্রতাপের গুপ্ত-চর প্রতাপকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। প্রতাপ অবিলম্বে শত্রুদমনের সকল আয়োজন সম্পন্ন করিলেন।

ইব্রাহিম ক্রমেই আরও অগ্রসর হইল,—কলিকাতার দক্ষিণ,—আধুনিক বঁড়িশা-বেহালার নিকট উপস্থিত হইয়া, শিবির সংস্থাপন করিল। এইখানে প্রতাপের 'রায়গড়' নামে এক দুর্গ ছিল। ইব্রাহিম প্রথমতঃ সেই দুর্গ অবরোধ করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরগণ তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। তাঁহারা নিশিযোগে মোগল-শিবিরে অগ্নিপ্রদান করিয়া, মোগলগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ইব্রাহিম ভাবিল,—"সামান্য এই দুর্গ-অবরোধের জন্য যদি সমস্ত সৈন্য নষ্ট করি, তাহা হইলে প্রতাপাদিত্য-দলনের আশা আর

থাকে না ;—সুতরাং এখানে অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া, সর্ব্বাগ্রে মাতলা-দুর্গ অবরোধ করাই যুক্তিসিদ্ধ। সুন্দরবনের দক্ষিণদিকস্থ ঐ মাতলা-দুর্গই প্রতাপের কেন্দ্রস্থল। মাতলা হস্তগত করিতে পারিলে, আর কোন ভাবনা থাকে না।"

ইব্রাহিমও সসৈন্যে মাতলা গমন করিলেন, আর সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণও তাহার অনুসরণ করিয়া প্রতাপের সহিত মিলিত হইলেন। ভাবিলেন, "মোগলসৈন্যের হৃদয়ে যেরূপ শঙ্কা উৎপাদন করিয়াছি, তাহাতে আপাততঃ আর ইহারা রায়গড় অবরোধ করিতে সাহসী হইতেছে না। এক্ষণে মাতলার জন্যই চিন্তা।—মা যশোহরেশ্বরী কি এ যাত্রাও রক্ষা করিবেন না?"

এদিকে মহাবল প্রতাপ ও শঙ্কর,—দুই সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া স্থলপথ আগুলিয়া রহিলেন ; আর সেই দুর্দ্ধর্ষ ফিরিঙ্গি রডা অগণিত সৈন্য সমভিব্যাহারে জলপথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সসৈন্য ইব্রাহিম মাতলার সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র, প্রতাপ স্বয়ং গম্ভীর গর্জ্জনে তোপ দাগিলেন,—গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুম্। বিপক্ষপক্ষও তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ কামানধ্বনি করিল,—গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুম্।

যথাসময়ে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। সুশিক্ষিত বঙ্গীয় হিন্দুসেনার হস্তে বহু মোগল ধরাশায়ী হইল। স্থলপথের যেখানে ধূলি ছিল, তাহা রক্ত-কর্দ্দমময় হইল, আর নদীর জল লাল হইয়া খরগতিতে বহিতে লাগিল। সে দিন প্রতাপ সত্যই যেন ভবানীর বরপুত্ররূপে সমরপ্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইয়াছেন, আর দনুজদলনী দাক্ষায়ণী যেন সত্যই তাঁহার সেনাপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন।

বঙ্গীয় বীরের এই অভাবনীয় পরাক্রম ও যুদ্ধকৌশল দেখিয়া, ইব্রাহিম বিস্মিত হইল। এইরূপে কয়দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল। জলপথে রডা-

প্রমুখ বীরগণ এবং স্থলপথে স্বয়ং প্রতাপ ও শঙ্কর প্রভৃতি রথিবৃন্দ অমোঘ প্রতাপে যুদ্ধ করিয়া,-প্রায় সমুদয় মোগল বিনষ্ট করিলেন। 'আর যুদ্ধ করা বৃথা,—এক্ষণে কোনরূপে প্রাণ লইয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ' ভাবিয়া, ইব্রাহিম যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিল। বিজয়ী হিন্দুসেনা মনের আনন্দে দুর্গা-নাম করিতে করিতে, বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের চিরশুভ কামনা করিতে লাগিল। আর এদিকে রায়গড়ে, ইব্রাহিমের পরাজয়বার্ত্তা পঁহুছিবার সঙ্গে সঙ্গে, সেই অল্পসংখ্যক ভীত ও সন্ত্রস্ত মোগল-সৈন্য, প্রাণ লইয়া কে কোথায় উধাও হইয়া গেল।

এইক্ষণ হইতে প্রতাপ সঙ্কল্প করিলেন, "সুবা বাঙ্গালার মধ্যে মোগলের কোনরূপ প্রভুত্বের চিহ্ন রাখিতে দিব না।" এখন হইতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতররূপে নৌ-বলে বলীয়ান্ হইলেন। এতদিন, মোগল তাঁহার গতিরোধ করিতে আসিলে, তিনি তাহার প্রতিরোধ করিতেন ; কিন্তু এক্ষণে স্থির করিলেন, তিনি আপনা হইতেই মোগলকে আক্রমণ করিবেন,—তাহারাই তাঁহার গতিরোধ করুক।

প্রতাপ সসৈন্যে প্রথমে সপ্তগ্রাম অবরোধ করিলেন। সপ্তগ্রাম সে সময় বঙ্গের একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সপ্তগ্রামের মোগল রাজপুরুষগণ প্রাণভয়ে রাজকোষাগারাদি ফেলিয়া পলাইল,—প্রতাপ অমিততেজে তাহা লুণ্ঠন করিয়া আপন কোষাগারভুক্ত করিলেন।

এই সময়ে উড়িষ্যার রাজন্যবর্গ এবং প্রতাপ-অনুগৃহীত পাঠানদলও সাহস পাইয়া, যে যেরূপে পারিল, মোগলের অনিষ্টসাধন করিল।—কেহ মোগলের রসদ লুঠিল ; কেহ মোগলের রাস্তা-ঘাট, সেতু প্রভৃতি ভঙ্গ করিয়া দিল ; আর কেহ বা মোগল সেনানিবাসে অগ্নিপ্রদান করিয়া, শত্রুতার চূড়ান্ত দেখাইল।

সপ্তগ্রামের পর রাজমহল আক্রমণ,—প্রতাপের প্রধান কার্য্য।

ইহাতেও বঙ্গীয় বীরের অসামান্য নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছিল। অতঃপর তিনি অদম্য তেজে পাটনা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। পাটনা, বিহারের সর্ব্বপ্রধান নগর। এই মহানগর আক্রমণে বঙ্গীয় বীরগণ যে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর যে কোন বীরজাতির আদর্শস্থল।

মহাভাগ প্রতাপ পাটনা দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া, যাবতীয় ধনরত্ন যশোহরে আনয়ন করিলেন, এবং বিহার অঞ্চলে কিছুদিনের জন্য আত্মপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এব্রাহিম খাঁর পরাজয়-সংবাদ যথাসময়ে সম্রাটের নিকট পঁহুছিল। তিনি একে একে সকল সংবাদ অবগত হইতে লাগিলেন। কি কৌশলে প্রতাপ এমন শিক্ষিত মোগল-সৈন্য পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে,—বঙ্গদেশীয় সমুদয় রাজা ও ভূস্বামীকে প্রতাপ কি উপায়ে আপনমতে আনিতে সমর্থ হইয়াছে,—প্রতাপের অর্থবল ও লোকবল কিরূপ, সৈন্যগণের অবস্থা কেমন,—একে একে নানা বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। লোকমুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। কূট ও জটিল বিষয়ে বাঙ্গালীর মাথা খেলে ভাল বটে, কিন্তু প্রতাপ যে, এরূপ আশ্চর্য্য রণকৌশলও অবগত আছে,—নিজের যথেষ্ট অনিষ্টের কারণ হইলেও, গুণগ্রাহী সম্রাট্ এজন্য মনে মনে প্রতাপকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

একজন ওমরাহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাঁহাপনা! কাফেরের এই রণ-কৌশলে আপনি মুগ্ধ হইলেন?"

আকবর। হাঁ। এই বাঙ্গালী বীর-সামান্য লোক নহে। প্রতাপের ন্যায় এমনি দুই চারিজন লোক জুটিলে, বাঙ্গালায় মোগলের নাম, অধিক দিন থাকিবে না। আমি তাহার বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায়, বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। যখন প্রতাপ আগ্রায় আমার দরবারে বসিত, তাহার সেই প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখাবয়ব দেখিয়া আমি বুঝিতাম,—এই যুবক সামান্য নহে। সে যাহা কিছু দেখিত, তন্ন তন্ন করিয়া তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইত। তোমরা কি দেখ নাই, আমার সকল কার্য্যই সে কেমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে

পর্য্যবেক্ষণ করিত? শত্রু হউক, মিত্র হউক,—গুণের আদর কে না করে? প্রতাপ আমার বিশেষ শত্রু বটে,—তার আর-আর অনেক দোষও আছে বটে; কিন্তু যা তার প্রশংসার যোগ্য, তার সে প্রশংসা না করিব কেন? তার পর, তার দমন ও বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিফল,—তাহাও অবশ্যই হইবে।”

ওমরাহ। জাঁহাপনা! স্তাবকতা মনে করিবেন না,—লোকে যে আপনার এত ভক্ত,—সে আপনার এই উন্নত উদার চরিত্র গুণে! বিশেষ, হিন্দু মুসলমানকে এক করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকায়, জগৎ জুড়িয়া আপনার “দিল্লীশ্বরোবা———”

আকবর। ও কথা থাক্। এক্ষণে কি করা উচিত? প্রতাপবিজয়ে কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?

ওমরাহ। জাঁহাপনা! এব্রাহিম খাঁ তেমন দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি নাকি বলিয়া গিয়াছিলেন,—‘কাফেরের সহিত আবার মোগলের যুদ্ধ কি! যাহারা একখানা নিষ্কাসিত অসি দেখিয়াই ভয়ে পলাইয়া যায়,—তাহারা যুদ্ধ করিবে!’ মনের মধ্যে এইরূপ গর্ব্ব পোষণ করিলে কি কোন কাজ সুসিদ্ধ হয়? এব্রাহিম বোধ হয় তেমন সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই,—এবং বাঙ্গালীর সূক্ষ্মবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতেও পারেন নাই। এবার উপযুক্ত লোকের উপর এই গুরুভার অর্পণ করিলে, কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।

তখন সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে মহাবল আজিম খাঁর উপর বঙ্গবিজয়ের ভার অর্পিত হইল।

নবোৎসাহে উৎসাহিত আজিম খাঁর আগমন-সংবাদ প্রতাপ অবগত হইলেন। এবার তিনি এক নূতন পন্থার উদ্ভাবন করিলেন। আজিমকে বিনা বিঘ্নে, বিনা গোলযোগে বঙ্গদেশাভিমুখে আসিতে দিলেন। পাটনা,

রাজমহল প্রভৃতি স্থানে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন, তত্রস্থ সৈন্য-সামন্তগণ কেহই যেন আজিমের গতিরোধ না করে,—একটুও বিরুদ্ধাচরণ করিতে না পায়; অধিকন্তু আবশ্যক হইলে, আজিমের অধীনতা স্বীকার করিতেও, কেহ যেন কুণ্ঠিত না হয়।

প্রতাপের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য হইল। সকলে আজিমের বশ্যতা স্বীকার করিল। মূর্খ আজিম গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। ভাবিল, "এবার সম্রাট্, সেনাপতি করিয়াছেন কাহাকে?—দপ্‌দপানি দেখিয়াই বিদ্রোহিগণ শান্ত হইবে না,—তবে আর কি? এ কি সের খাঁ?—না, এব্রাহিম খাঁ? যাই হোক, এখন সেই বিদ্রোহীর সর্দ্দার প্রতাপাদিত্যকে কোনরকমে একবার বন্দী করিতে পারিলে হয়।"

স্থূলদর্শী আজিম, বিংশতি সহস্র মোগল সেনানী লইয়া, ঘোর ঘটা করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। কোথাও যুদ্ধের নাম-গন্ধ নাই,—দিব্য খাইয়া-শুইয়া, হাসিয়া-গাহিয়া, পেট মোটা করিয়া, মোগল-সেনাপতি কলিকাতার সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক, নিরুদ্বেগে বাদসাহী-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ ভাবিলেন, "না, আর না,—এইবার মোগলকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইতেছে।"

বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব হইতেই বিধিমতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এখন পূর্ণমাত্রায় সুযোগ বুঝিয়া, অকস্মাৎ একদিন গভীর নিশিতে সসৈন্যে হুঙ্কার করিয়া, মোগল-শিবির আক্রমণ করিলেন। এদিনের যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন,—বীরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর।

ভোগবিলাসরত মোগল-সৈন্যগণ সেনাপতি সহ, তখন বিলাস-শয্যায় শুইয়া, সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল। ঘুমঘোরে অকস্মাৎ প্রলয়কালীন মহাগর্জ্জন শুনিয়া, তাহারা চমকিত হইল। কারণ অবধারণ করিবার

শক্তিও তখন সকলের হইল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, জড়ের ন্যায় তাহারা পড়িয়া রহিল। কেহ বা আলস্য-ভরে, সুখ-নিদ্রার শেষ তন্দ্রাটুকুর মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া, কেবলমাত্র পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল! সেনাপতি স্বয়ং কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিতে করিতে সহসা উঠিয়া পড়িলেন।

আজিম অন্ধকারে দেখিল, হিন্দু-সৈন্য শিবির ভেদ করিয়াছে, ধূমে ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং মহা কোলাহলে চারিদিক প্রকম্পিত করিতেছে। তখন অন্ধকারে যে যাহাকে পাইল, মারিতে লাগিল। হিন্দু হিন্দুকেও মারিল, মোগল মোগলকেও মারিল। দেখিতে দেখিতে শিবিরের অনতিদূরে, দক্ষিণ কোণে আগুন ধরিয়া উঠিল। তখন প্রাণভয়ে মোগলসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া, যে যেখানে পারিল, পলায়ন করিল।

আজিম নিরুপায় হইলেন। কতিপয় সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ মোগলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনারা সাধ করিয়াই যুদ্ধে আসিয়াছিলেন, এখন দেখুন, যদি কতকগুলি সৈন্যকেও প্রাণে বাঁচাইতে পারেন। নহিলে এই কাফেরগণের হস্তে সাধ করিয়া প্রাণগুলিও দিয়া যাইতে হয়!"

সহস্রাধিক সৈন্য একত্র হইল। তখন যে যাহা সম্মুখে পাইল, সে সেই অস্ত্র গ্রহণ করিল, এবং প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

শঙ্কর দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র মোগল-সৈন্যদল অতি অল্প সময়ের মধ্যে অস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহারা এরূপ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতেছে যে, একটিকে রক্ষার জন্য আর দশ জনে প্রাণ দিতেছে, তথাপি কেহ হটিতেছে না। এই মোগল-সৈন্য বিস্তর হিন্দুকে মারিল।

তথাপি আজিম বুঝিলেন, যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা অল্প। যদি যুদ্ধের মত যুদ্ধ হইত, তবে না হয় দেখিতে পারিতেন। কিন্তু পলাতক সমস্ত সৈন্য

একত্র করিয়া এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে-হইতে, একটিরও প্রাণ থাকিবে না,—আর ততক্ষণে প্রজ্বলিত শিবিরও ভস্মীভূত হইবে।

তথাপি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হিন্দু-সৈন্যগণ এবার দ্বিগুণ উৎসাহে,—তীর, ধনুক, বর্শা, তরবারি, বন্দুক, কামান,—যখন যাহাতে সুবিধা বোধ করিল, তাহা লইয়াই প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুসৈন্য সংহার করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। আজিম বুঝিল, "না, আর বৃথা চেষ্টা! বৃথা নরহত্যার প্রয়োজন দেখি না। এ যাত্রা প্রাণ লইয়া পলায়ন করি। পুনর্ব্বার যদি কখন বাঙ্গালায় আসি, তবে কাফেরদিগের এই দুষ্টবুদ্ধির ভিতর অগ্রে প্রবেশ করিতে হইবে।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেনাপতিগণের ন্যায় আজিমও রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সম্রাট্ যথাসময়ে এ কথা শুনিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন। সত্যই কি বঙ্গদেশ হইতে মোগল-নাম বিলুপ্ত হইবে? সত্যই কি বাঙ্গালী এমন বীর হইয়াছে যে, দুর্দ্ধর্ষ মোগলকে চিরদিনের জন্য দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে?—এ কথা সম্রাট বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

দরবারে বসিয়া ওমরাহগণ বিচার করিলেন, একজনের উপর এইরূপ কার্য্যের ভার না চাপাইয়া,—কতিপয় বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ ও কৌশলী ব্যক্তির উপর বঙ্গবিজয়ের ভার অর্পিত হউক। যেমন করিয়া হউক, বঙ্গের এ বিদ্রোহ নিবাইতে হইবে। এক এক করিয়া অনেক বর্ষ অতিবাহিত হইল,—বঙ্গদেশে মোগলের নাম পর্য্যন্ত যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে।—এক পাই-পয়সা রাজস্ব আদায় নাই, কেহ মোগলের বাধ্য নহে, কোন ভূস্বামীই মোগলের অধীনতা স্বীকার করে না! সম্রাট বলিলেন, "বঙ্গের এই মহা বিদ্রোহ থামাইতে যত অর্থ, যত লোক লাগে দিব—যেরূপে হউক, বঙ্গদেশ শাসনাধীনে রাখিতেই হইবে। কি ছার প্রতাপ! মোগলের যুদ্ধনৈপুণ্যে বাঙ্গালী জয়লাভ করিবে? অসম্ভব! সেনাপতিগণ বঙ্গদেশে গিয়া বিলাসী হইয়া পড়েন, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা ভুলিয়া যান,—তাই এমন হয়! আমি আশা করি, যে সকল বীর এইবার বঙ্গদেশ যাত্রা করিবেন, তাঁহারা জয়-পরাজয়ের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ না হইলে, যেন আর এ রাজ্যে উপস্থিত না হন। আত্মাভিমানী পরশ্রী-কাতর বাঙ্গালীর মধ্যে কোনক্রমে একবার বিরোধ ঘটাইতে পারিলেই, সহজে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

এ কথা কেহ ভুলিল না। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আকবর দূর হইতেও বাঙ্গালী-চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, অল্প আয়াসেই বাঙ্গালীকে হাতের মধ্যে আনা যাইতে পারে এবং তখন যেরূপ ইচ্ছা তাহাকে লইয়া খেলাইতে পারা যায়। সম্রাটের এই ইঙ্গিত-টুকু কেহ ভুলিল না।

এবার দ্বাবিংশতি জন বিশিষ্ট আমীর স্বেচ্ছায় এই গুরুভার গ্রহণ করিলেন। সম্রাট বিস্তর অর্থ ও বহু সৈন্য-সামন্ত দিয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন।

এবারও প্রতাপ পূর্ব্ব-রীতি অবলম্বন করিলেন। এবারও তিনি মোগলদিগকে বিনা বিঘ্নে আপন অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন। দাম্ভিক আমীরগণ ভাবিতে লাগিল,—"এই ত দেশ! ইহার লোক-গুলাকে পদাঘাতে মৃত্তিকাসাৎ করিয়া গেলেও ত কেহ কথা কহিবে না!—ইহারাই বিদ্রোহী?"

আমীরগণ যতটা না হউক, সৈন্যগণ প্রথম হইতেই অনেক অত্যাচার-উপদ্রব আরম্ভ করিল। নিরীহ বাঙ্গালী কথা কহিল না। প্রতাপ বলিয়াছেন—"ভাই সব, নীরবে সহ্য করিও। চিরমঙ্গলের জন্য উপস্থিত দুঃখ-কষ্টে ভ্রূক্ষেপ করিও না।" তাহারা তাহাই করিল। কিন্তু স্থূল-বুদ্ধি মোগল বুঝিল না—কেন প্রতাপ বিনাযুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, তাহাদিগকে সর্ব্বত্র প্রবেশের অধিকার দিতেছেন? কেন তিনি প্রজার রোদন, আর্ত্তের বিলাপ ও বিপন্নের হাহাকারে কর্ণপাত করিতেছেন না? মোগল কাহারও সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল, কাহারও গৃহ দগ্ধ করিয়া দিল, কাহারও শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করিল। কোথাও বা দেবমন্দির ভূমিসাৎ করিয়া, আপনাদের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। তথাপি প্রতাপ বিচলিত হইলেন না।

মোগল দেখিল,—"কৈ, কাফের ত যুদ্ধ চাহে না?" তখন তাহারা ভাবিল, "হয়ত এই কয় বারের যুদ্ধে কাফেরের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাই আর কোন উদ্যোগ-আয়োজন নাই। হইতে পারে, এইবার সেই বিদ্রোহীর সর্দ্দার আপনা হইতে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিবে।"

আমীরগণ ক্রমে যশোহরের নিকটবর্ত্তী হইল। শেষে সকলে পরামর্শ করিয়া প্রতাপের নিকট দূত পাঠাইল।

প্রতাপ দূতের হস্তে শৃঙ্খল ও তরবারি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার উদ্দেশ্য কি?"

দূত বলিল,"সেনাপতি ইহা আপনাকে উপহার পাঠাইয়াছেন। আপনি বীর, যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহাই গ্রহণ করুন।"

প্রতাপ কোপ-প্রজ্বলিত নয়নে দূতের প্রতি চাহিলেন, বলিলেন, "কি, এতদূর! এই আমি অসি লইলাম। ইচ্ছা হয়, ঐ শৃঙ্খলও রাখিয়া যাও,—উহা দ্বারাই তোমার সেই দাম্ভিক প্রভুগণকে আবদ্ধ করিব। ভাগ্যক্রমে যদি তুমি বাঁচিয়া থাকিয়া বন্দী হইতে পার, ত দেখিবে,—অদূরে ঐ যে যমুনা কালো জল বুকে লইয়া বহিতেছে, শীঘ্রই উহা যবনরক্তে রঞ্জিত হইয়া বহিতে থাকিবে।"

কম্পিতহৃদয়ে দূত প্রস্থান করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বর্ষা আগতপ্রায়। প্রতাপ, শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন,—"যুদ্ধ অনিবার্য্য বটে, কিন্তু বর্ষার আগমন প্রতীক্ষা করা শ্রেয়ঃ। যেহেতু, মোগলের সৈন্যসংখ্যা এবার অধিক। বর্ষা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে, বাঙ্গালার বর্ষাতে নিশ্চয়ই উহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে। তখন আপনা হইতেই উহারা নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবে; তার উপর খাদ্য-সামগ্রীও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিবে না।"

তাহাই হইল। এদিকে মোগলও যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

ক্রমে বর্ষা নামিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে বঙ্গভূমি প্লাবিত হইল। জলস্থল সব একাকার হইয়া গেল। সূর্য্যের মুখ আর দেখা যায় না। মোগল-শিবিরে দুর্দ্দশার একশেষ হইল। নানাজাতীয় সর্প, বিষাক্ত কীট, জলৌকা প্রভৃতি তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তার উপর জ্বর ও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া বিস্তর মোগল প্রাণত্যাগ করিল।

প্রতাপের গুপ্তচর মোগল-শিবিরের এই দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রতাপকে জ্ঞাপন করিল,—"মহারাজ! এই উপযুক্ত সময়।—যবন-জয়ের এমন অবসর আর হইবে না।"

শুভদিনে শুভক্ষণে প্রতাপ বীরেন্দ্র রথিবৃন্দকে লইয়া,—অগণিত হিন্দুবাহিনী ও যুদ্ধোপকরণ সঙ্গে লইয়া, পঙ্গপালের ন্যায়, চারিদিক হইতে মোগলকে আক্রমণ করিলেন। উপর্য্যুপরি কয়দিন অবিশ্রান্ত—অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। মোগলগণ প্রতিপদে ছিন্ন ভিন্ন, পরাজিত, নির্য্যাতিত ও নিহত হইতে লাগিল। তবে এবার নাকি তাহাদের সৈন্যসংখ্যা

অনেক অধিক, তাই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়াও হইতেছে না। কিন্তু শেষ দিনের যুদ্ধে, যাই তাহাদের কয়েকজন সেনাপতি গঁতাস্থ হইল, অমনি তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা পাইল। একে অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধ;—তায় ঘোর বাদল;—তার উপর রোগ-শোক;—মোগল-সৈন্য কতক ঠায় দাঁড়াইয়া মরিল, কতক যুদ্ধ করিতে করিতে মরিল, কতক আপনা হইতে ধরা দিয়া বন্দী হইল, আর কতকগুলাকে বা প্রতাপ-সৈন্য ধরিয়া বন্দী করিল। ফলে, অতি অল্পসংখ্যক মোগল ব্যতীত যুদ্ধস্থল হইতে কেহ পলাইতে পারে নাই।

যবন-রক্তে ধরাতল অভিষিক্ত করিয়া ভাগীরথী তীরে গিয়া শঙ্কর শরীর জুড়াইলেন। তখন প্রভাতের মধুর বায়ু ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতেছে,—সূর্য্যরশ্মি তখনও প্রখর হয় নাই,—পাখিগণ তখনও প্রভাতী-গান ছাড়িবার মমতা ত্যাগ করে নাই,—জীবনসংগ্রামে তখনও জগতের লোক আত্মবিস্মৃত হয় নাই,—মুখে তখনও বিরক্তি, ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা, কপটতা পূর্ণমাত্রায় স্থান পায় নাই,—স্বপ্নের মত একটু অস্ফুট আনন্দ-স্মৃতি তখনও হৃদয়কে জাগাইয়া রাখিয়াছে,—ঠিক সেই সময়ে মহাপ্রাণ শঙ্কর ভাগীরথী-তীরে গিয়া উপবেশন করিলেন। একবার সূর্য্যপানে চাহিলেন। কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না,—দুই ফোঁটা জল তাঁহার নয়নপ্রান্তে আবির্ভূত হইল। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ভক্তিভরে সূর্য্য-দেবকে প্রণাম করিয়া, তিনি জলে নামিলেন। অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতে করিতে স্নিগ্ধ দেহে, ততোধিক স্নিগ্ধ অন্তরে, অতি করুণস্বরে কহিলেন,—

"মাগো, পতিতপাবনি! এ পতিতকে উদ্ধার করিও মা! অনেক নরহত্যা করিয়াছি, আর এ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে পারি না মা! বন্ধন খুলিয়া দাও,—দয়াময়ি, কলুষনাশিনি, মা গঙ্গে! আর কতদিন

মা, এ মোহ?—কতদিন কর্ম্মভোগ?—কতদিন মা, জীবনের এ উত্তাপবহন?”

ভাববিভোর শঙ্কর তখন আপন মনে, গুন্ গুন্ তানে এক গান ধরিলেন। প্রভাত-বায়ু-বিক্ষোভিত গঙ্গাজল যেন তালে তালে সেই গানের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। গীতি-স্তবে ভক্তের হৃদয়-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল;—

ত্বংহি পরমেশ্বরি, মা আমার!—
মাতর্গঙ্গে! পুণ্যময়ী মা আমার॥
কুল-কুল-নাদিনি, ত্রিতাপ-নিবারিণি,
নিস্তারিণি, মা আমার।
শুভদে, শীতলে, অমলে, নির্ম্মলে,
প্রসন্নসলিলে, মা আমার॥
পতিতপাবনি, ভাগীরথি, সাগরগামিনী দ্রুতগতি,
সগর-সন্ততি তারিলে, মা আমার।
শিব-শির-সুশোভিনি, মোক্ষ-প্রদায়িনি,
কলুষনাশিনি, মা আমার॥
জয় বিশ্বরূপা, সাকারা, স্বরূপা,
ত্রিকাল-সাক্ষী, মা আমার।
মরণে, জীবনে, তোমারি চরণে,
লইনু শরণে, মা আমার॥—
দেখো গো করুণাময়ি! সন্তানে, মা আমার।—
মা আমার—মা আমার—মা আমার—মা আমার॥

ভজন সমাপনান্তে, শঙ্কর উচ্ছ্বসিত প্রাণে কহিলেন,—

“আ-হা-হা! উপরে ঐ উদার অনন্ত আকাশ,—আর নিম্নে কল-কল-নাদিনী, পতিতপাবনি মা তুমি!—ভগবান্ আর কোথায়? তুমিই ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিকৃতি,—তুমিই মা, আমার সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী!”

তীরে দাঁড়াইয়া প্রতাপ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। শঙ্কর সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া, পবিত্র হইয়া তীরে উঠিলেন। প্রতাপ সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শঙ্করের সেই আর্দ্রবস্ত্রেই, প্রতাপ শঙ্করকে আলিঙ্গন করিলেন। ভাবগদগদ কণ্ঠে, আনন্দভরে কহিলেন,—"বন্ধু! তোমারই কৃপায় আমার জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হইল। এতদিনে আমি ধন্য হইলাম!"

শঙ্কর সেই আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ধন্য তুমি একা হইলে,—আমিও কি হইলাম না? বাল্যে, সুন্দরবনে শিকারকালে, একদিনের সেই একটি ঘটনা তোমার মনে পড়ে কি? সেই——"

প্রতাপ বাধা দিয়া কহিলেন, "ভাই, আর সেই পূর্ব্বকথা তুলিয়া আমায় লজ্জা দিও না। সে দুর্দ্দিনে—সেই তীক্ষ্ণশরে যদি তুমি একটি চক্ষু নষ্ট করিতে,—মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়,—তাহা হইলে আজ আমি কোন্ বলে, কাহার সাহসে এই দুর্দ্ধর্ষ মোগলকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিতাম? বুঝিয়াছি, তুমিই যথার্থ মায়ের সুসন্তান! আমি নির্জ্জনে তোমার সহিত প্রাণের আনন্দ বিনিময় করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি।—ভাই! সমগ্র ভারত কি হিন্দুর করায়ত্ত হইতে পারে না?"

শঙ্কর একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন,—"একেবারে যে অসম্ভব তাহা নয়,—তবে বড় কঠিন কথা!"

প্রতাপ। কঠিন কথা কেন ভাই? এই ত আজ প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল বঙ্গভূমি আপন আয়ত্তে রাখিয়াছি,—চেষ্টা করিলে কি মোগলরাজত্ব সমূলে ধ্বংস করিতে পারি না?

শঙ্কর। চেষ্টায় অসাধ্য কর্ম্ম নাই বটে,—তবে আমাদের তেমন পুণ্যবল নাই যে, মোগলকে তাড়াইয়া সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র হিন্দুরাজ্য

স্থাপন করি। দুর্জ্জয় সাধনা ব্যতীত এই মহাব্রত উদযাপনে কেহ সক্ষম হইবে না। এজন্মে যতটুকু অধিকার, তাহা আমাদের হইয়াছে,—জন্মান্তরে যদি হিন্দুর হৃদয় লইয়া, স্বদেশের জন্য কঠোর তপস্যায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তবে সে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে।

ভাগ্যবান্ প্রতাপ, সেই দ্বাবিংশতি আমীর-পরিচালিত মহাযুদ্ধেও জয়লাভ করিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী সুবা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে তিনি সৌভাগ্যের চরম সীমায় উন্নীত হইলেন। এই সময় হইতে তিন চারি বৎসর কাল তিনি নিরুদ্বেগে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, জনসাধারণের প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন। এই তিন চারি বৎসর কাল, তাঁহার অধিকারমধ্যে যুদ্ধ, বিগ্রহ, রক্তপাত, অশান্তি,—কোন কিছুই হয় নাই। সম্রাট্ আকবর যেন বাঙ্গালা মুলুকের আশা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।—জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে আর বাঙ্গালার রাজস্ব খাইতে হয় নাই।

কিন্তু হায়! কালও পূর্ণ হইল, আর বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-সূর্য্য চির-অস্তগমনেরও সূচনা হইতে চলিল।

একজন পলাতক আমীর বঙ্গদেশেই লুকাইয়া রহিলেন। তিনি সম্রাটের সেই 'ভেদমন্ত্র' স্মৃতিমধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। এখন গোপনে থাকিয়া, সেই অব্যর্থ বাণ-প্রয়োগের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

উড়িষ্যার পথে এক বর্ষীয়সী বিধবার সহিত অনিন্দ্যসুন্দরী এক যুবতী কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিলেন।

বর্ষীয়সী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল! এই পুরুষোত্তমে ত অনেক দিন কাটিয়া গেল ;—দেবতাদর্শন কেমন হইল বল দেখি ?"

ফুল বলিল, "আমরা তো দেশে ফিরিতেছি, এতদিন পরে আজ সহসা এ কথা কেন মা ?"

বিধবা। আমার মনে রাত্রিদিন ঐ শ্রীমূর্ত্তি জাগিতেছে। আহা, কি ভুবনমোহন রূপ! চক্ষু মুদিয়া একবার দেখ দেখি মা! এখনি বুকটার ভিতর আলো ফুটিয়া উঠিবে!

ফুল। মা আমার! তুমি ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী, ধর্ম্মপরায়ণা। তাই নারায়ণ ভুবনমোহন রূপে তোমার হৃদয়ে বিরাজমান। আমার এমন পুণ্য কৈ মা, যে তাঁহাকে দেখিতে পাইব ?

বিধবা। অবশ্যই দেখিতে পাইবে। তুমি মা একবার তেমনি ভক্তিমাথা সুধাকণ্ঠে তাঁকে ডাকো দেখি মা! আমি ঐ গাছের ছায়ায় বসিয়া, তোর মধুর নামে সেই বৈকুণ্ঠনাথকে স্মরণ করি।

তখন সেই লোকশূন্য বিস্তৃত পথের ধারে, একবৃক্ষতলে বসিয়া, ফুল সুধাকণ্ঠে সুধাবর্ষণ করিল, আর বৃদ্ধার নয়নে দরদর ধারাপাত হইতে লাগিল। ফুল গাহিল,—

কেশব, কংসারি, ভবভয়-হারি হে।
মদন অচ্যুত, ত্রিভঙ্গ মুরারি হে।
যুগে যুগে অবতরি, ভূ-ভার নাশ' হে হরি,
ভক্ত-বৎসল রূপ ধরি' নানা লীলা করো হে।
চিদানন্দময় তুমি, অখিলের অন্তর্য্যামী,
কি নামে পূজিব আমি বুঝিতে না পারি হে।
করাও সকলি তুমি, ভাবি নাথ! করি আমি,
তুমি কিন্তু কর্ম্ম-স্বামী, কারণ সবারি হে!

এই রমণীদ্বয় কয়েক বৎসর ধরিয়া বহুতীর্থ করিয়া, পুরুষোত্তম হইতে বাঙ্গালায় ফিরিতেছিলেন। তখন এক একটি তীর্থ করিতে পাঁচ ছয় মাস সময় লাগিত।

বৃদ্ধা বলিলেন, "ফুল, কথা কও মা! নীরবে চলিলে কেন? বড় রোদ লেগেছে কি? শ্রীক্ষেত্রের পথে বড় রোদ মা, বড় রোদ! আর একবার যখন এসেছিলাম, তখন সঙ্গে অনেক লোক ছিল,—এই রোদে পথ চলিতে চলিতে এক জায়গায় শুয়ে পড়েছিলুম।—আয় মা, আয়, তোর মুখখানা শুকিয়ে গেছে, এই আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছিয়ে দি।"

বৃদ্ধা, আপন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া, ফুলের শুকান' মলিন মুখখানি মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন, "মারে, ভগবান্ তোকে মিলাইয়াছেন, তাই শেষ দশাটায় একরকমে আছি মা! আর আমায় ছেড়ে যেও না মা!"

ফুল। মা,—ওমা! ও কি কথা মা? আমি যে মা তোমারই মেয়ে! আমি কোথায় যাব মা? মাঝে একবার গিয়েছিলাম বটে,—তা আর যাব না।

বৃদ্ধা। তা চল, এইবার আমার জামাইকে খুঁজিয়া আনিব। যুদ্ধ কি আর ফুরায় না?—ও! ভারি বীর,—কেবল মার্ মার্, কাট্, কাট্!

ফুল চুপ করিয়া পথ চলিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল,—"আহা, এই সরলপ্রাণা ব্রাহ্মণী, মায়ের মত করিয়া আমায় প্রতিপালন করিতে-ছেন! আমারই বয়সের কন্যা হারাইয়া, পাগলিনীর মত তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেন,—আমায় পাইয়া এখন তবু একটু শান্ত আছেন! ——আমার আবার স্বামী! আহা! ইনি ভাবেন, আমার স্বামী যুদ্ধে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন।—আমার স্বামী!—স্বামী, স্বামী কি মধুর! এ নারী-জীবনে ত তাহা পাইলাম না? নিস্ফল এ জীবন হইল!"

ফুল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

পথের মাঝে একটা বড় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, মাঠের পরপারে নিবিড় জঙ্গল। বৃদ্ধা বলিলেন, "ফুল, আয় মা,—আমার কাছে আয়, এ পথটা বড় খারাপ। বড় ডাকাতের ভয় আছে।"

"আমাদের কি আছে মা, যে, তাই ডাকাতে লইবে?"

বৃদ্ধা। আর কিছু না থাক্, তোর ঐ অপরূপ রূপ আছে মা! এ সোণার প্রতিমাখানি যদি কেউ আমার বুক খালি করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আমি কি করিয়া প্রাণ ধরিব মা? চোর-ডাকাতে ধন চুরি করে বটে, কিন্তু তার চেয়েও আবার রূপের উপর তাদের নজর বেশী। কত ভয়ে ভয়ে যে তোরে এনেছি, তা জগন্নাথ, তিনিই জানেন। বল্ দেখি মা, তুই কেন এসেছিলি?

"আমার কি মা, আসিতে নাই?"

"তা থাক্‌বে না কেন? ছেলেপিলে হোক্, নাতি-নাত্‌কুড় নিয়ে ঘর-সংসার কর—তারপর পাকা-চুলে সিঁদুর দিয়ে স্বামীর সঙ্গে তখন তীর্থে এসো।"

"আমার আবার তীর্থ, আমার আবার স্বামী! সেই রণাঙ্গনেই আমার সকল সাধ মিটিবে। নারায়ণ! তাহাই যেন হয়।"

মনে মনে এই কথা বলিয়া ফুল একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। সুবিস্তৃত মাঠের উপর দিয়া অগ্নিকণা লইয়া বাতাস চলিতেছিল, তাহাতে সেই ক্ষুদ্র নিশ্বাসটি মিশিয়া গেল!

ফুলজানি রাজমহল হইতে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট পুরস্কৃত হইয়াছিলেন, পাঠক সেই পর্য্যন্তই অবগত আছেন। তার পর ফুলজানির জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

ফুলজানি দূরদর্শিনী, বুদ্ধিমতী। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কাছে থাকিলে হয়ত সূর্য্যকান্ত ব্রতচ্যুত হইবেন, দেশের চিন্তা ভুলিয়া হয়ত প্রেম-চিন্তাই জীবনের সার করিবেন, বীরব্রত ভুলিয়া গিয়া হয়ত নারী-পূজাতেই মত্ত থাকিবেন। তাহা হইলে, দেশের শত্রু দূর করিবে কে? প্রতাপ, শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত তিনে মিলিয়া এক। একজনকে বাদ দিলে, ব্রত নিষ্ফল হইবে। তাই ফুলজানি নিজের অদৃষ্ট বুঝিয়া ভাবিয়াছিল,—"যাহাতে সূর্য্যকান্তের পতন ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কাজ আমি করিব না। অন্ততঃ চারি বৎসর কাল তাঁহার কাছে আসিব না।"

প্রেম কি পদদলিত হইয়াছে? সে বিচার তোমরাই করিও,—আমি বলিতে পারিলাম না।

যে ফুলজানি, আগ্রায় তোরাবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইত,—যে, সূর্য্যকান্তকে দর্শনমাত্র আত্মসমর্পণ করিয়াছিল,—যে, তাঁহারই জন্য সুদূর আগ্রা হইতে যশোহরে আসিয়াছিল—যে, হৃদয়ের উন্মত্ত আবেগে নিজ-প্রেমকাহিনী নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিল, এবং দেশের হিতকামনায় বাঙ্গালার নগরে নগরে ঘুরিয়া শেষে রাজমহলে গিয়া বন্দী হইয়াছিল,—যে, বুদ্ধিবলে সেই ভীষণ কারাগার হইতে পাঁচশত বন্দীসহ শঙ্করকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—এই কি সেই? সেই হাস্যময়ী, শোভাময়ী, ফুল্লাধরা, বিশাললোচনা, করুণহৃদয়া বালিকা

কি এই? সেই বিপদে স্থির, দুঃখে অচঞ্চল, কার্য্যে সিংহবলশালিনী—সেই কি এই ফুল?

যদি এই সেই, তবে দেশের প্রতি এখন আর তাহার সে ভাব নাই কেন? কি জানি, ফুলজানির কি ভাবান্তর হইয়াছে!

ফুল যেদিন প্রতাপের নিকট হইতে উপহার লইয়া আসিয়াছিল, তাহার পরদিনই সেই ব্রাহ্মণীর সহিত তীর্থ-যাত্রা করে। কিন্তু সে কথা কেহ জানিত না। বিশেষ, পুরুষবেশী কুমারই যে ফুলজানি, তাহা কে জানিবে?

ফুলজানি যশোহরে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইল। শুনিল, মোগল বার বার পরাজিত হইলেও নিবৃত্ত হয় নাই,—আবার তাহারা আসিবে। ফুলজানি সূর্য্যকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিল না। কিন্তু মনে মনে কি সঙ্কল্প করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট্ আকবর অন্তিম-শয্যায় শায়িত। তাঁহার জীবনের আশা আর নাই। তাঁহার সিংহাসনের প্রতি তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের লোলুপ-দৃষ্টি পড়িয়াছে। দুইদিন পরে তাঁহার আয়ু-রবি অস্তমিত হইবে, সে জন্য কাহারও এতটুকু বিষাদ বা উৎকণ্ঠা নাই,—সকল উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ,—তাঁহার সিংহাসনের প্রতিই ন্যস্ত হইয়াছে। সম্রাট্-পুত্র সেলিম ও সেলিম-পুত্র খস্রু,—পিতাপুত্রে সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য, পরস্পরের প্রতি ঘোর বৈরনির্য্যাতনে উদ্যত। মানসিংহ প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ প্রথমে খস্রুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে পিতামহের সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সুতরাং রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিদ্রোহ ঘটিবার সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু শেষে সেলিমেরই জয় হইল,—আকবরের মৃত্যুর পর তিনিই ভারতসিংহাসনে উপনিবিষ্ট হন এবং জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারতসাম্রাজ্য শাসন করেন।

আকবরের মৃত্যু ও সেলিমের সিংহাসন প্রাপ্তি,—এই দুই ঘটনা উপলক্ষে, প্রতাপ কয়েক বৎসর সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে, বাঙ্গালার সিংহাসন উজ্জ্বল করেন। এ কয়েক বৎসর বাঙ্গালীর আর সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। কিন্তু হায়! কালও পূর্ণ হইল, আর বঙ্গের শেষবীরের পতন হইয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির,—বঙ্গদেশস্থ সমগ্র হিন্দুর,—স্বাধীনতা-রত্ন চিরকালের জন্য অদৃষ্টসমুদ্রে ডুবিয়া গেল!

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সেলিমের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল,—বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যকে রাজ্যভ্রষ্ট করা। তিনি দেখিলেন, ইতিপূর্ব্বে,

তাঁহার পিতার আমলে, যে সকল মোগল সেনাপতি ও আমীরগণ প্রতাপ-বিজয়ে গমন করিয়াছিল,—তাহারা সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া সেই বঙ্গীয় বীরের অধিকতর প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি এক মহা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। রাজপুতকলঙ্ক মানসিংহকে প্রতাপবিজয়ে প্রেরণ করা, তিনি বিশেষ যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। মানসিংহ ইতিপূর্ব্বে খসরুর পক্ষ অবলম্বন করায়, সেলিমের তৎপ্রতি বিশেষ আস্থা ছিল না। বরং মনে মনে মান-সিংহকে তিনি কিছু ভয় করিতেন। মানসিংহের অধীনে প্রায় বিংশতি সহস্র সুশিক্ষিত, রণকুশল ও দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। এখন সেলিম বিবেচনা করিলেন, প্রতাপবিজয়ে মানসিংহকে বঙ্গদেশে পাঠাইতে পারিলে, তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রথম, মানসিংহ যদি প্রতাপ-কর্ত্তৃক সসৈন্যে নিহত হন, তাহা হইলে তাঁহার একটা প্রধান অন্তর্শত্রু অন্তর্হিত হইয়া যায়; আর ভাগ্যক্রমে মানসিংহ যদি প্রতাপ-বিজয়ে সক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহার একটা প্রবল বহির্শত্রু বিনষ্ট হইয়া, তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ সম্যক্‌রূপে ফলবতী করে।

সেলিম মানসিংহকে মৌখিক যথেষ্ট শিষ্টাচার ও সম্মান দেখাইয়া কহিলেন,—

"বীরবর! এ বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। সেই দুর্দ্ধর্ষ বঙ্গীয় বীরকে, তুমি ভিন্ন আর কেহ দমন করিতে পারিবে না। দেখ, পিতার সময় হইতে আজ প্রায় ষোড়শ বৎসরকাল সেই বিদ্রোহীকে দমন জন্য কত উপায় উদ্ভাবিত হইল,—কত সহস্র সৈন্য জীবনদান করিল,—মোগলরক্তে বঙ্গভূমি প্লাবিত হইয়া গেল, তথাপি কিছুতেই কিছু হইল না,—সমান দর্পে, সমান তেজে, সমান স্বাধীনতায় সেই বঙ্গীয় বীর—বঙ্গে আধিপত্য করিতেছে! তাহার সেই দর্প, সেই তেজ, সেই স্বাধীনতা

ঘুচাইতে;—তুমি ভিন্ন আর কে দাঁড়াইবে? তুমি ভিন্ন আর কে মোগলের নাম রাখিবে?"

বস্তুতঃ—মানসিংহ ভিন্ন এমন স্বজাতিদ্রোহী, স্বদেশবৈরী, রাজপুতকলঙ্ক আর কে আছে? এমনই স্বধর্ম্মত্যাগী, স্বদেশের স্বাধীনতাধ্বংসকারী কুলাঙ্গার না জুটিলে,—বঙ্গের বা ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য চির-অস্তমিত হইবে কেন?

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে আরও কয়েকজন স্বদেশদ্রোহী পাপিষ্ঠ,—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। একজন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান যে, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা হইয়া, ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের উপর,—আপামর সাধারণের উপর পূর্ণ-আধিপত্য করিতেছে, ইহা তাহাদের একান্ত অসহ্য হইল। কিসে এই ভাগ্যবান্ পুরুষের সর্ব্বনাশসাধন করিবে,—কি উপায়ে আপনাদের দেশ, বিদেশী—বিধর্ম্মীর করে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে,—কোন্ কৌশলে স্বাধীনতার বিজয়-মুকুট দূরে ফেলিয়া, অধীনতার কণ্টকাবৃত মলিনমালা গলায় পরিবে,—হতভাগ্যগণ সেই চেষ্টায় সর্ব্বদাই ফিরিতে লাগিল। এই দুর্ব্বৃত্তগণের মধ্যে ভবানন্দ মজুমদার নামে এক ব্যক্তি সকলের অগ্রণী। এই অকৃতজ্ঞ মহাপাপী,—প্রতাপের একজন অনুগ্রহভাজন কর্ম্মচারী। প্রতাপের অন্নে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত। অতি সামান্য অবস্থা হইতে, প্রতাপের অনুগ্রহেই, সে 'দশের একজন' হইয়াছিল। এখন সময় বুঝিয়া, সেই আশ্রয়দাতা—প্রতাপরূপ মহামহীরুহের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিতে, পাপিষ্ঠ বদ্ধপরিকর হইল। ভবানন্দ সেই লুক্কায়িত আমীরের সহিত যোগদান করিল এবং কি উপায়ে প্রতাপের সর্ব্বনাশসাধন হয়, বিধিমতে সেই মতলব আঁটিতে লাগিল।

এই আমীর, পাঠকের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত তোরাব আলি।

তোরাব আলি ফুলজানিকে হারাইয়া বিস্তর অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহার হারানিধি মিলিল না। বড় দুঃখেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের ক্ষতও একটু একটু করিয়া শুকাইতে লাগিল। আবার সে প্রকৃতিস্থ হইল, আবার সে শিষ্যমণ্ডলী লইয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিল। ক্রমে বাদসাহের দরবারেও তাহার প্রতিপত্তি হইল। তোরাব ক্রমে আমীরের উচ্চ পদ পাইল।

ফুলজানিকে তোরাব ভুলে নাই। ভুলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। বঙ্গদেশে আসিবার অবসর সে সর্ব্বদাই খুঁজিত। অবশেষে সুযোগ পাইয়া —আসিল, এবং স্বহস্তে সূর্য্যকান্তের প্রাণসংহার করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

ঠিক এই কুগ্রহপূর্ণ মুহূর্ত্তে, এই কঠিন সমস্যার সময়ে, জাহাঙ্গীর,—মানসিংহকে প্রতাপবিজয়ের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন।

সেই সময়ে প্রতাপের সেই গৃহ-শত্রু কচু রায় এবং রূপরাম বসু আসিয়া মানসিংহের সহিত জুটিল, এবং তাহারা মানসিংহকে প্রতাপের গুপ্ত-নীতি সকল বিবৃত করিতে লাগিল। তাহাতে মানসিংহ যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কহিল, "হাঁ, এইবার ঠিক হইয়াছে। যদি প্রতাপের পতন হয়, ত এইবার হইবে! কারণ সকল শত্রুর পার আছে, —জ্ঞাতি-শত্রুর পার নাই! সেই প্রধান জ্ঞাতি-শত্রুই এখন আমার হস্তগত হইয়াছে। এইরূপ একটা অব্যর্থ সুযোগই আমি খুঁজিতেছিলাম। বিধাতা সদয় হইয়া আমাকে সেই সুযোগ মিলাইয়া দিলেন।"

মানসিংহ,—কচু রায় ও রূপরাম বসুকে বিশেষ আদর ও আপ্যায়িত করিয়া সঙ্গে লইল। এইরূপ 'অষ্টবজ্র' একত্র হওয়ায়, প্রতাপবিজয়ের পথ বড় সুগম হইয়া পড়িল।

সেই বিংশতি সহস্র রাজপুত-সৈন্য ব্যতীত, মানসিংহ আরও কয়েক সহস্র হাব্সী ও মোগল-সৈন্য সঙ্গে লইল। যুদ্ধের বহু উপকরণ সংগৃহীত হইল। হস্তী, অশ্ব ও নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র এবং গুলি, গোলা, বন্দুক ও কামান প্রভৃতি,—বঙ্গবিজয়ের জন্য প্রেরিত হইতে লাগিল। কচু রায় প্রভৃতির পরামর্শে, এবার এই অভিযানে মানসিংহ এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। প্রতাপ নাকি—তাঁহার বেতনভোগী ফিরিঙ্গি রডার সাহায্যে—নৌ-বলে বড়ই বলীয়ান্,—আর ইতিপূর্ব্বে মোগল-সেনাপতিগণ সকলেই নাকি জলপথ দিয়া প্রতাপের রাজধানী আক্রমণ করিতে গিয়া ছিন্ন-ভিন্ন ও পরাজিত হইয়াছে, তাই মানসিংহ এবার সে পন্থার অনুসরণ না করিয়া, বরাবর স্থলপথ ধরিয়াই, প্রতাপের অধিকারমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র কুলি-মজুরের সাহায্যে অচিরকাল মধ্যে এই পথ প্রস্তুত হইল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত, প্রতাপ মানসিংহকেও পথিমধ্যে কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না,—শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাকে আপন অধিকার মধ্যে আসিতে দিলেন। মনে সম্পূর্ণ ভরসা,—'পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায়, এবার মানসিংহকেও সুবিধাক্রমে, সসৈন্যে শমনসদনে প্রেরণ করিব।'

কিন্তু হায়,—সব সময় এক নীতি ফলপ্রদ হয় না! এবার প্রতাপের এই ধ্রুব সঙ্কল্পের উপর, অদৃষ্ট অলক্ষ্যে থাকিয়া, অতি নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক উপহাস করিয়াছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া,—তাঁহার উপর রাগ তুলিতে গিয়া, কয়েক জন স্বদেশদ্রোহী পাপিষ্ঠ, মানসিংহের সহিত মিলিত হইয়াছে। জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার গৃহছিদ্র প্রকাশ করিতে এবং তাঁহার নীতিজাল ছিন্ন করিতে, এবার কয়েকজন মহাপাপী বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার পরমারাধ্যা জননী-জন্মভূমিকে—সোণার বাঙ্গালাকে মোগলহস্তে সঁপিয়া দিবার জন্য, কয়েকজন হীনমতি নর-পশু, ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে! তিনি নিশ্চিন্তমনে, পূর্ণ উদ্যমে, সম্মুখযুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন,—আর এদিকে সয়তান বিবিধ ষড়যন্ত্রে, তাঁহার স্বদেশ-স্বাধীনতারূপ দেবগৃহ ভাঙ্গিবার সূচনা করিল!

মানসিংহ যখন অগণিত সৈন্য লইয়া বঙ্গের চাপ্‌ড়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন দারুণ বর্ষা উপস্থিত। পথ, ঘাট, হাট, মাঠ,—সব জলে ভরিয়া গিয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের সে সময়ে বড়ই অসংস্থান। সৈন্যগণের মধ্যে 'কি খাই—কি খাই' রব পড়িয়া গেল। মানসিংহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে যে রসদ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, স্থলপথে স্থানে স্থানে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, ক্রমেই তাহা ফুরাইয়া আসিল। তখন তিনি মহা ভাবনায় পড়িলেন।—'নিজেই বা কি খাই, আর সৈন্যগণকেই বা কি দিই'—এই ভাবনায় বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, 'ফিরিয়া যাই'; আবার ভাবিলেন, 'উঁহুঁ, তা হইতেই পারে না;' পরক্ষণে ভাবিলেন, 'তবে কি, এই অগণিত সৈন্যসামন্তাদি

লইয়া না খাইয়া মরিব ? উত্তরে আবার তখনি আপনা আপনি বলিলেন, 'আচ্ছা, দুদিন দেখি না কেন,—ভবানন্দ মজুমদার কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারে।'

সত্য,—সেই স্বদেশদ্রোহী ভবানন্দই তাঁহার এ বিপদে সহায় হইল ! সেই দুর্ব্বৃত্তই,—'গোবিন্দদেব মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার' ভাণ করিয়া,—লক্ষাধিক কাঙ্গালীভোজনের অছিলায়,—প্রতাপের আদেশপত্র লইয়া, কয়েক দিনের মধ্যেই পর্ব্বতপ্রমাণ নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ফেলিল। এবং বলা বাহুল্য,—দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে, মহাপাপী, সেই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য তাহারই যোগ্য ইষ্টদেবতার চরণে উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইল !

সেই দারুণ দুঃসময়ে,—খাদ্যাভাবে যখন সৈন্যগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে,—যখন বঙ্গবিজয়ের আশা আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই সময়ে মানসিংহ তাঁহার ভক্তের নিকট হইতে এই আশাতীত ভোজ্যদ্রব্য উপহার পাইয়া অপার আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। সাদরে ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"মহাভাগ ! অগ্রে কার্য্য উদ্ধার করি,—তোমার পুরস্কার আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিল !"

এদিকে এই ভবানন্দ, আর ওদিকে 'ঘরভেদী বিভীষণ'—সেই কচু রায়,—মূর্ত্তিমান্ প্রতিহিংসা রূপরামসহ অহরহ মানসিংহের কর্ণমূলে ইষ্টমন্ত্র দিতেছেন। তাই পুনঃপুনঃ বলিতে ইচ্ছা হয়, এই অষ্টবজ্র একত্র না হইলে, কার সাধ্য,—'বঙ্গের শেষবীর' প্রতাপাদিত্যকে আঁটিয়া উঠিতে সমর্থ হইত !

মানসিংহ ক্রমেই যশোহরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। যমুনায় অদূরে প্রকাণ্ড শিবির সংস্থাপন করিয়া, রাজনীতির বিধানানুসারে, তিনি বঙ্গাধিপের নিকট অসি ও শৃঙ্খল সহ এক দূত প্রেরণ করিলেন।

এবার দূতের নিকট এক পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। পত্রের মর্ম্ম কিন্তু সেই আমীরগণের কথানুরূপ,—'হয় বন্দী হও, নয় যুদ্ধ কর'।

গম্ভীর প্রতাপ অতি গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দূত! তুমি এখনি গিয়া তোমার সেই রাজপুত-কলঙ্ক প্রভুকে কহিবে, হিন্দু মরিতে জানে, তথাপি মোগলের পদধূলি মস্তকে ধরিয়া তাঁহার ন্যায় বাঁচিতেও চাহে না! যিনি চিরদিন আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া,—আপন অস্তিত্ব অবধি বিস্মৃত হইয়া,—নিজ ভগিনী, কন্যা ও কুটম্বিনীগণকে মোগলের ভোগসুখে দিয়া,—আজিও বাঁচিয়া আছেন,—বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য তেমন অধমাত্মার পত্রের উত্তর দিতেও আপনাকে অপমানিত বোধ করেন!—শৃঙ্খল দূরে ফেলো,—এই আমি অসি গ্রহণ করিলাম;—বলিও, তাঁহারই দত্ত অসিতে, তাঁহারই শোণিতে, আমি পৃথিবী শীতল করিব! তাঁহার ন্যায় বিকট বন্য-পশুর শোণিতপানে,—মা কপালিনী লোলুপ হইয়া আছেন!"

যথাসময়ে উভয়পক্ষে বিরাট্ যুদ্ধের আয়োজন হইল। মানসিংহ বিবিধ কৌশলে নানাস্থানে নানারূপ বূ্যহ রচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কচু রায় তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল,—"মহারাজ! সাবধান,—আর অগ্রসর হইবেন না! অদূরে ঐ যে সুরম্য যশোহর-পুরী অবলোকন করিতেছেন,—উহার পূর্ব্বদিকস্থ ঐ সুবিস্তৃত পতিত জমির নিম্নদেশে প্রচুর পরিমাণে বারুদ রক্ষিত আছে,—আপনি যেই ওদিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইবেন, চতুর প্রতাপ অমনি নিমেষমধ্যে, একরূপ বিনাযুদ্ধে আপনাদের সকলকে বিনষ্ট করিবে স্থির করিয়াছে!"

"সে কি" বলিয়া মানসিংহ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।—"সে কি!—বলেন কি!—যুদ্ধনীতিতে প্রতাপ এতই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে! যাই হউক, আজ আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া

রাখিলেন!—আপনার ঋণ অপরিশোধনীয়। আমি ত ঐ পতিত-স্থানে এখনই সসৈন্যে সমুপস্থিত হইব মনে করিয়াছিলাম! ভাগ্যে আপনি আমার সহায় হইয়াছেন, তাই এ যাত্রায় আমি এই অগণিত সৈন্য-সামন্তাদির সহিত রক্ষা পাইলাম,—দাবানলপরিবৃত মহারণ্যে পড়িয়া, পশুপালের ন্যায়, আমাদিগকে মরিতে হইল না।—উঃ! বাঙ্গালীবুদ্ধির কি সুদূরগামিতা!"

কচু রায় উত্তর করিল, "মহারাজ! এই একটা বিষয় দেখিয়া আপনি প্রতাপাদিত্যের বুদ্ধির এত প্রশংসা করিতেছেন,—এমনি কূট-বুদ্ধিতে তাঁহার এই রাজধানীর সর্ব্বস্থান সুরক্ষিত! ঐ যে তাঁহার দুর্গের উত্তর সীমা দেখিতেছেন, ঐ স্থানের নিম্নদেশও সুড়ঙ্গময়,—উহার মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে বারুদ নিহিত আছে। দুর্গের দক্ষিণ সীমা দুর্জ্জয় পার্ব্বত্য-সৈন্যে সংরক্ষিত, আর পশ্চিম সীমায় অসংখ্য বঙ্গীয় বীর মরণভয় তুচ্ছ করিয়া দণ্ডায়মান।—অতএব আপনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইবেন না,—এইখানে দাঁড়াইয়াই সিংহনাদ করিতে থাকুন। শত্রুর হুঙ্কারধ্বনি শুনিয়া, দাম্ভিক প্রতাপ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবেন না, —সসৈন্যে আসিয়া নিশ্চয়ই আপনার সৈন্য-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন;—সেই সুযোগে আপনি যাহা করিতে পারেন।"

মানসিংহ আবেগভরে কচু রায়কে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "মহাভাগ! যদি কোনক্রমে বঙ্গবিজয় হয় এবং প্রতাপাদিত্য বন্দী হন, তাহা আপনারই অনুগ্রহের ফল,—মনে করিব। তারপর আপনার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য,—তাহা যুদ্ধ অবসানে, সম্রাটের সহিত কথোপ-কথনে, বুঝিতে পারিবেন। আপনি ——"

কচু রায় বাধা দিয়া কহিল, "সে কথা এখন থাক্। প্রতাপাদিত্যের সহিত আপনি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক যুদ্ধ করেন, আমার এইমাত্র

প্রার্থনা। বিশেষ, ইহাঁর দুই প্রধান সেনাপতি,—ইহাঁর দক্ষিণ ও বামহস্ত স্বরূপ—শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত নামে যে দুই বঙ্গীয় বীর আছেন, তাঁহারা উত্তেজিত হইলে, জলন্ত আগুনের ন্যায়, নিমেষ মধ্যে আপনার সহস্র সহস্র সৈন্য ভস্মীভূত করিতে পারেন। পূর্ব্ব হইতে সকল বিষয়েই আপনাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য, তাই এ সকল কথা বলিলাম,—অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।”

মানসিংহ আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন, “না, না, না,—আপনার আবার অপরাধ কি?—এইরূপ উপদেশ দেওয়াই ত প্রকৃত বন্ধুর কাজ। আপনি আমা হইতে বয়সে অনেক ছোট হইলেও, আজ হইতে আমি আপনার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলাম। ভরসা করি, আপনি স্বতঃপরত বন্ধুর মঙ্গল কামনা করিয়া, আপনার উদার হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিবেন।”

তরলমতি কচুরায়কে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, মানসিংহ, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় অবগত হইলেন। কচুরায় তাঁহাকে শেষ বলিল,—

“আর এক কথা;—মহারাজ! এদেশের আপামর সাধারণ প্রতাপাদিত্যকে ভবানীর বরপুত্র বলিয়া জানে। সকলের এমনি বিশ্বাস, যুদ্ধকালে স্বয়ং কালী, সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া, প্রতাপের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং কি সৈন্যগণ আর কি জনসাধারণ, প্রতাপের প্রতি সকলের দেবতার ন্যায় আস্থা। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রতাপ দাঁড়াইলে, সৈন্যগণ এতটুকুও ভয়বিহ্বল হয় না,—মুখ কুঞ্চিত করে না, মৃত্যুর কথা একবার মনেও ভাবে না। তাহারা জানে,—কালী তাহাদের সহায়, ভবানীর বরপুত্র তাহাদের সঙ্গে আছে,—সুতরাং দেবতার সহিত মানুষ কতক্ষণ যুঝিবে? এমনই অটল বিশ্বাসবলে ভাগ্যবান্ প্রতাপ,

জনসাধারণের হৃদয়ের উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন।—সুতরাং মহারাজ! আপনি বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রতাপ-সৈন্য আক্রমণ করিবেন।"

মানসিংহ কৃতজ্ঞতার সহিত উত্তর করিলেন, "আবার বলি,—যদি যুদ্ধে জয় হয়, ত সে আপনারই অনুগ্রহের ফল।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রতাপ জানিতে পারিলেন, যাহাকে তিনি, সত্য সত্যই ক্ষুধার অন্ন—তৃষ্ণার জল দিয়া রক্ষা করিয়াছেন,—সেই মহা অকৃতজ্ঞ, নর-পিশাচ ভবানন্দ মজুমদার রীতিমত একটি দল গঠিত করিয়া, অনেক দিন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে। সেই-ই গোপনে কচুরায়ের নিকটে লোক পাঠাইয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছে;—সেই-ই দেশের সমুদয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা কচুরায়ের দ্বারা মানসিংহকে জ্ঞাপন করিয়াছে;—এবং সেই-ই বর্ষার সেই দারুণ দুর্দ্দিনে মানসিংহের রসদ যোগাইয়া, তাঁহাকে সসৈন্যে এই এত নিকটে,—তাঁহার বুকের উপর আনিতে সাহসী হইয়াছে!

চক্ষের নিমিষে প্রতাপ সকলই বুঝিলেন। বুঝিলেন, বাঙ্গালী-জীবনের এ চির-অভিসম্পাৎ, এক ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ ঘুচাইতে পারিবে না!

যাই হোক্, তখনও তিনি দমিলেন না।—প্রিয়বন্ধু শঙ্করের সহিত ধীর-ভাবে সকল বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার গুরু শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের লোকান্তর হইয়াছিল। প্রতাপ ও শঙ্করে অনেক কথা হইল। শেষ শঙ্কর বলিলেন,—

"যদিও পাপিষ্ঠেরা সাধ করিয়া অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিয়াছে,—যদিও আমাদের গুপ্তনীতি সকল মানসিংহ জানিতে পারিয়াছে, তথাপি এখনও আমাদের আশঙ্কার বিশেষ কারণ দেখি

না। মা-যশোরেশ্বরী আমাদের সহায়;—তাঁহারই কৃপায় সম্মুখ সমরে আমরা মানসিংহকে সসৈন্যে বিনষ্ট করিতে পারিব। চিন্তিত হইও না, মাকে ডাকো!”

বন্ধুর এই উৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন। পরদিনই তিনি ভক্তিভরে যশোহরেশ্বরীকে পূজা করিয়া রীতিমত যুদ্ধঘোষণা করিলেন।

উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশে আর কখন হইয়াছিল কিনা, সন্দেহ। বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের নিদেশানুসারে—মহাবীর শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত, পূর্ব্বদেশীয় সেনাপতি রঘু, ফিরিঙ্গি রডা, ‘গুপ্ত সেনাপতি’ সুখা, ঢালিপতি মদন, কুমার উদয়াদিত্য প্রভৃতি রথিবৃন্দ অগণিত সৈন্য লইয়া, মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে অতি ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। গম্ভীরনাদে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি, বন্দুক ও কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে কর্ণ বধিরপ্রায় হইয়া উঠিল। ধূমে ও ধূলিতে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। কেবলই ‘মার্ মার্—কাট্ কাট্,—গেল রে—ম’লো রে,’—ইত্যাকার বিকট শব্দ ধ্বনিত। বঙ্গীয় বীরের নিকট আজ রাজপুত বীরও বুঝি পরাভূত হয়। বঙ্গীয় বীরগণ জ্বলন্ত উৎসাহে দলে দলে শত্রুব্যূহ ভেদ করে,—আর নিমেষমধ্যে তাহাদিগকে পদদলিত, মথিত, বিধ্বস্ত ও নিহত করিতে থাকে। প্রতাপপক্ষেও যে সৈন্যাদি না মরিল এমন নহে,—কিন্তু তুলনায় তাহা অতি অল্প।

সারাদিবসব্যাপী এইরূপ মহাযুদ্ধ চলিতে চলিতে ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। মানসিংহের সৈন্যগণ পূর্ব্ব হইতেই একটু একটু করিয়া হটিতেছিল; এক্ষণে রীতিমত হটিতে লাগিল। একে রাত্রিকাল, তায় বাঙ্গালা দেশের পথঘাটের অবস্থা তাহারা সম্যক্ অবগত নহে,—সুতরাং এই

সময়ে বঙ্গীয় সেনার অব্যর্থ আক্রমণে মানসিংহ বেগতিক বুঝিয়া, এক সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনি করিলেন, আর সেই বংশীধ্বনির সহিত অশ্বপৃষ্ঠে দারুণ কশাঘাত করিয়া, নক্ষত্রগতিতে অশ্ব ছুটাইলেন।—সেই অগণিত রাজপুত, মোগল ও হাব্‌সী সৈন্যও ঝটিতি মানসিংহের পদানুসরণ করিল।

বিজয়োল্লাসে 'কালী—কালী' বলিতে বলিতে, বঙ্গীয় সেনা তাহা-দিগকে তাড়া করিল, এবং পাঁচ ক্রোশ পথ দূরে রাখিয়া, আপন স্থানে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত হইল। এদিনও বঙ্গীয় বীরগণ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া মানসিংহকে সসৈন্যে হটাইয়া দিল।

এইরূপ পর-পর কয়দিনের যুদ্ধে মানসিংহের বহু সৈন্য হত ও আহত হইল। বহু হস্তী এবং অশ্ব—মথিত, দলিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। বঙ্গবিজয়ের আশা ক্রমেই মানসিংহের দুরাশা বোধ হইতে লাগিল। শেষে তাঁহারও মনে একটু একটু করিয়া বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল,—'সত্যই বা প্রতাপ ভবানীর বরপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন!'

কচু রায় ও ভবানন্দ মজুমদার প্রমুখ কুলাঙ্গারগণ দেখিল,—বুঝি বা সকলই পণ্ড হয়! তখন ভবানন্দ এক চাল চালিল। কচু রায়ও 'অতি উত্তম পরামর্শ' বলিয়া, তাহাতে যোগ দিল। উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ঠিক বলিয়াছে,—এইরূপ আশ্বাসবাক্যে মানসিংহকে উত্তেজিত করিতে হইবে;—নচেৎ কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।"

দুষ্টবুদ্ধি ভবানন্দের পরামর্শ-মত, কচু রায় মানসিংহের শিবিরে উপ-স্থিত হইল। তখন প্রভাত হয় নাই,—অল্প রাত আছে। কার্য্যের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য, সেই সময়ে কচু রায় উপস্থিত হইল। দেখিল,

করলগ্নকপোলে মানসিংহ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন,—একরূপ বাহ্যজ্ঞান রহিত।

কিছুক্ষণ পরে উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া মানসিংহ কহিলেন, "সখে! বুঝিলাম, অদৃষ্টই সর্ব্বমূলাধার। বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন;—কার সাধ্য, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে? এ বয়সে আমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছি,—অনেক দেশও জয় করিয়াছি,—কিন্তু বঙ্গীয় বীরের ন্যায় এমন অদ্ভুত পরাক্রম আমি কোথাও দেখি নাই। যাই হোক, আমার মৃত্যু অনিবার্য্য!—হয়, প্রতাপের হস্তে,—নয়, বাদসাহ জাহাঙ্গীরের হস্তে।"

কচুরায়। কেন?—কেন?—অনিবার্য্য কেন?

মানসিংহ। এই জন্য যে, যুদ্ধজয়ের আশা আমার আর নাই। যুদ্ধ করিলে, প্রতাপ বা যে কোন বঙ্গীয় বীরের হস্তে জীবন দিতে হইবে; আর পরাজিত হইয়া দিল্লী গমন করিলে, সম্রাট নিশ্চয়ই আমার প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দিবেন। এককালে কুমার খস্রুর পক্ষ অবলম্বন করায়, তিনি আমার প্রতি অন্তরে অন্তরে বিদ্বেষী। অনেককে তিনি অতি নিষ্ঠুর উপায়ে বিনাশ করিয়াছেন,—এবার আমায়ও করিবেন। মনে বড় আশা ছিল, বঙ্গবিজয় করিয়া, তাঁহার সেই ক্রোধ হইতে নিস্তার পাইব। কিন্তু হায়! এখন দেখিতেছি, নিয়তির হাত এড়াইবার শক্তি মানুষের নাই।"

কচুরায়। (স্মিতমুখে) না মহারাজ! নিরাশ হইবেন না,—ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনা দ্বারাই এই মহাকার্য্য সাধিত হইবে বলিয়াই, মা-যশোহরেশ্বরী আপনাকে এদেশে আনিয়াছেন। এবং সেই কথা বলিব বলিয়াই, আমি এই অসময়ে, এই নিভৃত শিবিরে আসিয়া, আপনার বিশ্রাম-সুখে বাধা দিতে সাহসী হইয়াছি।

মানসিংহ। না, না,—আপনি ও কি বলেন!—সর্ব্বত্র সকল সময়েই আপনার গমনাগমনের অবাধ অধিকার।—কি বলিতেছিলেন,—কথাটা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় পরিষ্কার করিয়া বলুন।

কচুরায় নানারূপ ভণিতা করিয়া কহিল,—"কল্য নিশীথে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন মা-যশোরেশ্বরী আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—'রাঘব! আর কাঁদিস্ নে,—এতদিনে তোর পিতৃহন্তার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে! মহাবীর মানসিংহই তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও বন্দী করিবে। এতদিন আমি প্রতাপের অনুকূলে ছিলাম বটে, কিন্তু আজ হইতে আমি তাহাকে ছাড়িয়া মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলাম। তুই গিয়া মানসিংহকে আমার এই প্রত্যাদেশ জ্ঞাপন করিস্;—সে যেন কল্য অদম্য উৎসাহে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়;—তাহা হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' তাই বলিতেছিলাম, মহারাজ! আপনি নিরাশ না হইয়া, অদ্য সম্পূর্ণ উৎসাহের সহিত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হউন,—বিজয়-লক্ষ্মী নিশ্চয়ই আপনার অঙ্কশায়িনী হইবেন।"

মানসিংহ আশ্বস্ত অন্তরে, ভক্তিভরে, উদ্দেশে সেই জাগ্রতা যশোহরেশ্বরীকে প্রণাম করিলেন। নানা কারণে সহজেই তাঁহার ইহাতে বিশ্বাস জন্মিল। তিনি তখনই মার নাম লইয়া, বীরবেশে 'মা—মা' বলিতে বলিতে, গম্ভীরনাদে স্বয়ং তূর্য্যধ্বনি করিলেন।

তূর্য্যধ্বনি হইবামাত্র শিবির মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই চকিতের ন্যায় উঠিয়া রণ-সাজে সজ্জিত হইল। মুহুর্ম্মুহু কামান গর্জ্জিতে লাগিল। ঝম্ ঝম্ রবে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে সমস্বরে 'জয়—মহারাজ মানসিংহের জয়' বলিয়া, আকাশমেদিনী কম্পিত করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ অকস্মাৎ এই তূর্য্যধ্বনির কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনিও তখনই উচ্চ প্রাসাদশিখরে উঠিয়া, গম্ভীরনাদে শঙ্খধ্বনি করিলেন। হঠাৎ আবশ্যক হইলে, মধ্যে মধ্যে তিনি এইরূপ শঙ্খধ্বনি করিতেন। সে শঙ্খধ্বনিতে দুই ক্রোশেরও অধিক পথ প্রতিধ্বনিত হইত। আর সেই শব্দ শুনিবামাত্রই, তাঁহার ভক্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সিংহনাদ করিতে থাকিত।

আজ অল্প রাত থাকিতে রাজ-প্রাসাদ হইতে এই অপরূপ শঙ্খধ্বনি হইতেছে শুনিয়া, প্রতাপ-সৈন্যগণ অবিলম্বে অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইল এবং ভক্তিভরে 'কালী কালী' বলিয়া, 'জয়—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়' রবে চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিল।

প্রতাপ তৎক্ষণাৎ শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন,—

"জানি না, আজ কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া, সেই রাজপুত-কলঙ্ক, এই অসময়ে তূর্য্যধ্বনি দ্বারা যুদ্ধঘোষণা করিতেছে। যাই হউক, যখন শত্রু রণে আহ্বান করিতেছে, তখন আর ক্ষণমুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, তোমরা অগ্রসর হও।—আমি একবার মা-যশোহরেশ্বরীকে দেখিয়া এখনই তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি।"

শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত তৎক্ষণাৎ সমুদয় সৈন্য-সামন্তাদি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রচণ্ড প্রতাপে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া, শত্রু-সৈন্যগণকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ প্রতাপের বামচক্ষু ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। মনটা কেমন উদাস হইয়া গেল। 'যেন কি হারাইয়াছি,—যেন কি হারাইলাম,—যেন কি আর পাইব না'—এইরূপ ভাব মনে জাগিতে লাগিল।

মনে এই ভাব লইয়া, প্রতাপ মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই মায়ের পাদপদ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন মনে করিলেন। দেখিলেন, মায়ের সে পাদপদ্ম আর নাই,—তাহা কেবলমাত্র একখণ্ড পাষাণে পরিণত হইয়াছে! তারপর মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, মা অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে, তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিতেছেন! দেখিতে দেখিতে তিনি দেখিলেন,—মায়ের সর্ব্বশরীর শ্রীভ্রষ্ট হইয়া, কেবলমাত্র প্রকাণ্ড একখণ্ড পাষাণ হইয়া যাইতেছে! এই সময়ে সবিস্ময়ে তিনি আরও দেখিতে পাইলেন,—মায়ের মস্তক ভেদ করিয়া একটি দিব্য জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়া গেল,—আর সেই সঙ্গে মায়ের সম্পূর্ণ অবয়ব বিলুপ্ত হইয়া, কেবলমাত্র একখণ্ড পাষাণ দাঁড়াইয়া রহিল!

"এ, কি দেখি মা!"

ভয়, ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রতাপ ক্রন্দনস্বরে কহিলেন,—"এ, কি দেখি মা! মা চৈতন্যরূপিণি! তুমি কি গেলে? তবে যাও মা,—আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি!"

বীর প্রতাপ এবার মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় কহিলেন,—"তবে যাও মা, বঙ্গভূমি ছাড়িয়া! এ রাজ্য শ্মশান হউক;—ইহার শ্রী, শোভা, সৌন্দর্য্য সকলই ভ্রষ্ট হউক;—আর দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীজাতি জন্ম-জন্ম পরপদ লেহন করিয়া, পরস্পর রেষারেষি-দ্বেষাদ্বেষীতে জ্বলিয়া মরুক! তবে যাও মা, যশোহরেশ্বরি! হিন্দুর হৃদয়ের ভক্তি,—শক্তি,—বল,—বুদ্ধি,—আশা,—ভরসা,—সর্ব্বস্ব লইয়া যাও মা! আর যেন মা, কখন স্বপ্নেও এ জাতি স্বাধীনতার মুখ না দেখে!"

ভাববিভোর প্রতাপ মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই মূৰ্চ্ছিত অবস্থায় তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন।

দেখিলেন,—বিমানে এক অপূৰ্ব্ব শোভা! নরচক্ষু সে শোভা কখন দেখে নাই,—কেবল ভবানীর বরপুত্রই মানসচক্ষে আজ তাহা দেখিলেন। দেখিলেন, মায়ের সেই বিশ্বমোহিনী মূৰ্ত্তি দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে, আর মা যেন মৃদু মৃদু হাসিতেছেন! মায়ের সেই জগদ্ধাত্রী, জগৎ-পালয়িত্রী, করুণাময়ী মূৰ্ত্তি দেখিয়া, পুণ্যবান্ প্রতাপ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"আবার এ, কি দেখি মা?"

তখন যেন সেই বিমানদেশ হইতে স্বর্গীয় বংশীস্বরে অতি কোমল ও করুণকণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"বৎস! নিরাশ হইও না। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইলে বটে, কিন্তু মুসলমানও এ রাজ্য অধিক কাল ভোগ করিতে পারিবে না। ভারতের হিন্দু-শক্তি ও আৰ্য্য-সভ্যতার পুনরুদ্দীপন করিতে, সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে শ্বেতকায় সুসভ্য একদল জীবিত জাতি শীঘ্রই এখানে আগমন করিবেন। তাঁহারা এক হস্তে সত্য ও ন্যায়—এবং অপর হস্তে করুণা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলাইয়া,—দেবতার ন্যায়, প্রত্যেক ভারতবাসীর ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। হিন্দু তখন অধীন হইয়াও, সৰ্ব্ববিধ স্বাধীনতা-সুখের আস্বাদ পাইবে। হিন্দুর দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য,—তখন আপন আপন পথ পাইবে। তুমি সমগ্র ভারত একতা-সূত্রে গ্রথিত করিয়া ধৰ্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার মানস করিয়াছিলে,—কিন্তু সে সৌভাগ্য,—শ্বেতদ্বীপ-হইতে-আগত—সুদূর পশ্চিমবাসী—সেই সৰ্ব্বগুণালঙ্কৃত জাতি ভিন্ন আর কাহারও হইবে না। তাঁহারাই

ভারতের ভাবী সম্রাট্। সেই ন্যায়বান্ রাজ-রাজেশ্বরকে গুরুপদে আসীন করিয়া, তোমার বংশধরগণ সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিবে।"

প্রতাপ সেই স্বপ্নাবস্থাতেই মায়ের সেই মহা-বাণী শুনিতে লাগিলেন। এইবার তাঁহার চৈতন্য হইল। ভক্তি ও বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি উদ্দেশে, ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া, মাকে প্রণাম করিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"মাগো! তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

এই বলিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া, নক্ষত্রগতিতে অশ্ব ছুটাইলেন। কি ভাবিয়া আপন প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া, একবার দাঁড়াইলেন। অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন প্রভাত হইয়াছে।

সম্মুখে মহিষীকে দেখিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! আজ শেষ দিন! বিদায় দাও।——যেন জন্মান্তরে আবার তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি।"

পদ্মিনী ছল ছল চক্ষে, কাঁদ-কাঁদ মুখে কহিলেন,—

"প্রাণেশ্বর! আজ যে তুমি দাসীকে এ নিষ্ঠুর কথা শুনাইবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। গত নিশীথে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি,————"

প্রতাপ বাধা দিয়া কহিলেন,—"থাক্, সে কথা আর তুলিয়া কাজ নাই;—আমি আপন মন দিয়াই তাহা বুঝিতেছি। ভবিতব্য—যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিতে চলিল। প্রিয়ে! দুঃখ করিও না—সকলই সেই মহামায়ার খেলা! তাঁহার মায়ামুহূর্ত্তে, এতদিন একটা সুখের স্বপ্ন লইয়া ছিলাম! আজ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে,—মাও অন্তর্হিত হইয়াছেন!"

পদ্মিনী স্থিরচক্ষে, অবিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"এখন দাসীর প্রতি কি অনুমতি হয়? সেই শেষ-সংবাদ শুনিবার পরও কি আমায়——"

"হাঁ, মায়ের খেলা অতি বিচিত্র। শেষ অবধি না দেখিয়া, তোমার কিছু করিবার অধিকার নাই।"

পদ্মিনী। তার পর?

প্রতাপ। 'তার পর'—তুমিই স্থির করিও।—তুমি সতীসাধ্বী বীর-রমণী;—শেষের সে বিহিত অনুষ্ঠান তোমাতেই সম্ভবে। যদি শুন, বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য্য চির-অস্তমিত হইয়াছে,—'ভবানীর বরপুত্র' জীয়ন্তে মরিয়াছে, তবে যমুনার অতল জলে ডুব দিও,—আর উঠিও না। তুমি একা নহে,—আমার যে যেখানে আছে,—আমার বলিয়া যাহারা গৌরব করে,—সেই নয়নানন্দদায়িনী চিরকল্যাণীগণ—কোলের শিশুটিকে বুকে লইয়াও যেন হাসিতে হাসিতে তোমার অনুবর্ত্তিনী হয়! বজ্‌রা প্রস্তুত রহিল,—সকলকে লইয়া তুমিও প্রস্তুত হও;—অশুভ সংবাদ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে, মাঝ্‌-যমুনায় গিয়া বজ্‌রার তলাটি ফুটা করিয়া দিও। আর যদি শুন, মা-যশোহরেশ্বরী মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন,—বঙ্গদেশ চির-স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে,—তবে মঙ্গল শঙ্খনিনাদে দিগ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া,—আনন্দে চারি-পাল তুলিয়া, বজ্‌রা লইয়া তীরে উঠিও।—ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিও,—নিজের পরিধেয় বস্ত্রটি মাত্র রাখিয়া আর সব বিলাইয়া দিও,—মায়ের ইটের মন্দির সোণা দিয়া মুড়াইয়া দিও!—কিন্তু, শুভে! সে শুভ মুহূর্ত্ত আর আসিবে কি? সে সোণার স্বপ্ন আর ফলিবে কি?—সতি, কাঁদিও না, চোখের জল মুছিয়া ফেল,—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাকে ডাকিও।—মা! দয়াময়ি, পরমেশ্বরি!

প্রতাপের চক্ষু দিয়াও ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। হায়, সে জল আর শুকাইল কি!

তার পর, সেই নীরব ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে—বীর-বীরাঙ্গনার শেষ আলিঙ্গন! সে আলিঙ্গনে উভয়ের বুকের ভিতর সমুদ্রমন্থন হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল এই ভাবে কাটিয়া গেল।

এইবার প্রাণময়ী পদ্মিনী, প্রাণস্পর্শী বাক্যে কহিলেন,—"তবে যাও প্রাণেশ্বর, সেই শত্রু নিধনে! শত্রুরক্তে, মা-বসুমতীকে তর্পণ করিতে করিতে, যেন তোমার বীরগতি———"

প্রতাপ সেই অবস্থায়, যেরূপ হাসি সম্ভবে,—সেইরূপ হাসি-কান্নাময় একরূপ অপূর্ব্ব স্বরে কহিলেন,—

"হাঁ, এইরূপ কথাই তোমার মুখে শুনিতে চাই! প্রিয়ে, তোমাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে লাভ করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই, বিধাতা আমাকে বঙ্গাধিপের উচ্চ আসন দিয়াছিলেন!"

প্রতাপ বিদায়গ্রহণ করিলেন।

এই সময় ঊনবিংশতিবর্ষীয় কুমার উদয়াদিত্য বীরবেশে সুসজ্জিত হইয়া মাতৃপদে প্রণাম করিতে আসিলেন। প্রণাম করিয়া কহিলেন,— "মা, বিদায় দাও!—আজিকার যুদ্ধে যদি জয়যুক্ত হই, তাহা হইলে, বাবাকে বলিয়া, মা-যশোহরেশ্বরীর সোণার মন্দির করিয়া দিব।"

পদ্মিনী নীরবে, প্রাণের ভিতর একটু হাসিয়া-কাঁদিয়া, পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফুলজানি আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিল না। চারিদিকে কামান-গর্জ্জন, বীরের হুঙ্কার;—দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ ফুলজানির মনে হইল,—

"আজ কি শেষ দিন? আজ কি বাঙ্গালীর ভাগ্য-পরীক্ষা? মানসিংহ আজ জীবনপণ করিয়াছেন! তবে?—হয়, আজ বঙ্গদেশ চির-স্বাধীন হইবে,—নয়, মানসিংহ বঙ্গের নব-আশা-রঞ্জিত প্রফুল্ল মুখকমলে অধীনতা-অন্ধকার ঢালিয়া দিবে! কে জানে, আজ যুদ্ধ-অবসানে, বিধাতা বঙ্গভাগ্যে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন!"

ভাবিতে ভাবিতে ফুলজানির সেই প্রস্ফুটিত মুখকমলে বিরক্তি, ক্রোধ, ঘৃণা এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের ছায়াও নিপতিত হইল। ফুল ভাবিল,—

"ওঃ, কি কষ্ট! মহাপাপী ভবানন্দ ও কচু রায় হইতে এই সর্ব্বনাশ হইল? স্বজাতি হইয়া স্বজাতির সর্ব্বনাশ! মা বসুন্ধরে! এখনও তুমি কেমন করিয়া সেই কুলাঙ্গারগণের ভার বহিতেছ?"

বিদ্যুল্লতার চক্ষে বিজলী খেলিল। ক্রমে সেই বিশাল চক্ষু হইতে বড় বড় বারিবিন্দু ঝরিল। যেন তরল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একে একে নির্গত হইতে লাগিল।

দেওয়ালে প্রতাপ-প্রদত্ত সেই সুতীক্ষ্ণ অসি ঝুলিতেছে! চাহিয়া চাহিয়া ফুলজানি ভাবিল,—"হায়, শুধু শুধু কি ইহা মলিন হইয়া যাইবে? শত্রুশোণিত পান করিবার জন্য কি ইহার পিপাসা নাই?"

ফুলজানির দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইল।

ফুল অসিখানি পাড়িয়া, বস্ত্রাঞ্চলে মুছিল। সেই বীর-পরিচ্ছদ তেমনি সজ্জিত রহিয়াছে,—তাহাও দেখিল। তখন ফুলজানির বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। যুদ্ধ-ক্ষেত্র! বঙ্গরমণী——যুদ্ধক্ষেত্র। অসম্ভব! ——আবার দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইল।

ফুলজানি সেই পরিচ্ছদ পরিল, কটিতে তরবারি লইল। তুমি মুখের পানে চাহিয়া দেখ,——সে মুখে ও সে পরিচ্ছদে কত প্রভেদ! সেই অপূর্ব্ব কেশদাম শিরস্ত্রাণে কুণ্ডলাকারে সজ্জিত হইল; সেই বিশাল আঁখিযুগল, শত্রুনাশ-কামনায় ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল;—রমণীর রমণীয় কটাক্ষ সে আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; সে ফুল্লাধর দশনাঘাতে ক্ষত বিক্ষত,—সে সুরঞ্জিত নাসারন্ধ্র উদ্বেগে স্ফুরিত হইতে লাগিল। সে মৃণাল বাহুযুগল, সে নিতম্ব, সে উরু, সে চরণ, শরীরের সকল অংশই যথাযথরূপে কঠিন বর্ম্মে আবৃত হইল।—বীরবালা কুমার-বেশে রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া সমর-প্রাঙ্গণে ঝাঁপ দিল।

যেখানে সূর্য্যকান্ত অদ্ভুত পরাক্রমে শত্রুসংহার করিতেছিলেন, ফুলজানির চক্ষু সেইদিকে পড়িল। দেখিতে দেখিতে ফুলজানি দেখিল, এককালে অনেকগুলা শত্রু সূর্য্যকান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে।—একদিকে কামান,—একদিকে অসি,—একদিকে বন্দুক! তখন সূর্য্যকান্ত দুই উচ্চ পদস্থ মোগলের ছিন্ন-মুণ্ড দুই হাতে ধরিয়া, তেজোদ্দীপ্ত অন্তরে, আপন সৈন্যগণকে দেখাইতেছিলেন। দূর হইতে ফুলজানি সূর্য্যকান্তের বিপদ বুঝিয়া, আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া, সূর্য্যকান্তকে সতর্ক করিতে, সেই অগণিত সৈন্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। পতঙ্গ যেমন অনলশিখায় ঝাঁপ দেয়, তেমনি করিয়া ঝাঁপ দিল। সূর্য্যকান্তও আত্মরক্ষা করিলেন।

দূর হইতে এক মোগল ফুলজানিকে লক্ষ্য করিল। সে, দেখিবামাত্র

তাহাকে চিনিল। অনেক কষ্টে সে সূর্য্যকান্তের সম্মুখে আসিতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত সেই ভয়ানক সময়ে, সেই অগণিত সৈন্য-তরঙ্গে, সেই যুবক-বেশধারী ফুলজানিকে অবশ্য চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু একবার মাত্র তাহার মুখপানে চাহিয়াই, সহসা কি যেন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল! কে যেন সহসা হৃদয়দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল—"দেখ দেখি, আমি কে!" সূর্য্যকান্ত মুহূর্ত্ত,—কেবল মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইয়া, আর একবার চাহিলেন। চারিটি চক্ষু মিলিল!—হায় সূর্য্যকান্ত! কর কি? আর ওদিকে চাহিও না,—ঐ দেখ, শত্রু তোমাকে লক্ষ্য করিয়াছে!

দূর হইতে যে মোগল ছুটিতেছিল, সে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ফুলজানি পশ্চাতে হটিল। সূর্য্যকান্ত সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"একি! আপনি!———"

সে মোগল,—তোরাব আলি।

তোরাব আলি তীব্রকণ্ঠে বলিল,—"হাঁ, আমি।—সূর্য্যকান্ত! ফুলজানিকে কোথায় রাখিয়াছ?"

সূর্য্যকান্ত। কোথায় আছে,—জানি না।—এখন সে কথার সময় নয়।——দূর হও, নরাধম!

এক মোগল তাঁহার হস্তে অসিবিদ্ধ করিল। ফুলজানি চক্ষের নিমিষে, অস্ত্রাঘাতে, সে মোগলকে বিনষ্ট করিলেন।

এই সময় একটা কামানের জ্বলন্ত গোলা সূর্য্যকান্তকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিল। ফুলজানি তাহা দেখিতে পাইয়া, ছুটিয়া সূর্য্যকান্তের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। গোলা ফুলজানিকেই আহত করিবে;—কিন্তু তাহা না করিয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

তোরাব। তুমি জান না,—ফুলজানি কোথায়? এখনও প্রতারণা!—সূর্য্যকান্ত, তোমার সম্মুখে ঐ কে, দেখ দেখি!

সূর্য্যকান্ত। একটি বীর-যুবক ত দেখিতেছি।—সেই কুমার না?

"কুমার? বটে?—"

বিকৃত মুখে এই কথা বলিয়া, তোরাব ঝটিতি পশ্চাৎ হইতে ফুল-জানির শিরস্ত্রাণ খুলিয়া লইল। তখন সেই কুণ্ডলীকৃত কেশরাশি ফুলজানির পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িল। ফুল একবার মাত্র সূর্য্যকান্তের সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল।—কি অপূর্ব্ব সে শোভা! সূর্য্যকান্ত বিস্ময়ে সে দেবীমূর্ত্তি দেখিলেন।—চারিটি চক্ষুর পূর্ণ মিলন হইল। মুখে অব্যক্ত ভাব ফুটিয়া উঠিল। চিরদিনের তৃষিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিল।

এই অবসরে মোগলপক্ষ হইতে আর একটা কামানের গোলা ছুটিয়া আসিল। হায়, এবার গোলার লক্ষ্য অব্যর্থ হইল! সেই গোলা আসিয়া ফুলজানির বক্ষের উপর পড়িল। ফুলজানি ভূতলশায়িনী হইতে-না-হইতে সূর্য্যকান্ত তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন;—কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—

"হায় ফুল! এ কি হইল! ওহো-হো! তুমি রণাঙ্গনে?—এই বেশে,—আমারই জন্য? হায়! বালিকে! আমি একদিনের জন্যও বলিতে পারিলাম না,—তোমায় কত—কত ভালবাসি!—ওঃ!"

অধরের হাসি নিবিল না,—সেই হাসি স্থির থাকিতে থাকিতে স্বর্গের ফুল স্বর্গে চলিয়া গেল!

এই সময়ে আর একটা গোলা আসিয়া সূর্য্যকান্তের উরুদেশ ভেদ করিল, এবং ঠিক সেই সময় তোরাব আলির শাণিত কৃপাণ,—শিষ্যের গলদেশে পড়িয়া, ফুল হইতে শিষ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

নরকের আগুন নির্ব্বাপিত হইল! মূর্ত্তিমান্ হিংসা—পাপ তোরাবের বুকের কলিজা এতদিনে শীতল হইল!

হায় প্রেম! হায় রমণীর রূপ!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সূর্য্যকান্তের পতন দেখিয়া, বঙ্গীয় সৈন্যগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া, মানসিংহ সেই সময়ে, শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অশ্রান্ত গোলা-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বালকে যেমন কাষ্ঠের গোলা লইয়া লোফালুফি করে, বঙ্গীয় বীরগণ আজ অগ্নিময় গোলা লইয়া, সেই-মত লোফালুফি করিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ লোফালুফি করিতে করিতে,—যেখানে কন্দর্পরূপ তরুণযুবক উদয়াদিত্য অতুল উৎসাহে সৈন্যগণকে মাতাইতেছিলেন,—সেই স্থান দিয়া একটা জ্বলন্ত গোলা ছুটিল———না, ওকি!—গোলা যে কুমারের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইল!

চারিদিকে আবার 'হায় হায়' রব পড়িয়া গেল।

এই হায় হায় রবের সঙ্গে সঙ্গে,—প্রতাপের সেই নৌ-সেনাপতি—দুর্দ্ধর্ষ-ফিরিঙ্গি রডাও অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া, শেষ-নিদ্রায় অভিভূত হইল।

উপর্য্যুপরি তিন তিন প্রধান সেনাপতির পতন! বঙ্গীয় সৈন্যের হাহাকার আর থামিল না। আকাশেও বড় ঘন মেঘ দেখা দিল!

তেজস্বী শঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! এই কি তোমাদের শোক করিবার সময়? যাহারা তোমাদের প্রিয়তম সেনাপতি ত্রয়কে মারিয়াছে, তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়া, তোমরা কি তবে ফিরিতে চাও? তোমরা এত কষ্ট সহিয়া, আজ প্রায় অষ্টাদশ বৎসরকাল যে বঙ্গদেশ স্বাধীন করিয়া রাখিয়াছিলে,—আজ কি এই একদিনের যুদ্ধে, সেই সোণার বঙ্গভূমি,—বিজাতি বিধর্ম্মীর করে তুলিয়া দিবে?"

শঙ্করের এই মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে বঙ্গীয় সৈন্যগণ আবার মাতিয়া উঠিল। আবার তাহারা মরণভয় তুচ্ছ করিয়া মানসিংহের সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইল। আবার প্রতাপ-পক্ষ হইতে ভীমনাদে কামান গর্জ্জিতে লাগিল। —ঝম্ ঝম্ রবে রণবাদ্যও বাজিয়া উঠিল।

প্রতাপের নিকট সংবাদ গেল,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে!—বীরবর সূর্য্যকান্ত, কুমার উদয়াদিত্য এবং ফিরিঙ্গি রঁডা আর ইহলোকে নাই।

প্রাণোপম সুহৃৎ, প্রাণাধিক পুত্র ও একজন প্রধান সেনাপতির নিধনবার্ত্তা শুনিয়া, প্রতাপ এতটুকুও মুহ্যমান হইলেন না,—কেবল মাত্র জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন,—এবং তৎক্ষণাৎ আশু-কর্ত্তব্যে মনোযোগী হইলেন।

অদ্ভুত বিক্রমে হিন্দু-বাহিনী পরিচালিত করিয়া, অকস্মাৎ প্রতাপ মোগল-বাহিনীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শঙ্করও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

তখন এই দুই মহাবীর,—প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মানসিংহের সৈন্যমণ্ডলীকে ভস্মীভূত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই ভীম-ভৈরব-রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া, শত্রুগণ মনে মনে মহা প্রমাদ গণিল। সকলে বুঝিল, —আজ আর রক্ষা নাই।

কিন্তু হায়! বিধি বাম! এইরূপ মহাযুদ্ধ চলিতে চলিতে, ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। অন্ধকারে কিছুই দেখিবার যো নাই। এই সময়ে ভবানন্দের পরামর্শে, কচু রায়, মানসিংহের পশ্চাতে থাকিয়া, 'প্রতাপের মৃত্যু'—এই ঘোর মিথ্যা কথা ঘোষণা করিয়া দিল। সেই সহস্র সহস্র সৈন্যমধ্য হইতে, সহসা 'প্রতাপের মৃত্যু'—এই মহা অমঙ্গল ধ্বনি উত্থিত হইবামাত্র, বঙ্গীয় সৈন্যগণ একেবারে নির্বীর্য্য ও সাহসহীন হইয়া, চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া, চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

মহাবল প্রতাপ, তাঁহার সৈন্যগণ মধ্যে এই আকস্মিক ছত্রভঙ্গের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া,—এতক্ষণের পর যেন কিছু দমিয়া পড়িলেন। এই সময়, তিনি নিজেও, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন। শুনিলেন, মানসিংহের সৈন্যগণ সকলেই তাঁহার মৃত্যু-কাহিনী লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতেছে, আর সেই সঙ্গে বঙ্গীয় সৈন্যগণও অবসাদে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে।

প্রতাপ বুঝিলেন,—"মানসিংহের ইহা একটি অব্যর্থ কৌশল। আমার মৃত্যু-ঘোষণা করিয়া, আমার সৈন্যগণকে একরূপ জীয়ন্তে মারিয়া ফেলিল।"

না, তা বুঝিবেন কেন?—হঠাৎ এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল; সেই বৈদ্যুতালোকে চমকিত হইয়া তিনি দেখিলেন,—কি দেখিলেন!——অবসাদে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল;—দেখিলেন, মানসিংহের পশ্চাতে থাকিয়া, কচু রায় ও সেই মহাপাপ মজুমদার, এই বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া, মানসিংহের সৈন্যগণকে বিশেষরূপে মাতাইতেছে!

প্রতাপ জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন, আর সেই নিশ্বাসের সহিত অশ্ব হইতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এই অবসরে মানসিংহ, প্রতাপ-পরিবেষ্টিত অবশিষ্ট অতি অল্পমাত্র বঙ্গীয়-সৈন্যকে, মহা আস্ফালন পূর্ব্বক আক্রমণ করিল। সেই মুষ্টিমেয় বঙ্গীয়-সৈন্য,—রাজরাজেশ্বর প্রতাপাদিত্যের শরীর রক্ষার জন্য, অচলের ন্যায় অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সেই অগণিত বিপক্ষ-সৈন্যের নিকট এই স্বল্পপরিমিত বঙ্গীয়-সৈন্য কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে? তাহারা একরূপ বিনা যুদ্ধে ঠায় দাঁড়াইয়া মরিল, তথাপি প্রভুর নিকট হইতে এক পদও নড়িল না।

অবশিষ্ট একমাত্র শঙ্কর,——সেই মহাপ্রাণ, উন্নতমনা, মহা তেজস্বী

শঙ্কর,—আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, প্রাণোপম বন্ধুর শিয়রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন তাঁহার বাহজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়। তাঁহার মনের ভাব তখন কিরূপ, পাঠক আপন মন দিয়াই তাহা বুঝুন। নিশ্চল মূর্ত্তির ন্যায় তখন তিনি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তকাল এইরূপ একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া, প্রতাপের দেহোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যা আগমনের সহিত ক্রমে কাল-রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। সে কাল-রাত্রি আর পোহাইল না!——'বঙ্গের শেষবীরের' জীবন-সন্ধ্যার সহিত তাহা চির-আঁধারে পর্য্যবসিত হইল!

তখন মানসিংহ নিজে, এই দুই মহাপুরুষকে আগুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং যথাসময়ে তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন।

'বঙ্গের শেষবীরের' অবসানের সহিত, বঙ্গের স্বাধীনতাকাহিনীও, কবি-কল্পনার বিষয়ীভূত হইল।

ইতি তৃতীয় খণ্ড।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

উপসংহার।

—:*:—

তারপর ?—হায় ! তারপর যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিল। মানসিংহ যশোহর-দুর্গ অধিকার করিয়া, সমগ্র রত্নরাজি সংগ্রহ করিলেন, এবং মহা সমারোহে যশোহরেশ্বরীকে পূজা করিয়া, কৃতার্থ ও ধন্য হইলেন।

এই 'যশোহরেশ্বরী'র পাষাণ-প্রতিমা, মানসিংহ আপন দেশে লইয়া গিয়া, শাস্ত্রবিহিত বিধানানুসারে স্থাপিত করিয়াছিলেন। আজিও জয়পুরে, অম্বর পর্ব্বতোপরি, মায়ের সেই মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। আশ্চর্য্য এই,—আজিও মায়ের সেই মর্ম্মরনির্ম্মিত গ্রীবা ঈষৎ বাঁকা আছে। জনসাধারণের বিশ্বাস, মা—যশোহরেশ্বরী প্রতাপের প্রতি বাম হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং সে সময় মায়ের সেই মন্দিরও ঘূর্ণিত হইয়াছিল।

প্রতাপ-মহিষী,—সেই সতী-সাধ্বী সোণার পদ্মিনী,—স্বামীর পরাজয়-বার্ত্তা শুনিবামাত্রই, স্বামীর উপদেশানুযায়ী, সঙ্গিনী-সহচরীগণসহ, যমুনাজলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

দিল্লীর দরবার পর্য্যন্ত 'বঙ্গের শেষবীরকে' আর যাইতে হয় নাই,—দারুণ মানসিক কষ্টে, ৺বারাণসীর পুণ্যক্ষেত্রে, তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার নশ্বর দেহের পতন হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির ইতিহাস অনন্তকালের জন্য, তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

মহাভাগ শঙ্কর শেষ-দশায়, 'মোগল-বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধরিব না'—অঙ্গীকার করিয়া, সমস্ত ধন-রত্নাদি বিলাইয়া দিয়া গঙ্গাবাস-উপলক্ষে, বারাসাত গ্রামে আসিয়া, অতি দীন আর্ত্তির ভাবে, ঈশ্বরারাধনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইলেন। শঙ্করের বংশধরগণ আজিও জীবিত আছেন।